কোন্ পথে ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

ভূমিকা

আমার কয়েকজন অনুরাগী পাঠকের অনুরোধে সমাজ ও শিক্ষাবিষয়ক আটটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া "কোন্ পথে ?" নামে প্রচারিত হইল। এই সকল প্রবন্ধ পূর্বে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও বহু পাঠকের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। কিন্তু কেবল পাঠকের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্তই এ সকল প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। দীর্ঘকাল সমাজের নানা দিক লক্ষ্য করিয়া এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আশা করি, পাঠক স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিবেন।

এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ মৌখিক ভাষায় লিখিত। মৌখিক ভাষা দ্রুত ভাষা। ইহাতে ক্রিয়াপদের এবং কদাচিৎ অন্য শব্দের স্বরবর্ণ গ্রস্ত হয় এবং তৎপূর্বস্থিত ব্যঞ্জনে বলন্যাস হয়। অক্ষর দ্বারা বলন্যাস জানাইবার উপায় নাই। এই কারণে গ্রস্তবর্ণ একটা চিহ্ন (') দ্বারা না দেখাইলে পড়িয়াই অর্থবোধ হয় না। এই চিহ্নের নাম উৎকলা। কিন্তু পুনঃ পুনঃ উৎকলা প্রয়োগ করিতে হইলে মৌখিক ভাষা লিখন ও পঠন কষ্টকর হইয়া পড়ে। যেখানে উৎকলা না দিলে পঠন ও অর্থবোধ দুর্ঘট হয়, কেবল সেখানেই উৎকলা প্রয়োগ কর্তব্য। ই, উ এবং য (ইঅ), এই তিনবর্ণ গ্রস্ত হয়। হইল, মৌখিক ভাষায় হ (ই) ল, অর্থাৎ হ'ল। চাউল, মৌখিক ভাষায় চা (উ) ল, অর্থাৎ চা'ল। চলিয়া, বল্‌ইয়া—চল্যা —চল্যে—চলে'। এইরূপ, বর-কন্যা—বর-কনে'; বেগুনিয়া—বেগুনে'। ভ্রমক্রমে এই পুস্তকের ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় উৎকলা প্রযোগ অধিক হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক ক্ষমা করিবেন।

বাঁকুড়া
১৩৫৯—ফাল্গুন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

কোন্ পথে ?

এই দুর্দিনে, যখন 'হা টাকা' 'হা টাকা' রব উঠিয়াছে, যখন রোগের যাতনায় দেশের নাড়ী ছাড়িতে বসিয়াছে, যখন ভাতকাপড় জুটাইতে লোকে অন্ধকার দেখিতেছে, তখন জীবনোপায়ে সত্যাসত্য বিচার প্রীতিকর হইবে না। যাঁহারা মানের আশায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, ছুটাছুটি করিতেছেন, তাঁহাদেরও হইবে না। কারণ যাচ্ঞা দ্বারা যে মান অর্জিত, তাহা অপমানের ন্যায় মর্মে মর্মে বিঁধিতে থাকে।

তবে কাহাদের তরে স্বদেশগ্লানির কীর্তনে বসিতেছি ?

যাঁহারা বর্তমানকে সোপান করিয়া ভবিষ্যতের মহোজ্জ্বল কীর্তিমন্দিরে উঠিবার কল্পনা করেন, যাঁহারা দেশের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ মিলাইয়া 'স্বদেশী' আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অতিগামী ও অনতিগামী নামে বিভক্ত হইয়াও দেশের হিত কামনা করেন, তাঁহাদিগকে স্ব-শাসন ও স্বয়ং-শাসনের ঐক্য বিবেচনা করিতে বলিতেছি। আর যে-সকল যুবার মুখপানে তাকাইয়া মাতৃভূমি ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া দিন গণিতেছেন, তাঁহাদিগকেও চিন্তা করিতে ডাকিতেছি।

ভালমন্দ, সম্পদ-বিপদ, সকল দেশেই, বোধ হয় সকল সময়েই, লাগিয়া আছে। মানুষের জীবনে এই, জাতির জীবনেও এই। একথাও ঠিক, আমরা উপস্থিত কষ্টকে বড় করিয়া দেখি, সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। আমাদের মন এক সময়ে দশদিকে ধাবিত হইতে পারে না ; যে সময়ে যে দিকে হয়, সে দিকেরই ভালমন্দ গণিতে বসে।

সম্প্রতি আমাদের দেশের মুখ্যগণ, দেশ-শাসনে কর্তৃত্বলাভের বাঞ্ছায়, রাজপুরুষগণের নিকট স্ব স্ব যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। পরকে নিজের আজ্ঞাধীন করা, তাহার ব্যবহার নিজের ঈপ্সিত মার্গে চালিত করার অর্থ দেশশাসন। কিন্তু স্ব-কে শাসন না করিলে পর-কে শাসন করিতে পারা যায় কি ?

বহু কালের রোগ-ভোগে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। বলাধান হইতে সময় লাগিবে। এ সময় ধৈর্য ও সংযমের কিঞ্চিৎ হানি সহিবে না। বলবান ক্ষণিক অসংযমের দোষ কাটাইয়া উঠিতে পারে, বলহীন তাহাতে রোগ দুঃসাধ্য করিয়া তোলে। আচারে ব্যবহারে সংযম, কাজে কথায় সংযম, ধন-মানের লোভে সংযম,—ইহা সনাতন ধর্ম, এবং দুর্বলের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। জাপান মরিয়াছিল, বাঁচিয়াছে। কি ঔষধে, কি পথ্যে বাঁচিয়াছে ? সে ঔষধে, সে পথ্যে নিশ্চয়ই ধর্ম ছিল।

মানুষ যে অনুকরণদক্ষ বানর, জাপান সে সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। জাপানী জাপানীই আছে, দেশ-ভক্তির কষ্টিপাথরে কষিয়া দেশী সোনার সহিত মিলাইয়া বিলাতী সভ্যতা কোথাও গ্রহণ, কোথাও বর্জন করিয়াছে। লোকে বলে, সে ঔষধ, সে পথ্য, দেশ-প্রেম।

দেশ-প্রেম, দেশ-ভক্তি প্রভৃতি শব্দ শুনিতে মন্দ নয়। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি ? ইহা কি মানব-মাত্রের ভ্রাতৃ-প্রেম ? এক সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া সকলের ভ্রাতৃসম্বন্ধ ? কিন্তু সে ভ্রাতৃ-প্রেম উত্তম হইলেও দেশ-প্রেম নহে। দেশ-প্রেম অনুদার ; যাহাকে বান্ধব মনে করে, কেবল তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। যিনি উৎসবে ও ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে, সঙ্গ ছাড়েন না, তিনি বান্ধব। যিনি যত স্থানে সঙ্গী থাকেন, তিনি তত বান্ধব।

লোকে বলে, কতকগুলি লোকের সমূহ, রাম শ্যাম যদু হরি প্রভৃতি

লইয়া একটা সমাজ। এটা কাজের কথা নহে। কারণ রামশ্যামাদি ব্যক্তি অমর নহে; তাহারা আজ আছে, কাল নাই। এমন ক্ষণবিধ্বংসী দেহ ধরিয়া সমাজ হইতে পারে না। এই-সকল দেহে যে পুরাণ-পুরুষ, যে দেহী বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মিলনে সমাজ। এখন যে ব্যক্তিসমূহ দেখিতেছি, পূর্বকালে ইহারা অল্প ছিল। ইহাদের আদি এক, ইহাদের জীবনযাত্রা এক ছিল। ইহাদের ভয় ও ভাবনা, সুখ ও দুঃখ, কীর্তি ও অবদান, এক ছিল। শ্রুতি ও স্মৃতিতে, পুরাণ ও ইতিহাসে ইহাদের পুরাণপুরুষের একত্ব ব্যক্ত করিতেছে। কাজেই ইহাদের মার্গ এক, গন্তব্য এক হইয়া রহিয়াছে।

কালান্তরে, বাহ্য নূতনের সমাগমে মার্গ বিচলিত হয়, আভ্যন্তর পুরাতনের প্রবাহে বাধা উপস্থিত হয়। তখন পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব ঘটে। তখন কেহ পুরাতনের জ্ঞাতপথে, সংস্কার ও অভ্যাসবসে, চলিতে থাকে; পুরাতনের দেহে নূতনকে অল্পে অল্পে মিশাইয়া লইয়া পুরাতন রক্ষা করে। কেহ বা মিলনে না গিয়া নূতনের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, এবং নূতনই শ্রেয়ঃ কল্পনা করিয়া জীবনযাত্রা সুগম করিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে, অনতিগামী ও অতিগামী দলের সৃষ্টি হয়। সকলেরই জন্ম-কোষ্ঠীতে গমন লিখিত আছে; কাহারও মৃদু, কাহারও বা শীঘ্র।

কিন্তু যে বন্ধন একটা বিপুল সমাজকে বাঁধিয়া রাখে, সে বন্ধন অতিগামীর প্রবল অপকর্ষণে শিথিল হইলেও সহসা ছিন্ন হয় না। কারণ, ছিন্ন হইলে সে সমাজ নূতন সমাজে পরিবর্তিত হয়। ইহার মার্গ ও গন্তব্য আর পুরাতন থাকে না। তখন দেশ-প্রেম অবলম্বন-হীন হইয়া উদাস প্রেমে পরিণত হয়; আকুল হৃদয় কৃত্রিম আশ্রয় সৃষ্টি করিয়া আত্মতুষ্টি-সাধন চায়। নূতন গন্তব্য একদিনে স্থির হয় না, নূতন মার্গ একদিনে রচিত হয় না।

সমাজের প্রাচীনের প্রতি ভক্তি ব্যতীত দেশ-ভক্তি জন্মিতে পারে না।

এই ভক্তির গুণে জন্ম-ভূমি জননীর তুল্য গরীয়সী। যে নদী-মাঠ-বন, যে ধুলা-মাটি-কাদা, আ-মা-র পিতৃপিতামহগণের চরণ-চার হইয়াছিল, তাহা আমার পূজ্য, কারণ তাহা আমার স্থিতির সাক্ষী। লোকে স্বভাবতঃ রক্ষাশীল। যাহা আছে, তাহা ভাল; যাহা ছিল, তাহাও ভাল ছিল। দেশ-ভক্ত রক্ষাশীল না হইয়া যায় না। তিনি ক্রম পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেন, বিবর্তন পরিহার করেন। কারণ, বিবর্তনে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত হইতে পারে। ইদানী হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি হিন্দুর যে বিচারহীন অনুরাগ প্রবল হইয়াছে, তাহা অতিগামীর অপকর্ষণের প্রতিক্রিয়া, তাহা দেশভক্তির একটা বাহ্য বিকাশ। কারণ, স্বদেশের সত্য প্রাচীনকে বর্জন করিয়া অন্যদেশের ছায়াকে ধরিয়া লোকে দাঁড়াইতে পারে না।

ইদানীর হিন্দু প্রায়ই ভ্রষ্টাচার। তাহার আচারে ও ব্যবহারে শত শত অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। তথাপি সে মনে করে, সে প্রাচীনের বংশধর। এইখানেই ঐক্য। যদি এ দেশে জন-ক্রতু (democracy) প্রবল হয়, তাহা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। ইংরেজ জাতির তুল্য রক্ষাশীল জাতি আর কই ?

আমাদের সমাজ, পরিণামের পথ ধরিতে পারিতেছে না, বিপ্লবের আবর্তে ঘুরিতেছে। পশ্চিমের প্রবল প্রবাহে, পূর্বও পশ্চিমের বিমুখী স্রোতে, আবর্ত জন্মিয়াছে। এখন ধৈর্যের সময়, সংযমের সময়। আমাদের শক্তি অল্প; প্রমাদে ও কৃত্রিম উত্তেজনায় সে শক্তিটুকু ব্যয় করিলে বাঁচিতে পারিব না। দ্বেষের বিপরীত অনুরাগ নহে, অসূয়ার বিপরীত ক্ষমা নহে, দলাদলির বিপরীত প্রণয় নহে।

আশ্চর্য এই, বিজ্ঞজনেও সংযমের শক্তি ভুলিয়া যাইতেছেন, প্রেমের বিনিময়ে বিদ্বেষের বাণিজ্য করিতেছেন। ইহাতে কাম্য যে কতদূরে গিয়া পড়িতেছে, তাহা ভাবনার মধ্যে আসিতেছে না। যাবতীয় দেহীর

ন্যায় সমাজেরও মূলমন্ত্র ঐক্য, অনৈক্য মধ্যেও ঐক্য—ইহা তাহারা উত্তমরূপে না জানেন, এমন নহে।

আমরা যে নির্জীব, তাহার নানা লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ, স্ব-প্রত্যয়-লোপ। কাজটা ভাল করিতেছি, কি মন্দ করিতেছি, তাহা অন্যের প্রত্যয়ে বুঝিতে হইলে জীবনকে ধিক্। কিন্তু সেই দশা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। দুঃখের সময়, বিপদের সময়, পাড়াপড়শীকে ডাকা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু পাড়ার বাহিরে গিয়া গ্রামান্তরের দয়ালুর অন্বেষণ একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? যদি কেহ 'আহা' বলে, অমনই মরমে গলিয়া যাই, চোখ দিয়া জল পড়ে, উপশান্তি বোধ করি। লোকে 'বেশ' 'বেশ' বলিল, যে সে নয় বিদেশী বলিল, ইংরেজ বলিল 'বেশ' 'বেশ', অমনই মানের অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল,—ইহাতে বুঝি আমরা বাস্তবিক নির্জীব, জীবের ভান করিয়া সংসারচক্রে পুত্তলিকার ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছি। আমাদের নিজের প্রত্যয় নাই, বাঁচিয়া আছি, কি মরিয়াছি, তাহার বোধ হারাইয়াছি। বড় বড় লোক, দেশে যাহাদের নাম প্রাতঃ স্মরণীয় হইয়াছে, দেখি তাহারাও আত্ম-প্রত্যয় হারাইয়াছেন। কে কোথায় জীবিত বলিল, অমনই তাহাদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে। যে জাতি পর-প্রত্যয়ে চলে, উঠে ও বসে, সে যে সব হারাইয়াছে। সে জাতির মধ্যে যে দুন্দুভি-ধ্বনি করিবার লোক পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি। সংসারী মানব ধন ও মান চায়; ইহা মানুষ-রূপ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। তথাপি বুঝি, অতিলোভ প্রাকৃত জনের ধর্ম, শিক্ষাবিহীন লোকের ধর্ম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, গ্রামের বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহের বাজনা বাজিলে, গ্রাম-সুদ্ধ লোক উৎসবের আশায় উৎফুল্ল হয়, কারণ তেমন বাজনা প্রত্যহ বাজে না, সকলের বাড়ীতেও বাজে না।

যাহাদের নিজের প্রত্যয় নাই, তাহারা প্রায় স্তব-স্তুতি ভালবাসে, মিথ্যা প্রশংসা ও চাটুবাদ নইলে জীবন শূন্য বোধ করে। চাটুকার

আশ্রিত হইয়া পরে আশ্রয় হইয়া পড়ে ; তখন মিথ্যাকৃতিত্বের লোভে আশ্রয়ও নানা ছল করিতে থাকে। কেহ বিবাহে ছেলে বিক্রী করে নাই ; সংবাদপত্রে এই অসম স্বার্থত্যাগ ঘোষণা না করিয়া ছাড়ে না। পুণ্যকর্ম, দানধর্ম, আর পুণ্য নাই, ধর্ম নাই ; কারণ, উপকারের আশায় যে দান, তাহাকে দান না বলিয়া বিক্রয় বলি। জলাশয-প্রতিষ্ঠা, আতুর-শালা-প্রতিষ্ঠা, বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সময় অন্তর্যামী নারায়ণ সাক্ষী না হইয়া রাজপুরুষ হইতেছেন ; ইষ্টদেবের নামে, ঠাকুরের নামে, না হয় পিতৃ-পিতামহের নামে, উৎসর্গ না হইয়া রাজকুলের নামে হইতেছে। রাজপুরুষ মান্য, অবশ্য পূজ্য। কারণ তিনি, রাজার স্থানে, ন্যায় ও ধর্মের দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। দণ্ডধরের জাতি নাই, কুল নাই, গোত্র নাই ; এবং তাঁহার তুল্য উচ্চ আসন কাহারও নাই। এ সব সত্য। কিন্তু যে হিন্দু আচার লইয়া আকুল, তাহার শাস্ত্রে কাপট্যের প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে। তথাপি বিপদ এই, ইংরেজ জাতির তুল্য বুদ্ধিমান্ জাতি আর নাই। ইংরেজ রাজপুরুষের চোখে ধুলা পড়ে না, পড়ে নিজের চোখে।

দান-ধর্মের তুল্য ধর্ম নাই। কিন্তু যখন দেখি, দানধর্ম দম্ভের কারণ হইয়াছে, দাতা নিজের নামটি ভুলিতে পারিতেছেন না, তখন ধর্মের গ্লানি অনুভব করি। এক নগরে এক বিষয়ে নানা জনের দান থাকিলে দাতার নামে দানের বিশেষ করিবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। কারণ, সকল দানের লক্ষ্য এক। কিন্তু 'সবে ধন নীলমণি' হইলে নগরের নামে দান উৎসর্গ করিলে দেশভক্তির পরিচয় পাইতাম না কি ? এইরূপ, "দাতব্য" কুষ্ঠাশ্রম, "দাতব্য" আতুরাশ্রম, "দাতব্য" সভা প্রভৃতির "দাতব্য" বিশেষণে বিজাতীয় দান ব্যক্ত করিতে থাকে। কারণ হিন্দুধর্ম, প্রাচ্যধর্ম, মানুষের প্রতি অবজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেখিয়া মর্মে মর্মে রোদন করিতে থাকেন, "দাতব্য" সভা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করেন, বাঙ্গালা ভাষাও "দাতব্য"

শব্দে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। নিরন্নের অর্থলোভ বুঝিতে পারি ; কিন্তু ধনীর অভিমান-লোভ মোহের ফল নয় কি ?

অভিমান নিশ্চয়ই চাই। কুরুকুল ধ্বংস হইয়া গেল, দুর্যোধন অভিমানে অটল। উদার, অনুদার, যিনি যাহাই হউন, তাহাঁর অভিমান না থাকিলে তাহাঁকে মানুষ বলিতে পারি না। যাহাঁর মনুষ্যত্বের অভিমান নাই, তাহাঁর কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশে যাহাঁরা দয়াশীল, যাহাঁরা নেতা, তাহাঁরা এই সোজাকথা ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকারে দেশের অভিমান খর্ব করিতেছেন। দান পাইলেই হইল, বিচার নাই ; সেই দানে নিরন্নের ও নির্বস্ত্রের দুঃখ দূর করিতে বসিয়া যান। যে "গোরু মেরে জুতা দান" করে, তাহার পাপ অধিক, না সে দানের গ্রহীতার অধিক ? লোকে বলে, আজকাল দাতা বিরল ; আমি বলি গ্রহীতা বহুল ! এই গ্রহীতা বাঁচিলে কি, মরিলেই বা কি ? দান-গ্রহণে মানীর মার মাথা কাটা যায়। যাহার মাথা বাঁচাইতে পারিলাম না, তাহাকে নির্জনে নিঃশব্দে মরিতে দেওয়াই ভাল। প্রতিকার থাকিতেও কত লোক ব্যাধিহত হইতেছে ; ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া নিরাহারে মরিলে অধিক আর কি ?

কিন্তু অভিমান অর্থে অহঙ্কারও বুঝায়। মান-বোধ ঠিক হইলে অহঙ্কার বা দর্প আসে না। অভিমানী দর্প করে না, বরং আচার-ব্যবহারে আত্ম-সংযম করে। ইদানীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধির তুল্য অভিমান কাহারও দেখি না। তিনি দেশের অভিমানে দীনের ন্যায় আচরণ করিয়া আপনাকে উচ্চ স্থানে বসাইয়াছেন। যাহারা লম্বা কোঁচায় বুক ফুলাইয়া চলে, তাহারা অভিমানের ধার দিয়াও যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ইদানী অনেক নব্য-শিক্ষিত এই দুইএর প্রভেদ বুঝিতে পারেন না, 'হেট-কোট-নেকটাই' আঁটিয়া মনে করেন, ভাগ্যে-ভাগ্যে মানটা বজায় রহিল। যাহাঁদিগকে এমন কৃত্রিম কৌশলে মান রক্ষা করিতে হইতেছে,

তাঁহারা প্রমত্ত। নতুবা এমন দৈন্যের নিশানা উড়াইয়া, স্বদেশকে অস্বীকার করিয়া, কোন্ মানী একদিন বাঁচিতে পারিত? রেলে কি ষ্টীমারে, আপিশে কি হাওয়াখানায়, সাহেবী পোষাকে তাঁহারা যে মান পাইয়া থাকেন, তাহা দেশকে অপদস্থ করিয়া পান না কি? পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলে মহাপাতক হয় না; আমরাও পুরাতন জোড় পরিতেছি না। এ সব সত্য; কিন্তু কোনও দিন দেশকে হেট-কোট-নেকটাই পরাইতে পারিব কি? ইংরেজ কখনও এ দেশের ধুতি পরিয়াছে কি?

স্ব-প্রত্যয়, চৈত্তিক সভ্যতায় ব্যক্ত হয়, ভৌতিক সভ্যতায় ভান হয়। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া থাকার নাম স-ভ্য-তা। ইহার নিমিত্ত বহু ক-ল-না আবশ্যক; ইহাতে বহু ছদ্ম ও ছলনা থাকিবেই থাকিবে। বস্ত্র পরিয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি না, বস্ত্র না পরিয়াও থাকি না, সভাতে বসিতে পারি না। ইহা সভ্যতার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত। এইরূপ, দুইখানা পা দিয়া না চলিয়া যখন চক্র ঘুরাইয়া পথ অতিক্রম করি, তখন সভ্যতার আর এক সোপানে উঠিয়াছি। উঠিতে উঠিতে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, তিনকেই গমন-মার্গ করিয়া ফেলিয়াছি। এসব ভৌতিক সভ্যতা; পঞ্চ মহাভূতকে কল্পনা দ্বারা বশে আনিয়া দেহের সুখবৃদ্ধি-জনক সভ্যতা। কিন্তু আর-এক সভ্যতা আছে। সভাতে ক্ষুৎকাসি বোধ করিয়া, সমাজে স্বাভাবিক পশু-প্রবৃত্তি দমন করিয়া, অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানও সভ্যতা। রাগ-দ্বেষাদির সংযম, আর-এক কথায়, চিত্তের সংযম, চৈত্তিক সভ্যতা। এই দুই-এর মধ্যে কোন্‌টা, তাহাও ত জানি।

ধর্মের গতি সূক্ষ্ম; তত্ত্বের ত কূল পাওয়া যায় না। তথাপি, হতভাগ্য ব্যতীত সবাই বুঝি, কোন্‌টা কু-কর্ম, কোন্‌টা সু-কর্ম, কোন্ কর্ম অধর্ম, কোন্ কর্ম ধর্ম। বর্তমান ইয়োরোপের অর্থনীতি, অর্থোপার্জনে ধর্মাধর্ম বিচার করে না; মনে করে, প্রবৃত্তিমার্গ প্রসারিত

করিতে মানুষের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য আপনা-আপনি ঠিক হইয়া আসিবে। অর্থাৎ মানুষকে পশু কল্পনা করিয়া প্রিয়, প্রিয়তম, অন্বেষণ করিতে বলে; প্রশস্ত, শ্রেয়ঃ, শ্রেষ্ঠ বুঝিতে পার, ভালই; না পার, ক্ষতি নাই। কারণ পরজন্ম আছে, কি নাই, বিজ্ঞানশালায় তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইয়োরোপের প্রচলিত বিজ্ঞান বলে, যোগ্যতমের জয়; বলে, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া চল। কিন্তু বলে না, যোগ্যতম কি; বলে না, জয় দ্বারা যোগ্যতমের সম্ভব হইতে পারে কি না। ক্ষয়ের দ্বারা ধনের সঞ্চয় হইতে দেখি কি ?

আমাদের দেশের বিজ্ঞান বলে, প্রবৃত্তি-মার্গের শেষ নাই; যাহার শেষ নাই, তাহাতে কত দৌড়াইবে ? বলে, যোগ্যাযোগ্যের মাপ-কাঠি এ জীবনে নাই; সে মাপ-কাঠিতে সবাই যোগ্য, অযোগ্য কেহ নাই। জীবে জীবে সংগ্রাম নয়, জীবে জীবে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, এমন দুর্লভ জন্ম হেলায় পাত করিও না, আনন্দ অন্বেষণ কর।

যে দেশের বিজ্ঞান এই ভাবের কথা বলে, সে দেশে সে বিজ্ঞান শেখানো হইতেছে না। পাকে-প্রকারে শেখানো হইতেছে, সুখবাদই চূড়ান্ত। এমন ধাক্কা, এমন ভাঙ্গা, সাম্‌লাইয়া চলা—দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! স্ব-প্রত্যয় হারাইয়াছি, পর-প্রত্যয়ে চলিতেছি, ফিরিতেছি। পর-প্রত্যয়ে ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না, দেশ-প্রেমও জাগে না। বাগ্মী ও কবি চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "ভারতসন্তান, জাগ, জাগ।" ভারত-সন্তান জাগে না, কারণ জাগিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে ঘুমানো মন্দ কি ?

বহু উপদেশক বলেন, চাকরি করিও না। কারণ, অনেক চাকরিতে পয়সা কম, প্রভুর মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে নিজের স্বাধীনতা ও ধর্মবুদ্ধি থাকে না। কথাটা সত্য বই কি। কিন্তু সেবক

নইলে সমাজ চলে না,—রাজ্য চলে না। ইয়োরোপের অর্থনীতি বলে, কতক লোক ভৃত্য হইবেই, সংসারে দারিদ্র্য থাকিবেই, তুমিও ভৃত্য পাইবে। ভর্তা ও ভৃত্যের দ্বন্দ্বও চিরকাল থাকিবে, কারণ ভরণের মাপকাঠি নাই, যে যত টানিয়া মাপিয়া লইতে পারে, সে তত লইবে। আমাদের দেশে বলে, সেবাধর্ম অতি গহন বটে; কিন্তু সেবাধর্মের তুল্য ধর্ম নাই, দাস্যভাবের তুল্য ভাব নাই। যে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবা করে, তাহার ধর্মবুদ্ধির তুলনা নাই, ঐশ্বর্যের সীমা নাই।

এই ভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। মনিবকে ফাঁকি দিয়া মাসের শেষে মাহিনা আদায় করিতে পারা বুদ্ধির কার্য বিবেচিত হইতেছে। সেবা অবৈতনিক হইলে ত কথাই নাই, তাহা অনুগ্রহ-মধ্যে গণ্য হইতেছে। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া খানিকটা দেশ ভাসিয়া গেল, বিদেশের নয়, আমাদেরই দেশের যুবজন বিপন্ন দেশবাসীকে উদ্ধার করিয়া আসিল। ইহাতে অনুগ্রহ কি, প্রশংসার হেতুই বা কি? কিন্তু দেশের আত্মপ্রত্যয়হীন নেতৃকুল পর-প্রত্যয়ের লোভে যুবাদিগের কর্ণপটহ দুন্দুভি-নিনাদে ছিন্ন না করিয়া ছাড়িলেন না। স্তব উৎকোচ-বিশেষ, উৎকোচও আর কিছুই নহে, দেনা ও পাওনা। ইস্কুলে উৎকোচ চলিতেছে, সেবার জন্য নহে, ভালমানুষির জন্য; বিদ্যামহাপীঠেও উৎকোচ, বিদ্যা-অর্জন কর্তব্যের জন্য চলিতেছে; দেশের বালক ও কিশোর ও যুবা উৎকোচে পালিত হইতেছে। ইহারা বড় হইয়া উৎকোচের আকাঙ্ক্ষায়, সেবা ও ধর্মের মাহাত্ম্য ভুলিয়া যাইতেছে। মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌বোর্ডের মেম্বর, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি গভর্মেণ্টের কাউন্‌সিলের মেম্বর, প্রভৃতি হইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও উদ্‌বেগ দেখিলে মনে হয়, ধন্য আমার দেশ, যে দেশে এত লোক, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ শিষ্ট ও নীতিমান্, সেবক হইতে চাহিতেছেন! পরে বুঝি, সেবার কাড়াকাড়ি নয়, পদের কাড়াকাড়ি! কিন্তু, পদের গৌরব কিসে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না।

দেশের লোক যে অসত্যের প্রতি ধাবিত হইয়াছে তাহা আদালতের মকদ্দমা গণিলে বুঝিতে বাকি থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মকদ্দমার বৃদ্ধি সভ্যতার লক্ষণ। লোকে যে অত্যাচার, যে অন্যায়, আগে সহিত, এখন তাহা সহিতেছে না। আগে লোকে নির্বোধ ছিল, নিজের অধিকার ও স্বত্ব বুঝিত না, এখন বুঝিতে পারিতেছে। কথাটা কিছু সত্য বই কি। কিন্তু গ্রামে "২১১ ধারা" এত শুনি যে, তাহা আমারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। অল্প সত্যকে মিথ্যার দ্বারা বাড়াইলে ধর্ম রক্ষা পান না। ভয়ে ভয়ে সজ্জনে আপোষে মকদ্দমা মিটাইতে চান। অসত্যতা যে বাড়িয়াছে, তাহা কে না জানে? ইহার কারণও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রতারণা চলিতে পারিলে চলে, চুরি হইতে পারিলে চুরি বাড়ে। বিলাতি সভ্যতার সহিত আইনের ও নজীরের যে চুলচেরা ভাষ্য আসিয়াছে, যে ভাষ্যের ভাষ্য ছাপাইতে বড় বড় ছাপাখানা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, সে আইন, সে সূক্ষ্মনীতি আমাদের এই অ-সভ্য বা অল্প-সভ্য সমাজের নিমিত্ত প্রণীত না হইলেই ভাল ছিল। অসভ্যকে সভ্যের সংসর্গে আনিলে অসভ্য হীনবীর্য ও কলুষচিত্ত হইয়া অধোগত হয়, তাহারা ধূর্ত ও নিঃসত্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যাহার যে ধর্ম তাহা সে ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে এই পরধর্ম ভয়াবহ বিপ্লবে পরিণত হয়। বাঙ্গালী যখন প্রথম ইংরেজী সভ্যতার সুখবাদে মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন তাহার কদাচারের সীমা ছিল না; এখন সে কদাচার হইতে বাঙ্গালী কতকটা সাম্‌লাইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা পিতৃপিতামহের বহু সুকৃতির ফলে। ধর্মের হানির তুল্য ক্ষতি আর কিছু নাই। যাহার নাম ধর্মের অধিকরণ, সেখানে সজ্জন যাইতে ভয় পায়। কারণ সেখানে লুকাচুরির ও সূক্ষ্মবুদ্ধিচালনার অন্ত নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক ন্যায়ের নিক্তি ধরিয়া থাকিলেও আইনের কূটতর্কে, ঘটনার কৃত্রিম সমাবেশে, বৃষরূপী ধর্ম মাত্র একপাদে দাঁড়াইয়া আছেন।

যাঁহারা ব্যবহারাজীব, উকীল, মোক্তার, টৌর্ণি তাহাঁরা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, মানে ও ধনে, দেশের অগ্রণী। কেবল এ দেশে নয়, সব দেশেই; কারণ, ইহাঁরা দেশের নিয়ম যেমন জানেন, অন্যে তেমন জানে না। ইহাঁদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ, মানুষের মতন মানুষ, আছেন। কিন্তু আইন আদালতের এমন গণ্ডি, তাহার ভিতরে যিনি প্রবেশ করেন, তিনিই চিত্তে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়েন। আইনে দোষ নাই, ধর্মে বাধিলেও আইনে বাধা নাই, এইরূপ যুক্তি এড়াইতে পারা সোজা নয়। কারণ যুক্তিতে স্বার্থবাদ চরিতার্থ হয়।

ধনী, মানী, জ্ঞানীর ব্যবহার দেখিয়া অপরে ব্যবহার শেখে। তাহাঁরাই সমাজের আদর্শ, তাহাঁরাই শিক্ষক; ইস্কুলের মাষ্টার নয়, টোলের অধ্যাপক নয়, ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিও নয়। কারণ, ইহাঁদের বিদ্যা থাকিলেও "বুদ্ধি" নাই, যাহার জয়ডঙ্কা বাজাইয়া সংসার-সাগর হেলায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। যে বুদ্ধি দ্বারা ধন ও মান দুইই লাভ করিতে পারা যায়, সে বুদ্ধি ছাড়িয়া কে অন্যবুদ্ধির উপাসনা করিবে? তাইত ইস্কুলের মাষ্টার, টোলের অধ্যাপক, সমাজের কৃপার পাত্র হইয়া আছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আইন শিখাইবার কলেজ, উকীল তৈয়ারির কল কিছুদিন বন্ধ করিলে ভাল হয়। কারণ মাল বহুৎ জমিয়া গিয়াছে, কাট্‌তির চেয়ে গড়্‌তি বেশী হইয়াছে। সমাজ বলে, যখন ধন-মানের লোভ এত, তখন আইন-কলেজ আরও খোলা হউক, উকীল, আরও বেশী হউক, লভ্য ধনের ভাগ হইয়া যাউক। ওকালতি দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না, রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি ধনোৎপাদকের ধন উকিলের ঘরে সমাহৃত হয়। এই সমাহরণের ব্যাপ্তি হইলে মন্দ কি? ব্যবসায় মাত্রেই ভাগ্য পরীক্ষা। কিন্তু তা বলিয়া যে ধর্মেরও পরীক্ষা না হইতেছে, এমন নয়। বৃত্তির দোষ নাই; যে বিধানে বৃত্তির মূল্য চড়িয়া গিয়াছে, সে বিধানের দোষ। ডাক্তারি বৃত্তি ধরুন। এমন প্রশস্ত বৃত্তি আর কি

আছে ? যিনি আতুরের সেবা করেন, মৃতবতের প্রাণরক্ষা করেন, তিনিই ত মানুষ, নররূপে দেবতা ; কিন্তু যে বিধানে তাঁহার বৃত্তির মূল্য ধার্য হইয়াছে, সে বিধানের দোষে বাড়ীর পাশে ডাক্তার থাকিতেও বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাইতেছে। ডাক্তার হইলেই যাঁহাকে সাহেব সাজিতে হয়, তিনি বিনা ডাকে কি করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিবেন ?

বিলাতী কলের ও সেই সঙ্গে বিলাতী কলার—চাতুরীর আমদানি হইয়াছে। কলের তেল, কলের আটা, কলের কাপড়, প্রভৃতি কোন্ কলে খাঁটি মাল বাহির হইতেছে ? আইনমন্ত্রী দণ্ডবিধির ধারা বাড়াইয়া বাড়াইয়া হয়রান। কিন্তু দণ্ডের ধারা, আর ধর্মের ধারা ত এক নয়। এ দেশেও নয়, বিলাতেও নয়। সে দেশেও ধারার পর ধারা যোগ করা হইতেছে ; কিন্তু বুদ্ধিও পৃথ্বীর তুল্য বিপুলা। কৈমিতিক বিশ্লেষণ-বিদ্যা শিখিতে পারেন, কিন্তু ধর্মজ্ঞান দিতে পারেন না।

কেহ কেহ বলে, ক্রয়-বিক্রয়ে, বাণিজ্যে অসত্য কহিতে হয়। কারণ ক্রয়-বিক্রয়, দান-ধর্ম নয় ; অর্থে নির্লোভ হওয়া বাণিজ্য নয়। তা ত নয় ; কিন্তু অসত্যে পুণ্যও নয়। তা ছাড়া, অসত্যে দোকান-পাটও টেকে না, তুলিয়া দিতে হয়। বাঙ্গালীর বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন এক চমৎকার কৌতুক। প্রথমে মনে হয়, তাদের বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। তারপর মনে হয়, এমন নির্বোধ, যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নির্বোধ মনে করে। দুঃখ হয়, ব্যবসায়-বুদ্ধি নাই, মনে করে, অত্যুক্তি বঞ্চনা নয়।

বাঙ্গালী বাইরে যতই বড়াই করুক, তাহার ব্যবসায়ে, তাহার সমবায়ে, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতেছে না ; ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে দশহাত পিছাইয়া পড়িতেছে। এই জাতিগ্লানি স্মরণ হইলে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। কারণ, এইখানেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। অবিশ্বাসের হেতু, কেবল অপটুতা নহে ; অপটু হইলেও সত্যপরায়ণকে

কে না বিশ্বাস করে ? অবিশ্বাসের শিকড় ভাসা-ভাসা নহে, বহুদূরে বহুনীচে চলিয়া গিয়াছে, সমাজরূপ বৃহৎ অট্টালিকার পোতে গিয়া ঠেকিয়াছে। অর্থনীতির সাধ্য নাই, সে মূল উৎপাদন করে ; 'হা অন্ন' 'হা বস্ত্র' রবে দশদিক বিদীর্ণ হইলেও সাধুশীলতা আপনাআপনি জন্মিবে না। বঞ্চনায় বিদগ্ধতা প্রকাশ পায় ; বাঙ্গালী একটু স্থূলবুদ্ধি হইলে, বোধ হয়, বিশ্বাসভূমি হইতে পারিত। সমাজযন্ত্রের কোথায় কোন্ কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহার খোঁজ না লইয়া উপরের চাকায় অগ্নিতপ্ত তৈল নিষেক দ্বারা কি হিত হইবে ? যেখানে চোরে চোরে মাসতোত ভাই, সেখানে কে কাকে চোর বলিবে ? তা ছাড়া, আইনে যে চুরি ধরা পড়ে না, সে চুরিতে অর্থের উপার্জন, উচ্চপদে অধিষ্ঠান, কিংবা মানের কেতন-উড্ডয়ন, কিছুই বাধে না। ইহাই ত জীবনের সার্থকতা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, "দেখ, আমি পাঁচ টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন আমার পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি হইয়াছে।" কিন্তু পাঁচ হইতে পাঁচ লাখ, ভাগ্যের খেলা, না পৌরুষের পরিচয়, তাহা শ্রোতার কানে পহুঁছে না। দেশ-লক্ষ্মী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি আমার ধনবৃদ্ধি করিয়াছ, বিদেশীর লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার ধনরক্ষা করিয়াছ, বিদেশ হইতে আনিয়াছ ?" তখন কেহ বলে, "মা, তোমার ব্রীহি বৃদ্ধি করিয়াছি, তোমার রাম শ্যাম পুত্র পারে নাই, আমি তপস্যা দ্বারা পারিয়াছি।" কেহ বলে, "আমি তোমার যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া তোমার সেবায় লাগাইয়াছি, তস্কর খুঁড়িয়া লইতে বসিয়াছিল, আমি তাহার সন্ধি দেখিয়া লইয়াছি।" কেহ বলে, "আমি তূষ দিয়া গম আনিয়াছি, জুট দিয়া কাপড় কিনিয়াছি, অভ্র বেচিয়া ঔষধ পাইয়াছি।" মা-লক্ষ্মীর বদনকমল প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তথাপি জিজ্ঞাসা করেন, "দেখ,

আমার রাম-শ্যাম বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হীন; আমার ধনের রক্ষা ও বিনিময় বৃদ্ধি করিতে গিয়া তাহাদের দুঃখ বাড়াও নাই ত? উপার্জিত ধন বাঁটিয়া লইয়াছ ত?"

গত জানুয়ারি মাসের "মডার্ন্ রিভিউ" নামক মাসিক পত্রে মা-সরস্বতীর ১৪ জন পুত্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম। ৮ জন এম্-এ, এম্-এস্সি পাশ এবং ৬ জন বি-এ, বি-এস্সি পাশ বাঙ্গালী যুবা কলিকাতায় নেশা-বিক্রির দোকান খুলিয়াছে! কেহ কেহ উদ্দেশ্যও বলিয়াছে, মাদক-বিক্রয়ে পুঁজি লাগে অল্প, কিন্তু লাভ হয় প্রচুর। অর্থাৎ রাতারাতি বড়মানুষ হইতে পারা যায়। কিন্তু আরও সোজা পথ ছিল, তাহাতে মূলধন কিছুই লাগে না। দস্যু নিদ্রিতের টাকা-কড়ি আত্মসাৎ করে, মাদক-বিক্রেতা জাগ্রৎকে পশু করিয়া তাহার সর্বস্ব—তুচ্ছ টাকা-কড়ি নয়—তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। এক সুরা-বিক্রেতা বলিয়াছে, পেটের দায়ে এই ঘৃণ্য কর্মে রত হইয়াছে। কর্মটা যে ঘৃণ্য, দেশের ভাগ্য, সে বোধ এখনও লুপ্ত হয় নাই। তথাপি মনে হয় না, পেটের দায়ে গাছের পাতা খাইতে হইয়াছিল।

আরও আছে। "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন, ঢাকার নব্য-শিক্ষিত শতাবধি বাঙ্গালী মাদক বিক্রয়ের অনুজ্ঞা চাহিয়াছিল। কে পাইল কে না পাইল, ইহা লইয়া পরে রেষারেষি হইয়াছিল! "সঞ্জীবনী" রুষ্ট হইয়াছেন, বিদ্যামহাপীঠের বহি হইতে এই-সকল হিতাহিত-বিচার-শূন্য যুবকদের নাম কাটিয়া দেওয়া হউক। সমাবর্তনের (graduation) সময় কানে নাকি মন্ত্র দেওয়া হয় "সচ্চরিত্র হইবে" ?

আমি বলি, রোষের কারণ নাই, ক্ষোভের কারণ আছে। জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যামহাপীঠে এবং তাহার আশ্রিত আয়তনে ধর্মাধর্মজ্ঞান জন্মানা হয় কি? ধর্মকর্মে অভ্যাস করানা হয় কি? সত্যকাজ এক ত নয়। ধর্ম-জ্ঞান কিছুই হয় না, তাহা নহে। কিন্তু এত অল্প, এত পরোক্ষ,

যে তাহা দ্বারা ভৌতিক সভ্যতার সুখবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে পারা যায় না। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞানে বড়-কিছু হয় না।

আমার বিশ্বাস, এই-সকল যুবার মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। কারণ কোরানে মদ্যপান নিষিদ্ধ। হিন্দুশাস্ত্রেও নিষিদ্ধ; কিন্তু হা শাস্ত্র, পায়ে দলিতে শিখাইতেছি, কারণ তাহার সবটা সনাতন নয়; যে সমাজের অন্ত্যেষ্টির আশায় বসিয়া আছি, কারণ তাহার সবটা বর্তমানের যোগ্য নয়; কোন্ মুখে তাহার শরণাগত হই? খ্রীষ্টান-পাদ্রী হিন্দুর ভক্তি-বিগ্রহের নাম পুত্তলী রাখিয়াছে। হিন্দুর ছেলে পুতুলখেলা ছাড়িয়াছে, কিন্তু মন্দিরে যায় না, গির্জাতেও যায় না। দেশে এমন উপদেশকও জন্মিয়াছেন, যিনি দিনে দশ-বার রঘুনন্দনের আদ্যশ্রাদ্ধ করেন; কারণ তিনি তাঁহার তত্ত্বে আমাদের বর্তমান পাতকের বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ নবদ্বীপের ন্যায়পঞ্চাননের টিকী টানিয়া মস্তকে ঘটাকাশ ও পটাকাশ আবিষ্কার করিতেছেন, কারণ আমাদের অন্ন-ঘটে কেবল আকাশ, বস্ত্র-পটেও কেবল আকাশ। স্নেহলতা পুড়িয়া মরিল; এমন নিদারুণ ঘটনাতেও মুখে 'আহা' বাহির হইল না; বাহির হইল গালি।

এক হিন্দুকুলবধূ শাশুড়ীর তিরস্কার সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল; আর-এক বধূ,—হিন্দু কি অহিন্দু জানি না,—হিন্দুসমাজের জরা-গ্রস্ত পিতামহীর বধির কর্ণে ধিক্ ধিক্ বলিতে বসিলেন, যেন ভৎসর্নামন্ত্রে জরা গিয়া উদ্ধত যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এক উপদেশক শিশুমৃত্যুর সংখ্যাধিক্যে ব্যথিত হইয়া জননীকে শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে বলিয়াছেন, যেন মা নিজের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছেন। কেহ শিশু-কল্যাণ-কামনায় প্রদর্শনী খুলিতে লাগিয়া গিয়াছেন, যেন বাল ও যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, পরম কল্যাণে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। ইহাদের অভিপ্রায় শুভ; কিন্তু বিলাতী বাদের অনুবাদ দ্বারা দেশ জাগে না। কারণ সেটা অনুবাদ। আর, পরিবাদে অনুবাদের তুল্য অসহনীয় কিছু নাই। ইহাঁরা কলি-

কাতাকেই দেশ মনে করিয়া তাহার সুরম্য হর্ম্যে ভোগের সহস্র উপকরণে, রাজপথের কুট্টিমে, রথচক্রের ঘর্ঘরে, দেশের নাড়ীর বেগ অনুভব করেন। যদি এই ভ্রমে না পড়িতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, হিন্দুসমাজ সুখে নাই, দেশ সুখে নাই। তাহার হৃৎপিণ্ড অসাড় হইয়াছে, তাহার শ্বাসে মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। এ সময় ঔষধ চাই, সুপথ্য চাই। এখন উপহাসের ও উপদেশের সময় নয়; ধীরভাবে সেবার সময়। সমাজ মাত্রেই স্বভাবত রক্ষাশীল,—এ কথা কে না জানে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, ইংরেজের সংসর্গে, আমাদের চিরপোষিত সংস্কারে আঘাত পড়িতেছে; এমন আঘাত, যাহাতে সমাজ-সৌধের মূল পর্য্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে। অবিরত ভাঙ্গা চলিতেছে, গড়ার দিকে মন নাই। এখন সবাই প্রভু, আজ্ঞাকারী কেহ নাই। বলে, স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা নষ্ট করিতে পারি না। স্বেচ্ছাচারিতাকে বলে স্বাধীনতা; যেন স্বাধীনতার মধ্যে শাসন থাকে না। স্বেচ্ছাচারীর নিমিত্ত কিন্তু বিস্তীর্ণ অরণ্য পড়িয়া ছিল। সেখানে তিনি বাক্‌স বাক্‌স রঙ্গ ও বোঝা বোঝা তুলী লইয়া গিয়া যত-ইচ্ছা-তত মোহিনীর রূপ-লাবণ্য হাবভাব লিখিতে পারিতেন; চিত্রে কেহ কালী ঢালিতে যাইত না। গদ্যের ও পদ্যের কলা-কুশলীও গাড়ী গাড়ী কাগজ লইয়া গিয়া মনের সাধে, গল্পে ও উপন্যাসে, নানা ছন্দে ও বন্ধে, প্রেমের লুকাচুরি স্বচ্ছন্দে বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন, কেহ চুরি করিয়া পড়িতে যাইত না। একদিকে কান্তকলার নামে যথেচ্ছাচার, অন্যদিকে সমাজের স্বাভাবিক পুরাতন শীল, এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কাব্য দ্বারা যেমন শাস্ত্র, পুরাণ দ্বারা যেমন কাব্য, এবং গীত দ্বারা যেমন পুরাণ লঘু ও হত হইয়া পড়ে, সমাজও লঘু ও হত হইতেছে। ব্যতিব্যস্ত সমাজ নূতন আদর্শ খুঁজিতেছে, যাহাকে সম্মুখে রাখিয়া আত্ম-লুপ্ত না হইয়া বাঁচিয়া বড় হইতে পারে; কিন্তু কেহ সে আদর্শ-নির্মাণে মনোযোগ করিতেছেন না।

কেহ বলেন, 'চরিত্র-বল' বাড়াও; কিন্তু বলেন না, কোথা হইতে এই

বল আসিবে। কেহ বলেন, 'নৈতিক-বল' বাড়াও। কিন্তু পূর্বোক্ত সুরা-বিক্রেতার নীতির বল কম কি? যাঁহারা সমাজনীতি অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মপ্রসাদ চাপিয়া রাখিয়া, কর্মমাত্রেই, বৃত্তিমাত্রেই গৌরব-জনক,—এই ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহাঁদের নীতিব বল অল্প কি? কেহ বলেন, মেরুদণ্ড সোজা কর। কিন্তু মাংসের ক্বাথে ও শারীরিক ব্যায়ামে সে মেরুদণ্ড সোজা হয় না। কিসে হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ। দেশে নবদ্বীপ থাকিতেও ন্যায়-চর্চার ফল ফলিতেছে না, কার্যকারণ-নির্ণয়ে ভ্রম হইতেছে, কাবণে না পশিয়া কার্য ধরিয়া টানাটানি চলিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, লোকনিন্দা প্রবল করিয়া বর্তমান সমাজে দুর্নীতি ও ব্যক্তির অসাধুতা দমন কর। ইহা মন্দের ভাল বটে; কাবণ আমবা লোকাপবাদ যত ভয় করি, রাজদণ্ডকে তত ভয় করি না। কিন্তু বিপদ এই, বর্তমান বিপ্লবের সময় লোকমত স্থির হইতে পারে নাই, সমাজশাস্ত্র রচিত হইতে পারে নাই। তা ছাড়া, যে বান্ধব আমার সমসুখদুঃখভাগী সে বান্ধবের নিন্দাই আমাব পক্ষে লোক-নিন্দা। সে বান্ধব অদ্যাপি একমত হইতে পারেন নাই। অ-বান্ধবের নিন্দায় হিতে প্রায়ই বিপরীত হইয়া পড়ে; সমাজ, শিশুর ন্যায়, বাঁকিয়া বসে। চিত্তের দুর্বলতা হউক, কোনও সমাজ নিজের শাসন অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে চায় না। এই কারণে দেখিতেছি, যাহাঁরা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে অতিগামী, তাহাঁবা সামাজিক অধিকার দানে মন্থরগামী হইয়া পড়িতেছেন।

আমাদের প্রবৃত্তি কোন্ পথে চলিতেছে; সে পথ শ্রেয়ঃ কি না, শ্রেয়ঃ না হইলে কোন্ পথে চলা কর্তব্য, এবং সে পথে দেশকে চালাইবার উপায় কি,—এইসব প্রশ্নের উত্তর চাই।

ছোট ও বড়

অনেক দিন হ'ল একবার দার্জিলিং হ'তে আসছিলাম। দিনের বেলা, ঘণ্টা চারির পথ, গাড়ীও খালি। একখান থার্ডক্লাসের টিকিট নিয়ে গাড়ীর আগের কামরায় আগের বেঞ্চিতে বসলাম। একটু পরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক,—মলিনবর্ণ, আধ বয়সী, দোহারা, আড়ময়লা পেনটুল-চাপকান পরা,—এক হাতে খাবার ঠোঙ্গা আর হাতে পানের পুটলী নিয়ে পান চিবাতে চিবাতে, এ-কামরা সে-কামরা দেখে, কি জানি কেন, সেই কামরায় উঠলেন। আমি দরজার কাছে বসেছিলাম তিনি খাবার ঠোঙ্গা ও পানের পুটলীটি বেঞ্চিতে রেখে আমার পাশে বসলেন আর পান চিবাতে লাগলেন। দেখতে না দেখতে এক দল গোরায় ষ্টেশন ভরে' গেল। সকলের হাতে এক এক বন্দুক, গায়ে এক এক রা'শ বোচকা। গাড়ীর কামরার দরজা খুলে হুড় মুড় করে' তারা উঠতে লাগল। আমাদের কামরায় প্রথমে উঠল এক মেম্, তার কোলে তিন-চার মাসের এক ছেলে, তার পর এক গোরা, আবার এক গোরা। তাদেরও সঙ্গে তেমনই বোচকা, তেমনই বন্দুক; কতক বেঞ্চিতে, কতক মেজেতে ধুপধাপ করে' ফেলে আমাদের সামনের বেঞ্চিতে বসল। তা'দিকে ঢুকতে দেখেই আমার সহযাত্রী বন্ধু এক হাতে খাবার ঠোঙ্গা আর হাতে পানের পুটলীটি নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। ক্ষণেকের তরে তাঁর নেত্র ভ্রূকুটি-কুটিল, মুখ আবর্জিত হ'ল যেন যুদ্ধং দেহি বলবেন। "বেটারা দেখছি বিপদ ঘটালে।" পরক্ষণেই কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত হ'ল। গোরা দুজনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, You conquerors go with us conquered? গোরাদ্বয় হাঁ না কিছুই বললে না! You go first class, we go third class,—

তথাপি সাড়া নাই। We go third class, you go first class. মেম যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেন কে কাকে বলছে, গোরাদ্বয় বুঝ্‌তে পারলে না। This my food, this my betel, you touch, I starve. এই বলে-ভদ্রলোকটি একে একে হাত দেখাতে, তারা মুখ চাওয়া-চায়ি করে' মেমকে কি ইসারা করলে। তার পর দুইজনেই হুড়মুড় করে' কামরা হ'তে নেমে পাশের কামরায় ভিড় ঠেলে গিয়ে বসল, মেমসাহেব সে-পাশ থেকে সরে' এসে আমার সাম্‌নে বসলেন। রেলের ঘণ্টা বাজল, গাড়ীও ছেড়ে দিলে। বন্ধুবর হাঁফ ছেড়ে স্বস্থানে বসলেন, খাবার ঠোঙ্গা ও পানের পুটলীও পূর্বস্থানে রাখলেন। চকিতের মধ্যে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল! আমার বিস্ময় দেখে তিনি নীতি বুঝিয়ে দিলেন। "বেটাদের সঙ্গে জোর করলে হ'ত কি ?"

বাস্তবিক, তোমরা সবল আমরা দুর্বল, তোমরা বড় আমরা ছোট,—এই স্বীকার, কাজে ও ভাবে দেখতে পেলে, বর্বর ও নিষ্ঠুরও অভয় দান করে। কারণ, ক্ষমা না করে' শক্তির সার্থকতা হয় না। অন্য দিকে, যা প্রাপ্য বলে' মনে করি, তা পেতে নিজকে ছোট স্বীকার করতে কথনও সুখ হয় না।

যখন এই দেশ ইংরেজের হাতের মুঠার মধ্যে এল, যখন ইংরেজ বুঝলেন নিজের শক্তি সামর্থ্য, তখন তা' বাইরেও প্রকাশ করতে ব্যগ্র হ'লেন। কারণ প্রভু হয়ে এদেশকে অন্ধকারে ও দুর্দ্দশায় রাখলে প্রভুত্বেই সন্দেহ হয়। এই-হেতু নিজের তৃপ্তির আশায় তাঁদের উন্নতির ইতিহাস, বিপুল সাহিত্য, আইন-কানুন, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান প্রভৃতি যা কিছু তাঁদের গর্বের বস্তু, যা কিছু প্রিয়, সব এনে এদেশের সামনে ধরলেন। এই যে উপহার এটা কূট রাজনীতি কিংবা কূট বাণিজ্য-নীতি নয়। "আমরা বড়" এই অভিমান তৃপ্ত করবার অন্য উপায় ছিল না।

কিন্তু ভারতী প্রজাও বুঝলে, এটা প্রেমের উপহার নয়, সম্মানে

সমানে বিনিময়ও নয়। দান স্বীকার করলে বটে, কিন্তু শান্তি পেলে না। রাজার দানে প্রজার সন্তোষ হয়, কারণ প্রজা সে, দান প্রাপ্য মনে করে। কিন্তু এই নূতন রাজা ত সে রাজা নন।

কথাটা মনের ভিতরে রইল, প্রজা জানতে পারলে না। কাজেই আবদার বাড়তে লাগল। প্রজা চাপকান এঁটে সামলা মাথায় পরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললে, "আমরা এখন তোমাদের বিদ্যা শিখেছি, দেশ শাসন করতে দাও।" রাজা খুসী হ'লেন, বললেন, "তা ত ঠিক; এজন্যেই এদেশে আমাদের আসা, কিন্তু একবারে পারবে না, আমরাই পারি নি!" ক্রমে প্রার্থনার ভঙ্গি বদলে গেল। এখন হেটকোট পরে' ইংরেজ সেজে শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় প্রজা বললে, "দেখ এখন আমরা তোমাদের সমান হয়েছি, দেশও আমাদের; এখন রাজ্যের ভার সমানে সমানে নিলেই ভাল হয়।" কথাটা শুনে কোন কোন ইংরেজ হাসলেন; কেহ বা মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে দিলেন, যুগযুগান্তর তপস্যা করলেও এ-বর লাভের যোগ্য হবে না। এতেও যখন ভারতী ক্ষান্ত হ'ল না, দুর্বিনীত পুত্রের ন্যায় দিবারাত্র ঘেন্-ঘেন্ করতে লাগল, তখন চিরন্তন লাঠি বা'র করতে হ'ল। কেহ কেহ স্পষ্টবক্তা বললেন, "মনে করেছিলাম তোমাদের কিছু বোধ জন্মেছে! কেহ কখনও নিজের জমিদারি ছাড়ে কি? আমরা সন্ন্যাসী নই, বৈরাগী নই, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে অসমর্থও নই।" কেহ কেহ আরও স্পষ্ট করে' বললেন, "তোমরা রাজভোগে থাকবে, আর আমরা তোমাদের বাড়ী পাহারা দিব, এমন আশ্চর্য কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না? কয়েকজন প্রজা খুব বুদ্ধিমান্; তারা বললে, "তোমরাই যে বলেছিলে রাজ্যভার আমাদিকে দিবে? তোমাদের এ কি অন্যায়, যুদ্ধবিদ্যা না শিখিয়ে এখন বলছ কে পাহারা দিবে? দু'শ বছর ধরে' আমাদিকে মানুষ করছ; এখনও বলছ মানুষ হই নি? তোমাদের অধ্যাপনার কলঙ্ক রটাতে চাও?"

এইরূপ যখনই বলি, রোগে দেশ উৎসন্ন হ'ল, লোকে না খেতে পেয়ে মরে' গেল; তখনই স্বীকার করি, তোমরা বড় আমরা ছোট, তোমরা রাখলে রাখতে পার, মারলে মারতে পার। এই দীনতা-স্বীকারে পশুর মনেও সন্তোষ জন্মে না। ইংরেজের দর্প, দেশের অশান্তির কারণ নয়। বরং ভেবে দেখলে বুঝি, দর্পের বহু হেতু থাকতেও যে-জাতি ব্যবহারে শিষ্ট, সে-জাতি বাস্তবিক মহৎ। আমরা মুখে বলছি সমান, কিন্তু অন্তরে বুঝছি সমান নই। চাই সমান হ'তে, কিন্তু পারছি না। একদিকে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তৃপ্তির যোগ্যতার অভাব; এই দ্বন্দ্বেই ভারতীর অসন্তোষ।

আমি বড় তুমি ছোট, আমরা বড় তোমরা ছোট,—এই যে ভাব এটা মানব-সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে আছে। আমি বড়, আমি যা-কে আমার বলি সেও বড়, একথা ভুলবার জো নাই। কারণ ভুলতে গেলেই আমার বাঁচবার হেতু থাকে না। সৃষ্টি মধ্যে আমার থাকবার প্রয়োজন আছে, নইলে সৃষ্টির অভিপ্রায় অহেতুক হয়ে পড়ে। বড়ই থাকতে পারে। ছোট যে আছে, তা আমাকে বড় স্বীকার করতে আছে, তার থাকবার এই হেতু বই অন্য হেতু নাই। ইয়োরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, কে বড় কে ছোট তারই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা চিরকাল চলবে। যখন চলবে না, তখন সৃষ্টিও থাকবে না।

কে বড় কে ছোট, এই যুদ্ধে বাহুবলের সহিত বুদ্ধিবল যুক্ত হ'লে সোনায় সোহাগা হয়, ছোটকে আত্মসাৎ করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা নাকি পশুনামে গণ্য হ'তে চাই না। তাই বেঁচে থাকবার যুক্তি দেখাই। হিন্দু বলছেন, দেখ, তোমরা কতদিনের বা মানুষ। তোমরা যখন পশু ছিলে, তার কত আগে হ'তে যে আমরা মানুষ তা গণতে গেলে কাগজ পেন্সিল চাই। এই যে এত কাল আছি এতেই প্রমাণ হচ্ছে আমরা বড়। আমাদের যে অতুল বিভব আছে, তা পৃথিবীময় বিতরণ না করে' কি লুপ্ত হ'তে পারি? আমাদিকে থাকতেই হবে, নইলে সে-সব

নষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমান বলছেন, যে-ইস্‌লামের বিজয়-বাদ্য পৃথিবীর অর্ধাংশে নিনাদিত হয়েছিল, মুসলমানের যে-কীর্তি পেয়ে বর্তমান ইয়োরোপের প্রতিষ্ঠা, যার অমিত তেজ এখনও ভূখণ্ডে জাজ্বল্যমান, তাকে বড় স্বীকার করতেই হবে। জনসাম্য ঘোষণার আর কে বা আছে? খ্রীষ্টান বলছেন, আমরা যে বড় তাও কি প্রমাণ করতে হবে? তোমাদিকেও বড় করব, সভ্য করব বলেই ত আমরা আছি।

এসব বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক। ভিতরের লোক, যা'দিকে আপনার বলি, তাদের সঙ্গেও কলহ চলছে। ব্রাহ্মণ বলছেন, "আমার তুল্য শুচিজাতি ভূমণ্ডলে নাই। আমি মুক্তি-প্রয়াসী; আর মুক্তিপথে প্রথম পা ফেল্‌তে গেলেই বাহ্যে ও অভ্যন্তরে শুচি হ'তে হবে। এই-হেতু অহিন্দু কেহ ছুঁলে আমায় স্নান করতে হয়।" তখন এক শূদ্র বললে, "আমিও যে হিন্দু আমায় ছুঁতে ডরান কেন?" ব্রাহ্মণ বলছেন, "কি করি বল, সকলের আচার ত সমান নয়। যার ভাল নয়, তাকে কি করে' ছুঁই? কার ভাল কার নয়, তা শাস্ত্রে লেখা আছে; জাতি-নাম শুনলেই বুঝতে পারি, কার ছোঁয়া জল গ্রহণ করতে পারি।" শূদ্র স্মরণ করিয়ে দিলে, "সে যে দু-চার হাজার বছর আগের কথা! ব্রাহ্মণের সেবা এতকাল করে' আসছি, সদাচার কি শিখতে পারি নি?" শাস্ত্রবাদী নিরুত্তর, কারণ প্রত্যক্ষ দেখছেন সদাচার। শাস্ত্র-ও যুক্তিবাদী বলছেন, "তুমি যা বলছ তা ঠিক। শাস্ত্রেও আছে শূদ্র ভৃত্যের অন্ন গ্রহণ করতে পারা যায়, কারণ সংসর্গ-গুণে তার শৌচাচার হয়। কিন্তু তুমি ত একা নও। তোমার স্ত্রীপুত্র আছে, জ্ঞাতি-বন্ধু আছে। তারা শৌচাচার শেখে নাই, কিন্তু তোমার সমান অধিকার চাইবে। এতে বিরোধের সৃষ্টি হবে।" শাস্ত্র-ও প্রত্যক্ষবাদী বলছেন, "তুমি যা বলছ, তা ঠিক। আপৎকালে আপদ্-ধর্ম্ম শাস্ত্রেও আছে। কিন্তু এই কাল আপৎকাল কি না, বুঝতে পারছি না। না বুঝে কেমন করে' তোমার জল খাই?"

শাস্ত্র যদি এত বলবান্, শূদ্র বলছে, "ঠাকুর, শাস্ত্র আমিও দেখেছি, আমরা শূদ্র নই, ব্রাহ্মণ ! লক্ষণ মিলিয়ে দেখুন।" কেহ বললে, আমরা ক্ষত্রিয়, কেহ বললে, বৈশ্য। "বলতে পারেন আমাদের উপনয়ন হয় নাই। তাতে বাধা কি, যজ্ঞোপবীত ধারণ করছি, অশৌচ-কাল কমিয়ে দিচ্ছি।" ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছেন, রাজা বিধর্মী, কলি প্রবল।

এত কাল এইরূপ বিবাদ ছিল না। যে ছোট সে আপনাকে ছোট বলে' স্বীকার করত। যে বড় সেও ছোটর প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার করত। কিন্তু ইংরেজ রাজার কাছে কেহ ছোট, কেহ বড় রইল না, সকলের আসন সমান হয়ে গেল। ট্রেনে ও ট্রামে, জাহাজে ও শহরে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের গা-ঘেঁষাঘেঁসি হ'তে লাগল। আদালতে অপরাধের দণ্ড হ'ল, অপরাধীর বিচার হ'ল না। সমাজ এইসবও সইতে পাবে; কারণ অপরাধ করা আর ট্রেনে চড়া লোকের ইচ্ছাধীন। ভয়ানক এই, যারা ছোট ছিল তারা রাজার দৃষ্টির গুণে বড় হ'ল, সম্মানিত হ'ল, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'ল। যারা বড় ছিল, তারা সকলে বড় থাকতে পারলে না। ছোট দেখলে বুঝলে, তারা ছোট নয়, বড়র সমান। ভারতীর জন্মাবধি এমন সমাজ-বিপ্লব কখনও হয় নাই। অল্পস্বল্প যা হয়েছে তা ধর্মের দুয়ার দিয়ে। কদাচিৎ রাজার হুকুমে ছোট, বড় হয়েছে, প্রজা স্বীকার করেছে। কিন্তু বড় কখনও ছোট হন নাই। ধর্মের বাঁধনে যে-সাম্য ঘটে, তার গ্রন্থি অন্তর্যামীর হাতে; সমাজ-বিপ্লবে যে-সাম্য ঘটে, সেটা মনের ভিতরে নয়, বাইরে।

বিদেশী, বিধর্মী রাজা সমাজ-সংস্থাপক হ'তে পারলেন না, ইচ্ছা করে' হ'লেন না। কিন্তু প্রবল রুদ্ধ ইচ্ছার কপাট খুলে দিলেন। বহুকালের বৃহৎ বল্মীক-স্তূপ ভগ্ন হ'ল, ঝাঁকে ঝাঁকে পুত্তী উড়ে পুরাতন ধর্ম-কর্ম আচার-ব্যবহার অন্ধকারে ছেয়ে ফেললে। হিন্দু, নামে মাত্র হিন্দু রইল; জের দীপের আলো দেখতে পেলে না, পশ্চিমের প্রখর দীপে আলো ও

আঁধার বিকট হয়ে দাঁড়াল। বিকট দৃশ্য কেউ দেখতে পারে না। রাজা কে, যে, প্রজার কাছে এত বড় হয়ে দাঁড়াবেন? পিতা কে, যে, পুত্র তাঁর আজ্ঞা পালন করবে? প্রভু কে, যে, ভৃত্য পদসম্বাহন করবে? সে নর কে, যে, নারীকে দাসী হ'তে হবে? কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়, সবাই সমান। ভারতী প্রজা রাজার কাছে সমান হ'তে গিয়ে দেখলে পশ্চিমের পক্ষে পশ্চিম সত্য, পূর্বের পক্ষে নয়। রাজাও বললেন, তাঁদের পোষাক এদেশে পরলে সর্দিগর্মি হবে। ভারতী দেশে-বিদেশে বাড়ীর বাইরে কোথাও মান পেলে না, কাজেই বাড়ীর ভিতরে সে মান আদায় করতে বসে' গেছে। বড় হবার ইচ্ছা নয়, বড় প্রমাণ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। কোথাও গলার জোরে, কোথাও লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে, কোথাও ধরণা দিয়ে, কোথাও রাজার দোহাই চেয়ে, কোথাও রাজার পোষাক পবে' বড় প্রমাণ করতে লেগে গেছে। কিন্তু মানুষের স্বভাবও এই, সে বড়কে সইতে মানতে পারে, কিন্তু বড়াই দেখলে জ্বলে' উঠে। এই যে ঘরে-বাইরে বিরোধ, তা রাষ্ট্রবিপ্লব হ'তেও দারুণ।

নিম্নজাতির উচ্চ হবার ইচ্ছা বুঝতে পারি। এতে আত্ম-সম্মান জন্মে। সে যে ছোট নয়, এই জ্ঞান জন্মিলে হিন্দু সমাজেরই মঙ্গল। কিন্তু উচ্চজাতিও যে উচ্চতর, উচ্চতম, প্রমাণ করতে ব্যগ্র, তার কারণ ঘরে মানের আশা, যেহেতু বাইরে নাই। তাঁরা বলেন, যেটা সত্য সেটা গ্রহণ করছেন; কিন্তু বলেন না, এতকাল সে সত্য কোথায় ছিল, এতকাল সত্যান্বেষণ হয় নাই কেন। পূর্বকালে আর্যেরা চারি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। তার পর বর্ণসঙ্কর হয়ে নানাজাতির উৎপত্তি হয়েছে। এখন যদি জাতিভেদ গিয়ে বাস্তবিক চারিবর্ণ ফিরে আসে, সমাজের পক্ষে মঙ্গল। যদি চারিবর্ণ গিয়ে আর্য বা আর কোন নামে হিন্দুসমাজ ঘরে ও বাইরে পরিচিত হ'তে পারে, তা হ'লে দেশের পক্ষে আরও মঙ্গল। হয়ত শাস্ত্রের কথা ফলতে আরম্ভ হয়েছে, আমরা বুঝতে পারছি না,—কলিকালে লোকে

এক-আকার এক-বর্ণ হবে। কিন্তু জড়রাজ্যে যেমন, যেটা চলে সেটা চলতে থাকে, থামে না ; মনের ভাবও তেমন, যেটা আছে, সেটা থাকে। অন্যদিকে প্রবল আকর্ষণ না হ'লে গতি বা গতিপথ পরিবর্তিত হয় না। এতকালেও হিন্দু বুঝতে পারে নাই, সেদিন আর নাই। বণিকের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে ; গাঁয়ের লোক ভাবছে ডাকাতে ঘরগুলা পুড়িয়ে দিয়ে গেলে কালী মায়ের পূজা দিব। রাক্ষস এসে ব্রাহ্মণের কন্যা হরণ করে' নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাক্ষসবধ রাজার কাজ, প্রজার নয়। মনের এই যে অবস্থান, তার পরিবর্তন না হ'লে বড় কি, ছোটই বা কি ?

শুনি, পুরাকালে এদেশে কেবল কৃষ্ণবর্ণ অনার্যের বাস ছিল। কতকাল পরে শ্বেতবর্ণ আর্যেরা এসে দেশের এক কোণে বস-বাস আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁদের পরিবার বাড়তে লাগল, পূর্বের ভিটা-মাটিতে কুলাল না, নূতন নূতন স্থানে গাঁ পত্তন করতে হ'ল। প্রথম প্রথম অনার্যেরা এই নূতন মানুষগুলির রীতি-নীতি কৌতূহল-দৃষ্টিতে দূর হ'তে দেখত। কিন্তু এরা ত মানুষ ভাল নয়, গাঁকে গাঁ জুড়ে বসছে, মাঠকে মাঠ চষে' ফেলছে। আমরা যাই কোথায়, কেনই বা পৈতৃক ভিটা ছাড়ব। তখন যা হয়, তা হ'তে লাগল। আর্যেরা বললেন, "তোদের মতন দস্যি কোথাও দেখি নি! তোদের কোনও ক্ষতি করছি না, তবু তোরা আমাদের ক্ষতি করবি ? বানরমুখো কি না, কৃষ্ণবর্ণ কি না, অসভ্য কি না ; তোদের ভাল মন্দ জ্ঞান কি আছে ?" কিন্তু গর্জনে ফল হ'ল না। অসভ্যগুলা তীরধনুক নিয়ে লড়াই করতে এল, দুর্ভেদ্য দুর্গে লুকাতে লাগল। তখন গোত্রে গোত্রে ডাক হাঁক সাড়া পড়ে' গেল, লোক জমায়েৎ হ'ল, যগ্যি কাণ্ড হ'ল। একত্র ভোজন হ'ল। "হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র শত্রুগুলার মাথায় নিক্ষেপ কর ; হে বরুণ, শত্রুগুলাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেল ; হে অগ্নি, ওদের ঘর দুয়ার পুড়িয়ে ফেল। তোমরা সবই জান,

দস্যিরা অন্যায় করছে, আমাদের যাগযজ্ঞে বাধা দিচ্ছে।" দেবতারা স্তুতি শুনলেন, অনার্যের পরাজয় হ'ল, উৎসব চলল।

ঠিক এই ভাব নিয়ে গত মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতি বলেছিল, আমাদের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, ঈশ্বর তা নিশ্চয়ই জানেন। যখন ব্রহ্মদেশের অসভ্য রাজা নিজের সিংহাসন ভালয় ভালয় ছাড়তে চাইলে না, তখন সভ্য ইংরেজ তাকে ডাকাত বলতে লাগল। আর যখন ডাকাতটা বন্দী হ'ল তখন কলিকাতার গির্জায় গির্জায় ঈশ্বরের মহিমা গান হয়েছিল। যখন মুসলমান এদেশে দেখলে, হিন্দুরা বশ্যতা মানতে চায় না, তখন শাস্ত্র বাহির হ'ল, কাফেরের সঙ্গে মৈত্রী নিষিদ্ধ।

আর্যেরা অনার্যদিকে ঘৃণা করতেন। অনার্যদের লেখা ইতিহাস থাকলে দেখতাম, তারাও আর্যদিকে ঘৃণা কর্‌ত। কারণ কোন্ জেতা তার বিজিতকে ভালবাসে এবং কোন্ বিজিত তার জেতাকে বন্ধুজ্ঞানে পূজা করতে পারে? শুধু যে একের প্রভুত্ব অন্যের দাসত্বহেতু দ্বেষ জন্মেছিল তাও নয়। আর্য ও অনার্য দুই র-য় (race)। যে সূত্রে হ'ক, দুই র-য় পরস্পর সম্মুখীন হ'লেই কে বড় কে ছোট, এই তুলনা চলতে থাকে। আর্যেরা বলবান্, সুতরাং তাঁরা যে বড়, তা স্বীকার করতেই হ'ত। তাঁদের গুণোৎকর্ষ দেখে অনার্যদের ঈর্ষ্যা হ'ত। কিন্তু ঈর্ষ্যা এইখানেই থাকে না! ক্রোধের সহিত যুক্ত হয়। যেন অনার্যেরা বলত, আর্যেরা কেন বড় হবে। এই 'কেন' খুঁজতে গিয়ে কিন্তু নিজেদের অপকর্ষ দেখতে পেলে না; দেখ্‌তে পেলে আর্যদের দুষ্টামি। "কেমন করে' জানলে?" "দেখাই যাচ্ছে, তাদের দুষ্টামি না থাকলে আমরা বড় হ'তাম!" এই উত্তর নূতন নয়। সে আমার অপকার করছে, আমি তার অপকার করতে পার্‌ছি না, তারই জন্যে পার্‌ছি না, এই ত দ্বেষ। সে ত আমার নয়, আমার বংশের নয়, জাতির নয়, ধর্মের নয়, দেশের নয়। এমন লোকই ত অপকার করে। রয়িক দ্বেষের তুল্য স্থায়ী ভাব,

বোধ হয়, আর নাই। এর গোড়ায় সন্দেহ ও ভয়। একে জীবন-সংগ্রামও বলতে পারি। আমেরিকায় কৃষ্ণবর্ণের প্রতি সাম্যবাদী ভ্রাতৃ-সম্বন্ধী শ্বেত-বর্ণের ঘৃণা ঘুচতে বহুকাল লাগবে। এদেশের ফিরিঙ্গী ইংরেজের কাছে কাছে চলে, তবু ফিরিঙ্গীকে ইংরেজ সমান ভাবতে পারে না; পাঠান ও মোগলের বনিবনাও কখনও হ'ত না; যদিও উভয়েই মুসলমান। ইয়োরোপে সমবর্ণ খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে যুদ্ধ হ'ল, কারণ সকলের রয় এক নয়। আয়ার্লণ্ড এতকাল এক রাজ্য-গর্ব ভোগ করছিল, সমাজে এক ছিল, কিন্তু ইংলণ্ড যে পর, তা ভুলতে পারলে না। এমন কি, শুনতে পাই, স্কট্লণ্ডও পৃথক হতে চায়; কেন না ব্রিটন নয়।

এখন যা দেখছি, পূর্বকালেও তাই ঘটত। পূর্বকাল কেন, একালেও ঘটছে। উন্নতিকামী শূদ্রেরা বলছে, ব্রাহ্মণের দুষ্টামি-হেতু তারা অবনত হয়ে আছে। বঙ্গদেশে একথা তত স্পষ্ট শোনা যায় না। কারণ শূদ্রের বহু ভাগ আছে, আর অনেক ভাগ বড়ও আছে। সুতরাং দল বেঁধে ব্রাহ্মণের বিপক্ষে দাঁড়াবার দরকার হয় নাই! হিন্দুশাস্ত্রে চারি বর্ণের অধিক বর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু কতকগুলি জাতি চারি বর্ণের মধ্যে পড়ে না। এরা হিন্দু, কিন্তু অবর্ণ। মাদ্রাজে বলে পঞ্চমবর্ণ, সংক্ষেপে 'পঞ্চম'। বোম্বাই অঞ্চলে এরা 'মরাঠা'। দক্ষিণাপথের সর্বত্র হিন্দুজাতি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আর অবর্ণ অর্থাৎ অ-ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশেও নাকি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বই অন্য জাতি নাই।

দুই রয় যদি একই বর্ণ হয়, দুয়েরই যদি গায়ের রং এক হয়, তা হ'লে রয়িক দ্বেষ তত প্রকট হ'তে পারে না। বেদের সময়ে 'ব্রাত'নামে এক যাযাবর জাতি আর্যদিগকে উত্যক্ত করত। বোধ হয় এই ব্রাত জাতি বর্তমান বেদিয়া জাতির আদি। সে যা হ'ক, ব্রাতজাতি কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। স্বচ্ছন্দে পরে 'ব্রাত্য' নামে আর্যসমাজে মিশে গেছে। তার পর কত যবন, শক, হুণ, হিন্দু হয়ে গেছে, তার

সংখ্যা নাই। কিন্তু বেদের 'দস্যু' কৃষ্ণবর্ণ ছিল। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ-বৈষম্যহেতুতে রয়-বৈষম্য প্রকট হয়ে দাঁড়াল, স্বজাতি, বিজাতি বুঝতে কষ্ট হ'ল না। অনেক পশু গা শুঁকে বা দূর হ'তে গন্ধ পেয়ে স্বজাতি বিজাতি ঠাওরাতে পারে। সমগন্ধী স্বজাতি, বিষমগন্ধী বিজাতি। স্বজাতি মিত্র, বিজাতি শত্রু। উপকথায় আছে, রাক্ষসী ও পিশাচী দূর হ'তে মানুষের গন্ধ টের পায়। মানুষের ঘ্রাণশক্তি তত প্রখর নয়, কাছে না পেলে কোন্ মানুষ শত্রু কোন্ মানুষ মিত্র, তা বুঝ্‌তে পারে না। প্রিয় পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে' বুঝি, সে আমার আপনার। কিন্তু দূরে থাক্‌লে দেখা ভিন্ন উপায় নাই। যে কাল সে যে দুষমন, তাতে আর সন্দেহ কি। নইলে কাল হবে কেন, আমার মতন গোরা হ'ত। চুরি-ডাকাতি যত দুষ্কর্ম, সব অন্ধকারে হয়। ঘুট্‌-ঘুটি আঁধারে বাইরে যায়, কার সাধ্য! ভূত প্রেত সব কাল। তারা অন্ধকারে থাকে, অন্ধকার পক্ষে প্রেতকার্য করতে হয়। এক-একটা লোক যেন কাল ভূত, তাদের কাছে যেতেও ভয় হয়। ডাকাতগুলা মিস্-মিসে কাল নিশ্চয়। রাহু কেতু, দুটাই কাল; অমন স্বর্ণকান্তি চন্দ্র-সূর্যকে কাল করে' ফেলে, পৃথিবীটাকে অন্ধকারে ঢাকে। তাড়াও, তাড়াও; শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাও। গঙ্গাস্নান কর, কালর ছায়া গায়ে লেগেছে। কালর সঙ্গে মিশবে না, তাকে ছোঁবে না, তার ছায়াও মাড়াবে না।

একথা কাকেও বল্‌তে হ'ত না, শেখাতে হ'ত না। গ্রামের ভিতরে কাল ভূতদের (black Niggers) বাসের স্থান ছিল না। তারা থাকত বাইরে। এতে গোরা সুখী, কালারাও সুখী। কালারাও সব এক জাতি, এক রয় ছিল না, তারা গোরা নয়, আর্য নয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু তারাও জাতিবিচার করে' চলত। তাদের বিচার আরও কড়া। কাজেই তারাও এক পাড়ায় একত্র থাক্‌তে পারত

না। তারা যদি পরস্পর মিলতে পারত, তা হ'লে আর্যদিগকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ত।

কিন্তু সকল কালা সমান নয়। কেউবা একটু মানুষের মতন, কেউবা আর্যদিকে একটু মানতে লাগল। আর্যেরাও বাঁচলেন, যত ইচ্ছা তত দাস ও দাসী পেতে লাগলেন। পূর্বে তাঁদের মধ্যে ভর্তা ও ভৃত্য ছিল; এখন দাস ও দাসী কিনতে পাওয়া গেল। এরা বাড়ীতে থাকতে লাগল, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ও কমতে লাগল। তা ছাড়া সবাই কিছু জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না। দাসীর সন্তান জন্মিতে লাগল। রাক্ষস-বিবাহ, পিশাচ-বিবাহ নামে বিবাহও স্বীকার ক'রতে হ'ল। ক্রমে অনার্য কালা আর্য আচার-ব্যবহার শিখে তাদের সমাজের এক কোণে বসতে আসন পেলে। পেলে বটে, কিন্তু শূদ্র নামে ক্ষুদ্রত্বের ছোটত্বের দাগ রয়ে গেল। কিন্তু বড় লোকের 'দাস' বলে' তাদের নিকট 'ক্ষুদ্র' বলে' পরিচয়ের সৌভাগ্যও সকল কালার ঘটল না। তারা 'হীন' জাতি, আর্য পরিবারের বাইরে।

দেশের গুণেই হ'ক আর কালের গুণেই হ'ক, হিন্দুর নিকট বৈষম্য প্রত্যক্ষ। সেই আদ্যকাল হ'তে সৃষ্টি-বৈষম্য হিন্দুকে অভিভূত করেছে। তাঁরা দেখেছিলেন, বৈষম্যেই সৃষ্টি ও স্থিতি, সাম্যে লয় বা সং-হা-র। এই ভাব কত ছন্দে কত প্রকারে যে প্রকাশ করে' গেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব সকলেরই স্থান আছে, স্ব স্ব আসন দেখে বসতে পারলেই হ'ল। যখন প্রথমে বসেছিল, তখন বর্ণভাগও হয়ে গেছল! তখন জাতিনাম ছিল না, ছিল চারিবর্ণ। গায়ের রং দেখে আদিকালে বিভাগ হয়েছিল, পরে নানা কারণে রং দেখে গুণ ও কর্ম বিচার কঠিন হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কে বড় কে ছোট, সে পরীক্ষা বহুবার হয়ে গেল। শেষে মিলন হ'ল—ক্ষত্রিয় রাজা হলেন, ব্রাহ্মণ হলেন মন্ত্রী। তখন বৈশ্যকেও অর্থাৎ প্রজাকেও তা মানতে হ'ল,

শূদ্রের ত কথাই নাই। ফলে চারিবর্ণের স্মৃতি এক হয়ে গেল, ঋষিদের গোত্রে মনের গোরু চরতে লাগল।

কিন্তু একের স্মৃতি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে গোঁজা-মিল দিতে হয়। আচার-ব্যবহারের হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে, কৈফিয়ৎ দিতে পারা যায় না। যারা সে-স্মৃতির মধ্যে আসে, তারা জানেও না, গোঁজা-মিল আছে। পূর্বের রয়িক স্মৃতি ঘুচবার নয়। বর্ণ স্মৃতি ও জাতি-স্মৃতিও বলবান্। আমরা বলি, সংস্কার। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার রক্তমাংসে জড়িয়ে যায়, বংশক্রমে পুত্র-পৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হয়। পরস্পর বিবাদ না হ'লে রয় বা বর্ণ বা জাতির ধর্ম বা সংস্কারের মিলন হয় না। কিন্তু স্মৃতিও এমনই যে, পরস্পর মিলতে চায় না, পরস্পর বিবাহে বাধা দেয়। পরস্পর একত্র ভোজনেও সেই কারণে আপত্তি। যখন বর ও কন্যা এক পাত্রে আহার করে তখন তারা এক হয়ে যায়, কন্যার গোত্রান্তর হয়। তার পূর্বে হয় না। ফলে স্বাভাবিক কারণে মিলনের দুই পথই রুদ্ধ হ'ল।

কিন্তু গরজের তুল্য বালাই নাই। ক্ষুৎপিপাসা মানুষের নিত্যসঙ্গী। জানা-শোনা লোকের রান্না খেতে ভয় থাক্‌ল না। বিশেষতঃ, বড়'র হাতের অন্ন খেতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটা বড়'র প্র-সা-দ; তাঁর 'সু' অন্নপথে হীনের দেহে চলে' আসে। একত্র থাকতে থাকতে সৌহার্দ্য জন্মে। উচ্চবর্ণের পুরুষের পক্ষে নিম্নবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত হ'ল, ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী তত দুষ্যা হ'লেন না। এর বিপরীত শাস্ত্রে রইল না বটে, কিন্তু ব্যবহারে ঘটতে লাগল। তেমনই, আচার-ভ্রষ্ট দ্বিজও শূদ্র মধ্যে গণ্য হ'ত। কেন 'বড়' পুরুষ 'ছোঁট' কন্যা বিবাহ করলে দোষ হয় না, কেনই বা 'ছোট' পুরুষ 'বড়' কন্যা বিবাহ করলে সমাজে হাহাকার পড়ে—কেবল পূর্বকালে নয়, একালেও—সে কথা এখন থাক্। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যে 'ছোট'

সে কন্যা দ্বারা ক্রমশঃ 'বড়' হয়, আর যে 'বড়' সে পুত্র দ্বারা ক্রমশঃ 'ছোট' হয় না, চিরকাল বড়ই থাকে।

এইরূপে হিন্দু-সমাজ যে কত কাল কাটিয়েছে, কে জানে। তখন বিদেশী বিধর্মী বড়-একটা এদেশে আসত না, অল্পস্বল্প যে বা আসত, এদেশে থাকৃতে থাকৃতে হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে পড়ত। শাক্যসিংহ এক প্রবল ধাক্কা দিলেন। আমার বোধ হয়, তিনি তাঁর বল বাহির হ'তে পেয়েছিলেন। রাজা হ'লেই ক্ষত্রিয়, শাক্যবংশও ক্ষত্রিয়। কিন্তু সে বংশের আদি কোথায়, না জানলে সত্য মিথ্যা বলতে পারা যায় না। সে যা হ'ক, সে ধাক্কা সাম্‌লাতে গিয়ে পূর্বের হিন্দু-সমাজ যে ওলট-পালট হয়ে গেছল, তা সকলেই বলেন। এত গোঁজা-মিল দিতে হ'ল যে পুরানা খড় থাকল কি না, সন্দেহ। আবার নূতন কাঠাম হ'ল, কিন্তু পুরানা কাঠখড় দিয়েই হ'ল। এমন সময় বিদেশী বিধর্মী দলে দলে যুদ্ধবেশে আসতে লাগল, চালের উপর চড়তে লাগল, লাঠির উপর লাঠি পড়তে লাগল। পরা-ধীন জাতির অধীনতা কেবল দেহে ত নয় আর, মন যদি পরাধীন হয়, তাহ'লে আপনার বলতে কিছুই থাকে না। যে জাতিই হ'ক, তার আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র একটি, তার স্মৃতি। আচারে ও ব্যবহারে হিন্দুকে পৃথক্ থাকতে হ'ল, জাতি-বিভাগ দুরতিক্রমণীয় হ'ল, বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্য বেড়ে গেল। ক্রিয়া যত প্রবল হয়, প্রতিক্রিয়াও তত প্রবল হয়। বর্তমান কালেও পাশ্চাত্ত্য ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া চল্‌ছে। আমরা বুঝতে পারছি, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আমাদের স্মৃতি ডুবিয়ে দিয়ে আমাদের চিত্ত অধিকার করতে বসেছে, ইংরেজ রাজা আমাদের যাবতীয় কার্যে সর্বময় কর্তা হওয়াতে আমরা কলের পুতুল হয়ে পড়ছি। আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভালর দিক্ দেখতে পারছি না। আশঙ্কা, পাছে আমরা হারিয়ে যাই। তাই মহাত্মা গান্ধি বলেছেন, তোমার রেল চাই না, কল চাই না। প্রাচীন স্মৃতি-কার এইরূপ দুঃসময়ের নিমিত্ত লিখে গেছেন, "বাপু; আপনাকে

হারিও না, আঁকড়ে থেকো।" এই উপদেশ না দিলেও ফল তাই হ'ত। হিন্দুত্বের সঙ্কট-কালে চিত্তের যাবতীয় বহির্মুখী ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হ'ল। পূর্বের অনুলোম বিবাহ উঠে গেল, মুরা-নামক অনার্যজাতির কন্যা-হেতু মৌর্যবংশের উৎপত্তি অসম্ভব হ'ল। পারসিকেরা প্রথম যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁরা মঘী-নামে হিন্দুজাতি-বিশেষে পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন এলেন, তখন ভারতের সেদিন নাই, বোম্বাইর পার্সীরা আর মঘী ব্রাহ্মণ হ'তে পারলেন না। কারণ হিন্দু বিশ্বাস করেন, কাল অনন্ত, পরলোকে মুক্তির পথ অগণ্য। যে যে-পথই ধরুক, সকলের গন্তব্য এক। কে কোন্ পথে চলবে, সে তার ইচ্ছা। কিন্তু যদি সমাজে থাকতে চাও, পরের অধীনতা স্বীকার করতেই হবে। সে অধীনতাও আর কিছুতে নয়, আচারে।

এই উদার মত হিন্দুকে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট, অন্যদিকে তেমন নিকৃষ্ট করেছে। 'তুমি স্বাধীন,' 'তুমি স্বাধীন,' বলতে গিয়ে পরস্পর সংহতি-শক্তি হারিয়েছে। তোমার শক্তি তোমার হাতে, কেউ দিতে পারবে না; তোমার মুক্তি তোমার ইচ্ছায়, কেউ চালাতে পারবে না। এই যে বিশ্বাস, হিন্দুর এই যে সংস্কার,—ইহাই তার স্বরাজ্য হারাবার মূল।

জগতে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার আছে। পরমাশ্চর্য এই যে, সর্বত্র দ্বন্দ্ব; ভৌতিক জগতে দ্বন্দ্ব, মানসিক জগতেও দ্বন্দ্ব; দুই বিমুখী শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। একটু চিন্তা করলে, এর ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। যে হিন্দু সর্বজীবে সমদর্শী, যার কাছে ভয় বলে' কিছু থাকতে পারে না, সে হিন্দুই জাতিবিচারে অগ্রগামী, সকল কাজে ভয়ে আকুল! শৌণ্ডিকনন্দন—তার কোন্ পুরুষে সুরা-ব্যবসায় ছিল তার ঠিকানা নাই—শিবমন্দিরে প্রবেশ করবে, এই দুশ্চিন্তায় ব্রাহ্মণ কাতর; কিন্তু সুরাপান যে-ব্রাহ্মণের মহাপাতক, সেই মহাপাতকীর

প্রবেশে কোনও চিন্তা হয় না! ইহা উপহাসের কথা নয়। দু-দশ জনের কপটতা থাকতে পারে, কিন্তু হীন জাতির স্পর্শে ব্রাহ্মণের আর্ত্ততা সত্য। যেটা সত্য, তোমার কাছে না হ'ক, তাঁর কাছে যেটা সত্য, সেটাকে 'ছুঁৎমার্গ' বলে' ধিক্কার দেওয়া, আর ভূতগ্রস্তকে ভীরু বলে' উপহাস করা, একই, একই প্রকার নিষ্ঠুরতা। বেত্রাঘাতে ভূত ভাগানা যায় বটে, কিন্তু ভূতগ্রস্তের মানসিক বৈকল্যের পরিণাম শুভ হয় না। যার কণামাত্র কারুণ্য আছে, সে এই দুঃসাহসে যাবে না। বিদ্যালয়ের বালক যখন পড়া শিখতে না পারে, তখন যদি গুরুমশায় বালককে 'নির্বোধ গাধা' বলে' বেত্রাঘাত করেন, তিনি বালকের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। আর যেটা স্বীকার কবেন না, সেটা না বলাই ভাল। সমাজসংস্কারক বলছেন, কু-সংস্কাব। কু-সংস্কারই ত। সে কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে, কু-সংস্কার কেবল ভয়ার্ত ব্রাহ্মণের একার অধিকাব নয়। সকলেরই আছে, কারও এ বিষয়ে, কারও সে বিষয়ে। শনি বৃহস্পতির বারবেলায় যে কর্ম নিষ্ফল হয়, কিংবা মঘানক্ষত্রে যাত্রা করলে যে বিপদ্ ঘটে ইহার কোনও যুক্তি আছে কি? কিন্তু যে কারণেই হ'ক, যারা মানতে শিখেছে, তারা কি সহজে মানে, মেনে সুখ পায়? কত লোক জানে ভূত নাই, তবু তারা ভূতের ভয় করে। কত হিন্দু ছাগ ও মেষ ও মহিষ বলি দিচ্ছে; কিন্তু গোরু বলির নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। গো-বধে পাপ লেখা আছে স্মরণ করতে হয় না। পাপও গুরুতর নয়, তার প্রায়শ্চিত্তও আছে। তেমনই মুসলমান যখন বরাহ-মাংস দেখলে পাগল-পারা হয়, কোরানের নিষেধ তার সম্পূর্ণ কারণ নয়। এই নিষেধ যদি বলবান্ হ'ত, তা হ'লে কোনও মুসলমান কখনও সুরাস্পর্শ করতে পারত না।

সবর্ণ অবর্ণের অন্ন, ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন, শূদ্র হীন জাতির অন্ন ভোজন

করতে পারে না। কেন পারে না? ভয়ে। কি ভয়? ভয় এইত, ভোজন করলে সবর্ণ অবর্ণে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে, শূদ্র হীনজাতিতে প-রি-ণ-ত হয়। নিজের জাতি নষ্ট হয়, অন্নদাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। যিনি সবর্ণ বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অবর্ণ বা শূদ্র, যে শূদ্র ছিল, সে হীন হয়ে পড়ে। ইহার তুল্য দুর্ভাগ্য বাস্তবিক আর কি আছে? ইহার দৃষ্টান্ত গোবধ করলে দেখতে পাওয়া যায়। জেনে শুনে মারলে ত কথাই নাই; অপালন হেতু কারও গোরু মরলে, সে গোরু হয়ে যায়; গলায় দোড়ী, দাঁতে তৃণ নিয়ে, বাক্ রোধ করে' গোরু ডাক ডাক্‌তে থাকে। অথচ শাস্ত্রে এই দারুণ দুর্দশা লিখিত নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তত কঠোরও নয়। এই বিশ্বাসের নিশ্চয়ই মূল আছে। তেমনই, শূদ্রের অন্নগ্রহণে ব্রাহ্মণের যে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, এই বিশ্বাসেরও মূল আছে।

এই মূল বহু বহু প্রাচীন। এত প্রাচীন যে, ঋগ্‌বেদও তত প্রাচীন নয়। সে-কালের ঘটনা অতীতের সাগরতলে ডুবে গেছে, কিন্তু জলের রঞ্জন অদৃশ্য হয় নাই। জীব-জাতি মাত্রেই জাতিস্মর, নইলে পক্ষী পক্ষী থাক্‌ত না, পশু পশু থাক্‌ত না, মানুষ মানুষ থাক্‌ত না, আম ও জাম আম ও জাম থাকত না। জাতিস্মর বটে, কিন্তু সে স্মৃতি কারও জানা নাই। যখন আর্য ও অনার্য, দুই রয় সমুখে সমুখে হয়েছিল, তখন উভয়েই জানত, উভয়ে এক রয় নয়, এক জাতি নয়, একে অন্যের বি-রয়, বি-জাতি। এই 'বি' উপসর্গ সংসারে যে কত কাণ্ড করছে, তা লিখতে হ'লে সাতকাণ্ড রামায়ণেও কুলাবে না। অথচ বৈষম্যেই সৃষ্টি ও স্থিতি। আর্যের নাম ব্রাহ্মণ হ'ক সবর্ণ হ'ক, আর অনার্যের নাম শূদ্র হ'ক অবর্ণ হ'ক, সেই প্রাচীন কালের 'বি' অবিশ্বাসের খনি, সেটা আজাড় হয় নাই। সেই যে কাল-কে 'কু' মনে করা মানব-সৃষ্টির আদ্যকাল হ'তে গোরার মনে জাগছে, যাকে আশ্রয় করে' ভূত-প্রেতের

লম্ফ-ঝম্ফ, তেল-চকচক্যে কাল. কুচ্‌কুচো ডাইনীর কুদৃষ্টি, সেই কাল. জুটে বি'কে ভুলতে দিচ্ছে না। 'বর্ণ' আর কিছু না হ'ক, কাল. রং নয়। গিন্নী বউএর 'রং' চান; সে রং কাল নয় শ্যাম নয়, উজ্জল শ্যাম নয়, ফর্‌সাও নয়; সে রং গোরা! সম্বাদ-পত্রে বিবাহের বিজ্ঞাপনে, পাত্রী 'সুন্দরী হওয়া চাই, নাক মুখ চোখ যেমনই হ'ক, কাল. চলবে না।' আশ্চর্য এই, যে-পাত্র গোরা নয়, যে-পাত্র শূদ্র, সেও গোরা কন্যা চাচ্ছে। অথচ লেখাপড়া-জানা পাত্র মহাভারতে পড়েছে কাল. দ্রৌপদীকে লাভ করতে গিয়ে সেকালের রাজন্যবর্গ অস্ত্রা-অস্ত্রি করেছিলেন। ইহাতে বোধ হচ্ছে, শ্বেত ও কৃষ্ণের বিরোধ লোকে ভুলতে চাচ্ছে। কতকাল গেছে, বর্ণে বর্ণে কত মেলামেশা ঘটেছে, অদ্যাপি ব্রাহ্মণ গোরা, শূদ্র কাল. বলতে পারা যায়।

নানা কারণে বঙ্গদেশে এই প্রভেদ তত স্পষ্ট নয়, অস্পৃশ্যতার অপবাদও তত প্রকট নয়। কিন্তু দক্ষিণাপথে পঞ্চমবর্ণ কাল. অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গোরা। কৃষ্ণবর্ণ, আকৃষ্ণ বা আগৌর ব্রাহ্মণ আছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মিস্-মিসে কাল. নহেন। সবর্ণেরা দূরে থাকতে চান, পঞ্চমের সংসর্গে আসতে চান-না। এটা কু-সংস্কার বলতে পারেন, কিন্তু এই কু-সংস্কার কোথায় নাই? আভিজাত্যের, কৌলীন্যের বড়াই না থাকা আশ্চর্যের বিষয় হবে। লোকে মনে করে, সবর্ণেরা অবর্ণকে ঘৃণা করে। কিন্তু ঘৃণা মুখ্য নয়, অবজ্ঞাও নয়; ভয় মুখ্য, ঘৃণা ভয়ের আনুষঙ্গিক ফল। ব্রাহ্মণ বলেন, অবর্ণেরা শৌচাচার-হীন; এই কারণে তিনি দূরে থাকতে চান। আসল কথা, হীন জাতি কু-এর প্রতিমূর্তি, এই সংস্কারে বিসম্বাদ জন্মেছে। অবর্ণকে তিনি ভয় করেন, পাছে তার কু তাঁর দেহে সংক্রামিত হয়। দৈবাৎ যদি স্পর্শ ঘটে, আর তিনি জানতে পারেন, তাঁ হ'লে দুশ্চিন্তা আসে—তাঁর কিংবা তাঁর প্রিয় জনের ঘোর অনিষ্ট হবে। স্নান করে,' প্রায়শ্চিত্ত করে' আক্রান্ত 'কু' তাড়াতে চেষ্টা করেন। এই ভয়

অবর্ণও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেও সবর্ণকে ভয় করে, মনে করে সবর্ণের স্পর্শে তার অনিষ্ট হবে। তার সাধ্য কি, ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করবে, দেবালয়ে ঢুকে পড়বে। যে-পথে সবর্ণেরা যাতায়াত করেন, সে-পথ অবর্ণও ত্যাগ করে, এবং যদি সে-পথে যেতে হয়, তখন বলতে বলতে যায়, 'পঞ্চম' যাচ্ছে।

এ কথা বুঝ্‌তে হবে, যাকে ভয় করি, তাকে ঘৃণা করি, এইজন্য সে যেন আমাকেও ঘৃণা করে, আমার কাছে না আসে। কারণ উভয়ে দূরে দূরে থাকলে উভয়েরই মঙ্গল। অবর্ণের পক্ষে ঘৃণা তত স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট ভয়। সে ভয়ও তর্জন ও গর্জনের। "ঐ বুঝি কাপড়খানা কুকুরে ছুঁয়ে গেল" বিপথগামী কুকুরটা যদি আমার কাপড়কে ঘৃণা করত তা'হলে আমায় তর্জন করতে হ'ত না। দক্ষিণভারতে ভাইকোমে মন্দির-পথ নিয়ে অবর্ণ ও সবর্ণে যে বিবাদ চলছে, তার মূল ভাসা-ভাসা নয়, দুই রয়ে বিরোধ, কাল তে গোবাতে বিরোধ। অবিশ্বাসী ইংরেজ রাজা এই বিরোধ মানছেন না, কারণ সেটা প্রজায় প্রজায়। ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীও দেখাদেখি মানতে পারছেন না, কারণ তা হ'লে রাজার সহিত বিরোধও মানতে হয়। তাই সবর্ণের পরাজয়, অবর্ণের জয় হচ্ছে। কিন্তু এই জয় যে প্রহার দ্বারা ভূত-ভাগানা, তা ভুললে চলবে না। যেহেতু সবর্ণ জাতি লোকের আত্ম-হত্যা দেখতে পারে না, দেখলে তার মনে কষ্ট হয়, ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করে, অতএব তার পথে তার দুয়ারে 'হত্যা' দিয়ে পড়,—এর তুল্য নিষ্ঠুর প্রহার আর নাই। এখানে কি 'সত্য' আছে, যার জন্য আত্মহত্যা পণ করতে হবে, তা আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে আসছে না! 'ধর্ণা' দিয়ে পড়লে হ'তে পারে ফললাভ, কিন্তু সেটা হিংসা। "আমি তোমারই মতন মানুষ"—এটা, এই ভাব আমার কাছে সত্য বটে; কিন্তু তোমাকে উৎপীড়িত করে' আমার এই সত্য-প্রচার অহিংসা নয়, হিংসা। এই কারণে মহাত্মা গন্ধী যেখানে সেখানে সত্যাগ্রহ অনুমোদন করেন না।

ভাইকোমের সবর্ণ জাতির কারুণ্য নাই, তা ত নয় ! কিন্তু অনিষ্ট-পাতের আশঙ্কা প্রবল হয়ে কারুণ্যকে রুদ্ধ করেছে। আর এক আশঙ্কাও আছে। আজ মন্দিরের পথ ছেড়ে দিলে কাল অবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইবে। সে যে আরও বিপদ্; দেবতা অবর্ণস্পর্শে দেবত্ব ছাড়বেন ? ছাড়লে, সবর্ণ কাকে আশ্রয় করে' বাঁচবেন ? নির্বোধ বলে, "হে ব্রাহ্মণ, তোমার ব্রহ্মতেজে আমার কু-কে ভস্ম করতে পারছ না ? তোমার দেবতাও আমার কু-কে ভয় করেন ? তা হ'লে দেখছি, তোমা অপেক্ষা, তোমার দেবতা অপেক্ষা আমার শক্তি অধিক।" লোকে নিজের ছিদ্র দেখতে পায় না, তাই এ ভাবে তর্ক করতে পাবে। সম্প্রতি আমেরিকায় নিগ্রোদের সম্মেলন হচ্ছে। তাতে খ্রীষ্টান নিগ্রো বলছে, তাদের ঈশ্বর কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতজাতির শ্বেতবর্ণ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে তাদের অধঃপতন হয়েছে।

কেহ কেহ বলে, ভাইকোমের মন্দির-পথে মুসলমান ও খ্রীষ্টান যেতে পারে, সবর্ণেরা আপত্তি করে না, কিন্তু অবর্ণ গেলেই তাঁরা বাধা দেন,— এটা ভণ্ডামি, দুষ্টামি বই আর কি ? আমি ঠিক খবর জানি না, কিন্তু ইহা সত্য মানতে পারি। কারণ বাঙ্গালা দেশেই ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। দেখছি, যাঁরা ইংরেজী-শিক্ষিত ও কুসংস্কার-বর্জিত, জাতি-বিচার মানেন না, কার ছোঁয়া জল কে খাচ্ছে, কোনও চিন্তা নাই; তাঁদের এ ভাব শহরে, পোষাকী ভাব। কিন্তু গ্রামে যেমনই পদার্পণ, অমনই সেই বাল্যকালের সেই রাস্তার ধারের বটগাছ ভূতের বাসা হ'য়ে দাঁড়ায়। শহরে সে গাছ নাই, যদি বা থাকে সে রাস্তা নাই। গাঁয়ে গেলেই সেই গাছ ডালপালা মেলে ঝাঁপুড়া হয়ে দাঁড়ায়। তলা দিয়ে যায় কার সাধ্য, গা ছম-ছম করতে থাকে। সাহসী বলছেন, "এই দেখ না, আমি যাচ্ছি, ভূত-টুত কিছু নাই।" যে দাঁড়িয়ে আছে সে ভাবছে, "তোমাকে ধরলে না বলে' কি আমাকেও ধরবে না ? ভূত

যে আছে, তার সন্দেহ নাই। না থাকলে আমার ভয় হবে কেন?" গাঁয়ের ভূত শহরে যায় না, বিদেশে সঙ্গ নেয় না, রাতদুপুরে শ্মশান মাড়িয়ে গেলেও কিছু বলে না। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সে বটগাছ নয়, কু করবার যে শক্তি আছে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তারা হিন্দু নয়, কোনও দিন মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর পূজা করতেও বসবে না।

মনের ভিতর ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয় না থাক্‌লেও সামাজিক শাসনের ভয় থাকে। সমাজ 'পতিত'কে এক-সঙ্গে খেতে দেয় না, এক-ঘর্‌যে করে' রাখে। কারণ, তাকে চালিয়ে নিলে অপরেরও 'পতিত' হবার ভয় থাকবে না, ফলে শেষে অনেকেই 'পতিত' হয়ে সমাজ ভেঙ্গে দিবে। শাস্ত্রে নাকি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন্ দিকে কতখানি গেলে সমুদ্রযাত্রা হয়, বোধ হয় তা লেখা নাই। এই কারণে বঙ্গ ও আরব-সাগর পাড়ি দিলে, এমন-কি চীনসমুদ্র বেড়িয়ে এলে বাধা হচ্ছে না। কিন্তু ইংলণ্ডে গেলেই যে হয়, তার কারণ ইংরেজ দেখছি!

হিন্দুসমাজ এক বিশাল বটবৃক্ষ। কত ক্লান্ত পথিক এর তলায় এসে আশ্রয় ও শান্তি পাচ্ছে মুখ-দেখা-দেখি হচ্ছে, কথা কহা-কহি চলছে, কিন্তু রান্নার 'চৌকা' আলাদা আলাদা। বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ হ'লে কি হয়, 'মছলী খাতা'; ঢেলার বেড়াতে কু আট্‌কাতে পারা যাবে না, দূরে গিয়ে 'চৌকা' কর! পূর্ববঙ্গে মুসলমানের-দোগা গাই দুধ অবিচারে ব্রাহ্মণের ভোজনে লাগছে, কেন না গব্যরসে জল নাই, জল মিশিয়ে বেচা হয় না। উড়িষ্যায় 'কেঅট' নামক এক ধীবর জাতি স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণের মনস্তাপের অবধি থাকে না, কিন্তু তার কোটা চিঁড়া ব্রাহ্মণের ও দেবতার ভোগে চলছে। চিঁড়া অগ্নি-পক্ক নয়, ঘৃত-পক্কও নয়, পয়ঃ-পক্ক। এইরূপ যে কত আচার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে চলছে, সে-সব একত্র করলে মানব-চরিত্রের নিভৃত কন্দর অসঙ্গতি-পূর্ণ দেখা যাবে। কালে দেশাচারও স্মৃতির তুল্য বলবান্ হয়ে ওঠে।

সমাজ-সংস্কারক অধীর হয়ে বলছেন, "বট-গাছটার ডাল-পালা কেটে দাও, ভূতের বাসা ভেঙ্গে যাবে।" সমাজ বলছেন, "ডালে ডালে এমন জড়িয়ে গেছে, বেছে বেছে কাটবার জো নাই।" ধর্মসংস্কারক বলছেন, "গাছটাই আপদ্ গাছটাই কেটে ফেল, ভূতের বাসা ঘুঁচে যাক।" ধর্ম বলছেন, "তা হ'লে আমি কোথায় থাকব ?" শিক্ষক বলছেন, "কেউ কাটতে পারবে না, কারও সাহস হবে না। বিলাতে তৈয়ারী এই তীক্ষ্ণ সূচী দিয়ে মূল বিদ্ধ কর, গাছটা আপনি শুখিয়ে মরবে, কাকেও কিছু করতে হবে না।" কিন্তু ছাত্র বলছেন, "আর সে শিক্ষা দিবেন না, আমি অমনই শুখিয়ে মরছি।" রাষ্ট্রনীতিক বলছেন, "ভাই হে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করে' তোমরা অধঃপাতে গেছ, এখন ক্ষমা দেও, ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি কর।" ভাইরা কাতর হয়ে বলছে, "কোলাকুলি করতে পারছি না যে।"

জরাজীর্ণ সমাজে কেহ রসায়ন প্রয়োগ করছেন না, দুর্বল দেহে বল-সঞ্চারের চিন্তা ভাবছেন না। শিকড়-মাকড়, জাড়ী-বুটী দিয়ে মৃত্যু-কাল কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু যৌবন আসবে না। ভাইকোমে সত্যাগ্রহীরা মন্দিরের পাশের পথ খোলা পাবে, কিন্তু আর যে হাজার পথে লোহার কপাট পড়বে, বোধ হয় সে চিন্তা করে নাই। যে দ্বেষ ভিতরে ভিতরে ছিল, সবর্ণের মনে তা জেগে উঠবে, রোষে ভবিষ্যৎ মিলন দুর্ঘট করে' তুলবে।

বঙ্গদেশেও যে-সব নিম্নজাতি নাম বদলে উচ্চ হ'তে চাচ্ছে, তাদেরও বুদ্ধি সফল হবে মনে হয় না। কারণ, তারাও ছোট ও বড় স্বীকার করছে, স্বীকার করছে না কেবল নিজেদের নিম্নতা। অর্থাৎ তোমরা নীচে থাক, আমরা উপরে উঠি। যে বটগাছ সে বটগাছই থাকছে, লোকে আমগাছ বলে ভাবতে পারছে না। দু-চারি পুরুষ গেলে হয়ত আমগাছ মনে হবে, কিন্তু প্রকৃত আমগাছ হওয়া অসম্ভব। ফলে এখন যে ভেদ আছে, তখনও

থাকবে, অসহযোগ মাত্র প্রবল হবে। বুঝি আত্ম-গৌরব সকলের সাধ্য নয়, সাধ্য জাতি-গৌরব। প্রত্যেক ইংরেজ কিছু বড় নয়, কিন্তু ইংরেজ জাতিটা বড়, সেই গৌরবে প্রত্যেক ইংরেজেরও গৌবব। কিন্তু এখানে গৌরব ব্রাহ্মণেব কাছে ; ব্রাহ্মণ বিমুখ হ'লে, কে গৌরব মানবে? শুধু ব্রাহ্মণ নন, অন্য যে-সব জাতি সহযোগে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করত, তারাও তুষ্ট হবে না। বুঝতে হবে জাতিতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়েও পরতন্ত্র, এক হিন্দুতন্ত্র। সুতরাং হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে থাকতে হ'লে প্রত্যেককে পবের অধীনতা স্বীকার কবতে হবে। সমাজ অর্থেই স্বাধীনতার খর্বতা। কেহ উচ্চ কেহ নীচ থাকবেই, কেহ প্রভু কেহ দাস হবেই। কিন্তু উচ্চ-নীচের সহযোগে, প্রভু-দাসের পরস্পব সাহায্যে সংসাব চলছে। ছোট মনে করলেই ছোট, নইলে কে কাকে ছোট করতে পারে? রাজার জেল-খানা আছে, আমাদের দেহটাকে জেলে পূবতে পারেন, কিন্তু মনকে ত পারেন না। হিন্দুতন্ত্রেব বাইবে গেলেও জয় হবে না। কারণ যে-জন্য যুদ্ধ তা পাবে না, নিজেব অস্তিত্ব ভুলতে হবে। আর যদি অস্তিত্বই গেল, তা হ'লে যে, সবস্ব গেল।

অবশ্য এত কথা কেহ ভাবে না, সকলে ভাবতে পারে না। অভিমান অবশ্য চাই, কিন্তু অভিমান প্রেমের ঈর্ষা, তাতে রোষ থাকে না। এই কথা বুঝতে না পেরে নব্যা নারী ভাবছে, সে স্বামীর দাসী নয়, সমান। যখনই সাহিত্য-পত্রে নারীর অধিকার আলোচিত হ'তে দেখি, স্বামী-স্ত্রীর অধিকাব ভাগাভাগি করতে দেখি, তখনই বুঝি প্রেমের অভাব। "স্বামীর সেবা কেন করবে?" কারণ, সেবাতেই তোমার আনন্দ, সেবা না করে' তুমি থাকতে পাব না, তোমার ইচ্ছা হয়, তাই সেবা কব। তেমনই যে-স্বামী স্ত্রীর সেবা আদায় করে, সেখানেও বুঝতে হবে মিলনে দোষ আছে, সে স্ত্রীর দাস হ'তে পারছে না। এরূপ ঘটনা কোনও সমাজে বিরল নয়। কোন্ আচারে কত, তা গ'ণবারও নয়। কোন-

কোনও সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মনান্তর হ'লে স্থানান্তরের বিধি আছে। পূর্বকালে হিন্দু-সমাজেও ছিল। সে যা হ'ক, দেখা যাচ্ছে, প্রেমের বিরোধ প্রণয়-কলহ, মিলন তার ফল। অপ্রেমের বিরোধে মিলন হয় না, আপোষ হ'তে পারে।

বঙ্গে উচ্চ ও নিম্নে যে বিরোধ আরম্ভ হয়েছে, যাঁরা গ্রামে থাকেন, তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। কোনও পক্ষের শান্তি নাই। নিম্ন বলছে, "আমি উচ্চ, আমায় উচ্চ মনে রেখে আমার সহিত ব্যবহার করবে।" উচ্চ বলছে, "তুমি এতকাল নিম্ন আসনে বসতে, আজ তোমায় উচ্চ আসন দিতে গেলে সকলের আসন বদলাতে হয়, আমার সে শক্তি কোথায় ?" নিম্ন বলছে,"যদি তোমার শক্তি নাই, দেখ আমার শক্তি আছে কি না। আমি তোমার কোনও কাজ করব না।" ফলে ঘটছে এই, পরস্পরের সাহায্য হ'তে পরস্পর বঞ্চিত হয়ে উভয়ে কষ্টে কাল কাটাচ্ছে। পশ্চিম দেশে ধর্মঘট হয় বেতন বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে। এদেশে তাও আছে, আর নূতন হচ্ছে 'বড়' প্রমাণ করতে গিয়ে। যাঁরা গ্রামের মধ্যবিত্ত, যাঁরা 'ভদ্রলোক' বলে' গণ্য, তাঁদের দুর্দশা বাড়ছে। কৃষিজাত শস্য তাঁদের একমাত্র ভরসা। . কিন্তু কৃষাণ অভাবে জমি পতিত থাকছে, কিংবা কৃষাণের করতলগত হচ্ছে। নিম্ন তার শক্তি বুঝছে, উচ্চ 'হা অন্নে'র দল বাড়াচ্ছে ; এক দিকে সমাজ-নীতির আক্রমণ, অন্যদিকে অর্থনীতির যোগ হওয়াতে বিরোধ ক্রমশঃ দ্বেষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্রমবাদী বলছেন, "নিজের কাজ নিজে কর, নিজের জমি নিজে চাষ কর, ভৃত্যের অপেক্ষা করছ কেন ?" জন-সাম্যবাদী বলছেন, "উচ্চাসন চাচ্ছে, দাও না ; নিম্নে কেনই বা চিরকাল থাকবে ?" ধন-সাম্যবাদী ব'লছেন, "তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' থাকবে, আর যারা খাটছে, তারা রোদে তেতে জলে ভিজে তোমার আহার যোগাবে ?" এইরূপ সকলে সাম্যের উপদেশ ঝাড়ছেন, কারণ তাঁদিকে সে-উপদেশ পালতে হচ্ছে না। পশ্চিমদেশে

একত্র আহারে, পরস্পর বিবাহে বাধা নাই, সেখানেই এই সাম্যবাদে কি বিসম্বাদ ঘটেছে, তা' দেখেও এদেশে যেখানে মিলনের দুই পথই রুদ্ধ, সেখানে এই বাদ চালাতে গেলে বিপ্লব নয়, কারণ পুলিশ ও ফৌজদারী কাছারী আছে, স্বরাজ্যের সুখের স্বপ্ন আর দেখতে হবে না। সমাজের গতি, অর্থনীতির গতি সমান নয়, ঋজু নয়। উত্থান ও পতন, পতন ও উত্থান, এইরূপ বক্র। যাঁরা নীতিজ্ঞ, তাঁরা দেখেন, কিসে উদ্‌গমন ও অবনমন ঋজু না হয়ে জলের তরঙ্গের ন্যায় বর্তুল হয়। 'ছোট' যে 'ছোট' ছিল, কিংবা ভূমিহীন ছিল, সে কি 'বড়'র দুষ্টামিতে? 'ছোট'র ইচ্ছা ছিল 'ছোট' থাকতে, 'বড়'র ইচ্ছা ছিল 'বড়' হ'তে। 'ছোট'র সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি নাই,—এইটা সাধারণ লক্ষণ। তাদের প্রবৃত্তি ক্ষয়ের। যে কার্মিক এখন যত বেতন পাচ্ছে, সে তত ব্যয় করছে; ফলে উপার্জন অধিক হলেও স্থিতি হচ্ছে না। কারও হচ্ছে না, এমন নয়। যাদের হচ্ছে, তারা 'বড়' আছে, 'বড়' হবে। কিন্তু ক'জনের হচ্ছে, ক'জনের হচ্ছে না, যার চোখ আছে সে দেখছে। 'বড়'র দুষ্টামি নাই, এমন নয়। বরং আপাত-দৃষ্টিতে দুষ্টামিই চোখে পড়ে। কিন্তু সমষ্টি দেখলে বুঝি, 'বড'র অনুকূলতা নাই, এই পর্যন্ত। তথাপি সাম্যবাদী দোষ দিয়ে বলছেন, বড় ছোটকে জ্ঞানের আলো দেখান নাই কেন? কিন্তু কথাটা ঠিক সেই-রকম, যখন আমরা ইংরেজ রাজাকে বলি তোমরা যুদ্ধকৌশল শেখাও নাই কেন? ইহার উত্তরও সোজা, তোমরা শিখতে চাও নাই কেন? যারা ছোট ছিল, তারা জ্ঞানের আলো চায় নাই।

কিন্তু এখন ত চাচ্ছে। তেমনই এখন কোন্ 'বড়' সে আলো তাদের কাছে নিভিয়ে দিচ্ছেন? বড় প্রতিকূল নন, কারণ তিনি বোঝেন 'ছোটকে বড় করে' তুলতে পারলে তিনিও বড় হবেন। এটা বুদ্ধির কম। ইহাও বুঝছেন, যেমন চলছিল, তেমন আর চলবে না, হাত বাড়িয়ে ধরতে হবে। কিন্তু ভয় এসে বিরোধ করছে, বলে, কর কি?

ভয়, মনের আদিম ভাব নয়, এটা শেখা, স্বোপার্জিত, একত্র বস-বাসে, লোকের দৃষ্টান্তে, লাভের লোভে, ঘুচতে পারে। ছেলেবেলা হ'তে জুজুর ভয় দেখাতে দেখাতে জুজু শেষে মূর্তিমান্ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম হ'তে এই কু-শিক্ষা ছাড়তে হবে। বিপদ্ এই, চিরকালের অন্তর্নিহিত সংস্কার সহজে ঘোচে না। ব্রাহ্মণ, শূদ্রের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারছেন না, কি জানি অশুচি হন। তেমনই উপায়ও দেখিয়ে দিচ্ছেন, শৌচাচারী হ'তে হবে। সুখের বিষয়, দুই-চারি জাতি ছাড়া সকলের আচার ভাল। যেখানে নয়, সেখানে শৌচজ্ঞানের অভাব মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝি, সেটা প্রায়ই অর্থের অভাবে। একথাও ঠিক, অনেকেরই শৌচ-জ্ঞান ভাসা ভাসা, আচারের উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। একথা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও খাটে।

তথাপি ব্রাহ্মণের যে সংস্কার হয়ে গেছে, তাকে দূর করা সোজা নয়। আচারে শুচি বটে, কিন্তু জাতিতে শুচি নয়, পূর্ব পুরুষে নয়। শাস্ত্রে একথা লেখা আছে। কিন্তু যেটা লেখা নাই, জানা নাই, সেটাই বিষম বাধা। এই সন্দেহ তাড়াতে হ'লে ব্রাহ্মণকে বলবান্ করতে হবে। উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, তিনি ও অপর মানুষ কি বস্তু, তা' তিনি ভুলে গেছেন, জড় মাংসপিণ্ডকে ভয় করছেন। লোক-ব্যবহারে মাংসপিণ্ডের ভাল-মন্দ অবশ্য আছে, কিন্তু সে পিণ্ড যখন শুচি তখন কোন্ অপবিত্র স্থানের কোন্ অপবিত্র দ্রব্যের কতগুলা অণু দেহে সঞ্চিত হয়েছে, সে গণনা কেন করবেন ? তিনি কালের গতি রোধ করতে পারবেন না, নিজকে বিচ্ছিন্ন করে' রেখে শান্তিও পাবেন না। যাঁর চোখ আছে, তিনি দেখছেন, পূর্বকালের জন্মগত জাতিভেদ ভেঙ্গে যাচ্ছে, নূতন বর্ণ গড়ে' উঠছে। গুণে, যার মধ্যে আচার প্রধান, নূতন বর্ণের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। যখন কর্মে সে গুণ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন পূর্বের সন্দেহ মনে আর উঠছে না।

বিপুল হিন্দুসমাজের অধিপতি দুর্বল হওয়াতে সমাজও দুর্বল হয়ে

পড়েছে, পুরাতন জুজু বিকট আকারে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। ব্রাহ্মণ সবল হ'লে, সমস্ত সমাজ সবল হয়ে উঠবে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্মের গ্লানি দূর হবে। ধর্মের গ্লানি হেতু হিন্দুর অধঃপতন; যিনি সে গ্লানি দূর করতে পারবেন, তিনিই ব্রাহ্মণ হবেন, আচার্য হবেন। আচার্য থাকলে কি তারকেশ্বরের মহান্ত অত্যাচারী হ'তে পারত? তিনি মহান্তকে একঘরে করে' রেখে হিন্দুর ঘৃণার পাত্র করে' অক্লেশে তাকে দেশ-ছাড়া করতে পারতেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বুঝাতে হবে, কর্ম নীচ নয়, উচ্চ নয়, কর্ম কর্ম, সে কর্ম জুতা সেলাই হ'ক আর চণ্ডীপাঠ হ'ক। কর্তা ও কর্মের ভেদ ভুলে গিয়ে কর্তার হীনতা কর্মে আরোপিত হয়েছে। অধিকারী-ভেদ হিন্দুধর্মের মজ্জাগত। অথচ সে ভেদ অস্বীকৃত হচ্ছে, ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে না।

মহাত্মা গন্ধী হ'তে ছোট বড় সব রাষ্ট্রচিন্তক একবাক্যে বলছেন, অস্পৃশ্যতার ভূত তাড়িয়ে দাও। কিন্তু তাড়াবার উপায় কি, তার আলোচনা দেখতে পাই না। হীন জাতি ভূত নয়, মানুষ,—একথা শুনতে শুনতে কারও কারও বিশ্বাস ও সাহস জন্মিবে বটে, কিন্তু তাতে বহুকাল লাগবে। মহাত্মা কোল দিলে যে দেশসুদ্ধ কোল দিতে পারবে, তাও নয়। মহাত্মা পারেন, কারণ মহাত্মা মহাত্মা। তাঁর অনুচর দশ জন কি সহস্র জন গ্রামে গিয়ে হীনজাতির প্রদত্ত জল ও সন্দেশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু বিপুল হিন্দুসমাজ চেয়ে দেখবে, গ্রামে তাঁদিকে পতিত করে' রাখবে। কিন্তু যে-দিন গ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয় জল-সন্দেশ গ্রহণ করবেন, সেই দিন অস্পৃশ্যতা দূর হবে, তার পূর্বে নয়। থাকতেন নদীয়ার গোরা; তাঁর কাছে শুদ্ধিবারি ছিল। তথাপি তাঁর কর্মস্থানেই লক্ষ লক্ষ নর-নারী সে-বারি স্পর্শ করে নাই।

কংগ্রেসের কাছে কি মন্ত্র আছে, যাতে মনে করেন এই দুষ্কর কর্ম

করতে পারবেন ? এত কাল হ'ল হিন্দু স্বরাজ্য হারিয়েছে, যে তার স্মৃতিও লুপ্ত হ'য়ে গেছে। সে হিন্দু কজন, যে স্বরাজ্যকে স্বর্গরাজ্য মনে করতে পারে ? আর, কেবল স্বরাজ্য স্বরাজ্য শোনালে অবুঝ ভাববে, পরের প্রাপ্য পরিশোধ করতে হবে না, নিজের প্রাপ্য চতুর্গুণ হবে। কারণ লোকে চায় এই। যখন দেখবে, সে-সব নয় তখন কারও বাধা মানবে না।

মহাত্মা বলছেন, সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-ধর্ম শেখাও। কিন্তু কত তপস্যায় স্বাভাবিক কাম-ক্রোধ-লোভ দমন হ'তে পারে ? তাঁর কাছে সত্য ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা সহজ, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ ইহার একটারও ধার দিয়ে যায় না। চরকাকে যোগ-সাধনের আসন-বিশেষে পরিণত করলেও ক'জনে তা ঘুরাবে ? চক্র-পরিবর্তনের প্রবর্তক কই ? তাই মনে হয়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যেটা সকলেরই আছে, কিন্তু উপলব্ধি নাই, সেটা না জাগালে মনশ্চক্র জাগবে না। এই কর্ম কংগ্রেসের নয়, শক্তি-সাধকের! শক্তিমানে অহিংসা-ধর্ম পালন করতে পারে, সত্যাগ্রহ করতে পারে। কেবল মনের শক্তি নয়, দেহেও শক্তি চাই। দেহে শক্তি না থাকলে ক্লৈব্য হয় অহিংসা, মনে না থাকলে সত্যাগ্রহ হয় হত্যা দেওয়া। প্রথমে হিন্দুতে-হিন্দুতে সহযোগ, তার পর অন্য কথা।

আমার মালী *

বেশ মানুষটি ছিল, আমার মালী। গত বৈশাখ মাসে একদিন সকাল বেলা সে ব'ললে, "আজ্ঞে, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না, বয়স তিন কুড়ি পাঁচ হ'ল। এখন ছুটি নেবার সময় হয়েছে।"

আমি তখন পড়ছিলাম, তার অর্ধেক কথাও শুনতে পাইনি। মাথা না তুলেই ব'ললাম, "কেন ?"

বেচারা আমার ভাব দেখে আর-একটি কথা না ক'য়ে তার বাগানে চলে' গেল।

বাড়ী ঢুকতেই চার-পাচ কাঠা জমি ছিল। সেটায় যত কাঁটাগাছ আর জঙ্গল। মালী সেই জমি পরিষ্কার করে' বাগান করেছিল। বাগানটি তারই ছিল। তার যা খুসী সে-গাছ সে লাগাত। আমার পড়বার ঘরের ডা'নদিকে বাগান, জান্‌লা দিয়ে অর্ধেকটা দেখা যেত। কিন্তু বাগান দেখবার আমার সময় হ'ত না।

তার বয়স ভাবলে সে খুব খাটত। যখন সে আমার কাছে চাকরি ক'রতে আসে, তখন কেউ তাকে রাখতে চায়নি। সে বুড়ো ; বুড়ো, কি কাজ ক'রবে! আমি কিন্তু তার মুখের ভাব আর দাঁড়াবার বিনীত ভঙ্গী দেখে রেখেছিলাম। তাকে ভাল মনে হয়েছিল। পরেও দেখেছি, আমার ভুল হয় নি।

আমি তার নাম জানতাম না। বাড়ীর কেউ জানত না। আমরা তাকে "বুঢ়া" বলে' ডাকতাম।

সেদিন সে গেল, বোধহয় দুঃখ পেয়ে। আর একদিন সুযোগ বুঝে আবার সে সেই কথা তুললে। এবার আমি বললাম, "লোকে কি শুধু-

---

* আমার কটকের বাসার ওড়িয়া মালী। ইং ১৯০৮ সালের পরে।

শুধু চাকরি ছাড়তে চায় ? তুমি কেন যেতে চাও ? যা পার তাই কর, তা হ'লেই হবে।"

"আজ্ঞে, আমার প্রভুর সেবা যে এখনও বাকী আছে। যে ক'টা দিন আছে, তাঁর সেবা ক'রতে চাই।"

উত্তরটা আমার ভারি নূতন ঠেকল। আমি তাকে ভাল রকমই জানতাম, কিন্তু কখনও ভাবি নাই, সে এতদূর ক'রবে। আমি তাকে ছাড়তে চাই না। বললাম, "আচ্ছা, বুঢ়া, এখানে থেকেই তোমার প্রভুর সেবা চলে না কি ?"

"তা কেমন করে' চ'লবে ? একমনে কেমন করে' হবে ?"

তবু সে জাতিতে বাউরী। অপর চাকরে তাকে ছুঁ'ত না।

আমার বোধহয়, ওড়িয়া ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সবটা তার কণ্ঠস্থ ছিল। সে সময়ে সময়ে ভাগবতের পদ আওড়াত। আমার আশ্চর্য বোধ হ'ত। সে লেখা-পড়া শেখে নাই, অথচ এত জানত !

"কিন্তু, বুঢ়া, আমি ত জানি, সূর্য উঠবার আগে আর রাত্রে শোবার আগে তুমি ভগবানের নাম অনেকক্ষণ কর। কাজ ক'রবার সময়েও মাঝে মাঝে নাম কর। 'আর কি চাও ?"

আমার কথা শুনে সে যেন বিষণ্ণ হ'ল। হয় ত ভাবলে, আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তাকে প্রসন্ন ক'রতে ব'ললাম, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

বেচারা আমার অনুমতি না নিয়েই অনায়াসে চাকরি ছাড়তে পা'রত। কিন্তু সে তেমন মানুষ নয়।

"দেখ, তোমার ছেলেকে দিয়ে যাও না ? জান ত একজন ভাল-লোক পেতে সময় লাগবে। ততদিনে তোমার হাতের বাগান বন হ'য়ে উঠবে।"

"আমার ছেলে পারবে কি ? এখনও সে কুড়িতে পড়েনি। যে

বছর তার জন্ম হ'ল সে বছর আমাদের গাঁয়ের মাহান্তিরা আমার ঘরের পাশের ১০ বিঘা জমি নিয়েছিল। সে উনিশ বছর হ'ল।"

"আমি ত তার কাজ দেখেছি তোমার অসুখের সময় সে-ই ত মালী হয়েছিল।"

কিন্তু বুড়া অবুঝ। সে জানে না, পূর্বজন্মে তার ছেলে কি কর্ম করেছিল, এজন্মে কি ফল ভোগ করবে।

"আচ্ছা, তুমি কি জান, পূর্বজন্মে তুমি কি করেছিলে?"

"না জানলে উনিশ বছর থেকে মালী হলাম কি করে'?"

আমার তর্কের সময় ছিল না। থাকলেও তাকে বোঝাতে পারতাম না।

কিছুদিন গেল। একদিন বাগানের মাঝ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। সে আমায় একটা বড় পাথর দেখালে। কি বলবে, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আর কিছুই বললে না, শুধু বললে, "আজ্ঞে, আমায় ছুটি দেন।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই কথার জন্য পাথর দেখানা কেন, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মনে হ'ল, পাথরটা সেখানে ছিল না। কোনও দেবা পাথরটাতে এসে তাকে চাকরি ছাড়তে বলেছেন না কি? তাকে কথাটা বলতে সাহস হ'ল না। কি জানি, তার মনে কি হয়। আমি শুধু বললাম, "পাথরটা ত এখানে ছিল না?"

"না, আমি ভোর বেলা খুঁড়ে বা'র করেছি।"

আমি হাঁফ ছাড়লাম। কেউ পাথরটা খুঁড়তে বলে' থাকবে। বুড়ার কষ্ট হয়ে থাকবে। তাই আমি বললাম, "কে তুলতে বলেছিল? যদি ভারী লাগল, আর কাকেউ ধরতে বললে না কেন?"

"আমি ভোরেই না তুলে করি কি? এই পাথর! এর জন্যে লোক ডাকব?"

আমার আবার মনে হ'ল, হয়ত কোনও দেবী রাত্রে স্বপ্ন দিয়ে পাথরটা তুলতে বলেছিলেন। নইলে এত তাড়াতাড়ি কেন? সেও ত আমাদের মতন কত কি মানে।

"যদি কেউ বলে নাই, তবে তুলতে গেলে কেন?"

সে আশ্চর্য হয়ে রইল। কারণ পূর্বদিন সন্ধ্যার পর এক ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সে পাথরটা সেখানেই মাটিতে পোতা ছিল, একটা কোণ একটু জেগে ছিল। এতদিন কেউ দেখে নি। ভদ্রলোক অন্ধকারে দেখতে পাননি, পাথরে হোঁচট খেয়েছিলেন। মালী দেখেছিল।

"মহাপ্রভু রক্ষা করেছেন, নইলে হানি হ'ত।"

"যদি বা হ'ত, তোমায় কেউ দোষ দিত না।"

"আমায় না দিয়ে আর কাকে দিত? আপনার সময় নাই, বাড়ীতে কি হয়, না হয়, অপরে তা দেখে না। আমি যদি না দেখি, আমি আছি কেন? আমার পশু-জন্ম না হয়ে মানুষ-জন্ম হ'ল কেন?"

তার এই শেষের যুক্তি আমার বেশ জানা ছিল। ইহার খণ্ডন ছিল না।

"বুড়া, তুমি ভালই করেছ, পাথরটা তুলেছ। কিন্তু যেতে চাও কেন?"

আমার কথায় সে অবাক হয়ে গেল। বোধ হয় মনে মনে আমার বুদ্ধির নিন্দাও করেছিল। কিন্তু শুধু বললে, "পাথরটা বড় ভারী লেগেছিল।"

"হ্যাঁ, পাথরটা বড়। এত তাড়াতাড়ি না করে' কাকেও ডাকলে হ'ত।"

বলে'ই মনে হ'ল, কেউ তার সঙ্গে পাথরটা ধরত না, ধরলে তাঁদের জাতি যেত। তারা মনে করত, ভগবান্ তাদেরই, বাউরীর নয়। বোধ হয় মালী তাদের এই অবিশ্বাস টের পেয়ে দুঃখ পেত।

কিন্তু আমি আবার ভুল করলাম।

"কি? কুড়ি বছর আগে একজোড়া ভারী জাঁতা চারি ক্রোশ বয়ে এনেছি। এখন কিনা ছোট একটা পাথর ভারী লাগল!"

বুঢ়া কাঁদতে লাগল। তার গাল বেয়ে চোখের জল প'ড়তে লাগল। আমার দুঃখ হ'ল। ভোলাবার তরে বললাম, "তা সত্যি। কিন্তু সে ত কুড়ি বছর আগের কথা।"

"সেই কথাই আপনাকে জানাচ্ছি।"

কিন্তু কি লজ্জা! আমি তার মনের ভাব মোটে ধ'রতে পারি নি। তার মুখের পানে চেয়ে রইলাম, যদি কিছু বলে। কিন্তু সে তেমন লোক নয়, এক কথা দুবার বলবার নয়।

"তার পর?"

"আর কি চাই? বুঢ়া হয়েছি, জানতে বাকি কি?"

এখনও তার চোখ ছল-ছল করছিল।

"যদি এই কথা, তা হ'লে পাথর-টাথর আর তুলতে যেও না।"

হায়! সে কথাই নয়। সে যে বুড়ো হয়েছে, মহাপ্রভু আমার বন্ধুর পায়ে হোঁচট লাগিয়ে, পরে বুঢ়াকে দিয়ে পাথরটা তুলিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

আমি তার যুক্তির মর্ম বুঝলাম। কিন্তু তাকে ছাড়তে চাইনা। তেমন ধীর, তেমন বিশ্বাসী, তেমন টানের মানুষ সহজে মেলে না। তারই কথায় বলি, সে মানুষ হয়ে জন্মেছিল। পশু কেবল খাওয়া-শোওয়া জানে। এই কথা সে কতবার অন্য চাকরদিকে বলত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—যখন তারা দুপুর বেলা হ'তে স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে সারা বিকালটা কাটাত, তখন বুঢ়ার ঘুম থাকত না। সে বাড়ী ঢুকবার দরজার ডা'ন দিকে এক-কুঠরীতে বা তার মেলায় থাকত। তারা যেখানে-সেখানে পাতা-টাতা ফেলত, বুঢ়া সে-সব খুঁটিয়ে তুলে বেড়াত। আমি

তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইলাম, তার কুটুম্বের (পোষ্যের) কথা তুললাম। কিন্তু সে অবুঝ। খাবার পরবার ভাবনা মহাপ্রভুর, তার ভাবনা কি আছে ?

ভাল লোকটি! এতও জানত! সে অপর চাকরদিকে শেখাত। তারা তাকে "বুঢ়া-পো" (বুড়ো ছেলে) বলে' ডাকত। কত বাইরের লোক তার পরামর্শ চাইত। তাকে তারা মাহান্তি (মান্য ব্যক্তি) বলে' ডাকত। আগে যে মালী ছিল, সে ফুলগাছের যত্ন করত না। বুঢ়া ঢুকেই মল্লিকা ও তুলসী লাগিয়ে দিলে। দূরে নয়, আমার পড়বার ঘরের জান্‌লার ঠিক সামনে, যেন ফুলের সুগন্ধ পেয়ে প্রভুকে স্মরণ করতে পারি। কি দয়া! আমরা না চাইলেও তিনি সুগন্ধি সর্জনা করেছেন। মানুষ নির্বোধ; বিনামূল্যে পায়, তবু নিতে চায়না।

বুঢ়ার কিন্তু একটা দোষ ছিল। কোনও গাছ কাজের মনে করলে সেটা কিছুতেই সরাত না। একবার তার সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছিল। আমি ধরতাম, যেখানকার গাছ সেখানেই সাজে ; সে ধরত, সেখানকার না হ'লে সে জন্মিবে কেন? অত কথা কি, প্রভুর ইচ্ছা না হ'লে ঘাসও জন্মে না।

একদিন দেখি, বুঢ়া বাগান নিড়াচ্ছে। তার রোআ অন্য গাছের মাঝ থেকে কতকগুলা ঘাস উপড়িয়েছে। আমি সুযোগ বুঝে ধরলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেলাম, "সেগুলা কাজের ঘাস নয়।"

এই উত্তরে আমি খুসী হলাম। মনে করলাম, এবার বুঝিয়ে দিব, আমার কথাই ঠিক। কিন্তু বুঢ়াকে পারবে কে? বিনা প্রয়োজনে ভগবান্ কিছুই গড়েন নি। কিন্তু যখন সে প্রয়োজন আমাদের জানান্ নি, তখন তুলে ফেলতে দোষ নাই।

ভাল ফুল, ভাল শাগ-পাতা জন্মাবার তরে বাগান রাখা হয় নাই। বাড়ীটা পরিষ্কৃত থাকবে বলে' বাগান করা হয়েছিল। বুঢ়ার বা খুসী,

তাই রুইতে পেত। কখনও সে সারি সারি ধেঁড়শ লাগাত, কখনও শিমের, কখনও ঝিঙ্গার বন করত। কখনও বা মেঠো ফসল মাণ্ডিয়া চাষ করত। একবার বুঢ়াকে একটু অনুযোগও করেছিলাম।

"বুঢ়া, তুমি এত এত লাগিয়েছ কেন? দু-চা'রটে করে' লাগালেইত হ'ত। তা ছাড়া, এটা কি মাঠ যে মাণ্ডিয়া বুনবে?"

"আপণঙ্কর কৌন ক্ষতি হৌচি? ইন্দ্র বর্ষিব, পৃথ্বী ফলিব।"

"তা বটে।"

আমার এক ছোকরা চাকর ছিল। একদিন সে বললে, পাড়ার কেঅট ও অন্যান্য দুঃখীজন ফসলের ভাগ পায়। ইন্দ্র আর পৃথিবীর এত দান একলা ভোগ করলে পাপ হয়। এর পর আমি আর তাকে কিছু বলতাম না।

তার মতন বন্ধুবৎসল আমি আর দেখি নাই। বা'র বাড়ীর একতালায় সে খেত, শুত। কিন্তু এমন দিন প্রায় দেখিনি, যেদিন সন্ধ্যার পর একজন দুজন কেহ-না-কেহ বুঢ়ার বন্ধু (বাং কুটুম) না এসেছে। নিজের বন্ধু ও গ্রাম সুবাদে বন্ধু। মনে হ'ত বুঢ়ার কাছে বসুধৈবকুটুম্বকম্। সে তাদের জন্যে রাঁধত, বাড়ত, কত কথা কইত, কত হাসত। জানিনা, তার অল্প মাইনে থেকে কি করে' এত খরচ জোগাত। একবার আমার এক ছোট 'পূজারী' (পাচক ব্রাহ্মণ) বলেছিল, বুঢ়া বাগানের সব জিনিস বেচে চাল, ডাল, মাছ কেনে। সে দেখেছিল, বুঢ়ার বন্ধুভোজনে ভাল ভাল ব্যঞ্জন হ'ত। আমারও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ধরিনি। বাড়ীটা পরিষ্কার রেখেছিল।

সময়ে সময়ে পাঁচ-ছ' জন বন্ধু গ্রাম থেকে এসে তার কাছে খেত। পূজার সময় দেবী দেখতে দশ-বারজনও আসত। সত্য কথা বলতে কি, বুঢ়ার এই বন্ধু-প্রীতি আমার ভাল লাগত না। একদিন বন্ধুরা চলে' গেলে আমি বুঢ়াকে ধরলাম।

"দেখ, বাড়ীতে হোটেল খোলা ঠিক নয়।"

কিন্তু যে উত্তর পেলাম, তাতে আর কথা ব'লতে হ'ল না। এটা হোটেল কি? সে পয়সা নেয় কি? না, তা নয়। প্রভু তাকে মানুষ-জন্ম দিয়েছেন। সে চাকরি করে বটে, কিন্তু সারা জীবন মানুষ ছাড়া আর কি হবে? পশুর দয়া-মায়া নাই। মানুষ ত পশু হ'তে পারে না। লোকগুলি সহরের অপর বাড়ীতে যায় না কেন? আমাদের ভাগ্য যে তারা এ বাড়ীতে আসে।

বুড়ার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

একদিন দেখি, সকালে বুড়া আর পূজারী বকাবকি করছে। এত জোরে যে আমার পড়া বন্ধ করতে হ'ল। বুড়া জান্‌লার সামনে এসে পূজারীর নামে নালিশ করলে। পূজারী বুড়াকে চোর বলেছে।

"কেন? কি হয়েছে?"

"কা'ল রাত্রে জনকতক বন্ধু এসে পড়ল। ব্যঞ্জনের কিছুই ছিল না তাই বাগানের কাঁচকলা দিয়ে ব্যঞ্জন করি। এ কি চুরি হ'ল?'

আমি কষ্টে হাসি চেপে ব'ললাম, "নিশ্চয়ই না। কলাগাছ তুমিই রুয়েছ, ফল নিশ্চয়ই তোমার।"

"না, না। তা ঠিক নয়।"

কি ব'লব, বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, "তা যদি ঠিক নয়, তবে পূজারীর কথাই ঠিক।"

"কিন্তু, আমি কি নিজে কলা খেয়েছি? পূজারীর কথা ঠিক হবে কি করে'? লোকে কি যার তার বাড়ীতে যায়? তারা এখানে আসে কেন?"

"কারণ, তারা যা চায়, বোধ হয় তা পায়।"

"ঠিক। পূজারী বামুন হ'লেও ধর্ম জানে না।"

বুড়া কেবল যে তার ধর্ম রাখত, তা নয়, আমারও ধর্ম রাখত।

লোকে এসে ধর্ম পালবার সুযোগ দিত। আমরা দয়া করি নি, তারা করত।

বোধ হয়, বুড়া ঠিকই বলেছিল। কারণ যখনই বাগান দিয়ে যেতাম, তখনই তাকে মনে পড়ত। জানি না, বাড়ীতে গিয়ে ধর্ম সে কেমন রাখছে। যেমনই রাখুক, তেমন মানুষের মতন মানুষ আর পাব কি?

কোন্‌টি চান ?

ইং ১৯২৭ সালে একবার কলিকাতায় বর্ষা তিন মাস ছিলাম। মেছোবাজার ষ্ট্রীটের নিকটে বৈঠকখানা রোডের এক গলিতে বাসা ছিল। বাড়ীটি নূতন, দুতলা, তেতলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে খোলা। নূতন পাড়া, নূতন বাসায় গেলে জানতে ইচ্ছা হয়, পাশে কে থাকে, কি করে। আমি সকালে বেলা ৮টার সময় বাসায় উঠি। দক্ষিণের দুতলার বারাণ্ডা হ'তে দেখলাম, সমুখে ছোট উঠান, ইট-বাঁধা, বাঁ-দিকে এক অট্টালিকার বাম ও পশ্চাৎ পার্শ্ব। ডা'নদিকে একটা একচালা, একচালাতে গোটা চারি গাই আছে, বড় বড় গাই। একচালার বাইরে একটি বাছুর, পুষ্টদেহ, দাঁড়িয়ে। কাছে একটি লোক বসে' ছিল, দীর্ঘাকার, দীর্ঘনাসা, এককালে বলিষ্ঠ ছিল, বিহারী আহীর হবে। উঠানের বাঁদিকে অট্টালিকার গায়ে জলের একটা বড় চৌবাচ্চা, নিকটে জলের দুটা কল। কে এই প্রাসাদে থাকে ?

বেলা ১১টার সময় দেখি দশ, পাঁচ, পনর বালক চৌবাচ্চার জল ঘটী ঘটী মাথায় ঢালছে, কেহবা জলের কলের তলে কাপড় কাচ্‌ছে, আর কেহবা গামছা আছড়ে আছড়ে, বোধ হয়, সূতা বা'র করে' ফেলছে। আবার দশ বারটি এল, তারাও মাথায় ঘটী ঘটী জল ঢেলে কাপড় কাচতে ও গামছা আছড়াতে লেগে গেল। ছেলেদের বয়স বার হ'তে সতর আঠার বছর হবে। বাঙ্গালী নয়, পশ্চিমাঞ্চলের।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখি, কোন ছেলে লোহার তাওয়া, কেহ পিতলের থালা, কেহ পিতলের বাট্‌লো মাজতে বসে' গেছে। এমন মাজছে যেন কত কালের কি মলা লেগে ছিল।

বেলা ৩টার সময় অট্টালিকার একতলার সামনের ঘরে দেখি ছেলেরা বসে' গেছে, পাঠ পড়ছে। এটা কি পশ্চিমাঞ্চলের ছেলেদের টোল ?

বেলা ৫টার সময় দেখি জলের চৌবাচ্চা ও কলের কাছে মধ্যাহ্ন কাণ্ড চলেছে। মাথায় ঘটী ঘটী জল পড়ছে, কিন্তু এখন কাপড় ও গামছা কাচার ধুম নাই।

সন্ধ্যার পর তাড়িত-দীপ জ্বলে' উঠল। এখন সে ঘরে অনেক ছেলে, সবাই চুপ করে' বসে' আছে ; কে যেন কি বলছে। আধ ঘণ্টার পর, বোধ হয়, শতকণ্ঠে এক মন্ত্র হ্রস্ব দীর্ঘস্বরে উচ্চারিত হ'তে শুনলাম। তার প্রথম দুটা শব্দ, 'হরে মুরারে।'

রাত্রি ১০টায় দীপ নিবাপিত। অত বড় অট্টালিকায় সাড়াশব্দ নাই। রাত্রি ৪॥টার সময় ঘণ্টা বাজতে লাগল, ঘর আলোকিত। ছেলেরা কোথায় বেরিয়ে যেতে লাগল।

পরদিন সকালে ৬টার সময় দেখি দলে দলে ছেলে এসে কলের কাছে কাপড় কাচছে, গামছা কাচছে। দশ পনর জন নয়, চল্লিশ পঞ্চাশ হবে, কি আরও বেশী। ৭টার সময় সেই ঘরে ছেলেরা বসেছে, কে যেন কি বলছে, তারপর সেই মন্ত্র। শ্লোকটি বুঝতে পারলাম।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে॥

তারপর সে ঘরে জনকয়েককে পড়তে দেখলাম। এক মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক পড়াচ্ছেন। প্রত্যহ এই ব্যাপার দেখি।

বর্ষাকাল—ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি হচ্ছে, ছেলেদের দৃকপাত নাই, ভিজতে ভিজতে গঙ্গাস্নান করে' বলতলায় আসছে। ভিজতে ভিজতে তাওয়া, থালা, বাট্‌লো মাজছে। ছাতা নাই। বৃষ্টির পর শীত পড়লে গায়ে

চাদরও নাই। এত ছেলে, তিন মাসের মধ্যে ঝগড়া মারামারি দেখি নি, কলরবও শুনি নি।

এরা কে? কে পড়ায়? কে দেখে শুনে? জানতে প্রবল ইচ্ছা হ'ল। একদিন সুযোগও পেলাম। আমরা বঙ্গদেশে শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী-পূজা করি। ওড়িষ্যা ও পশ্চিমাঞ্চলে গণেশ চতুর্থীর দিন গণেশ-পূজা হয়। আমি পূজার পূর্ব দিন নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। উঠান হ'তে অধ্যাপকেরা আমায় দেখেছিলেন, কখনও বই-হাতে, কখনও সংবাদপত্র-হাতে; ভেবেছিলেন আমিও এক পড়ুয়া। বয়স হয়েছে, শ্বেত কেশ-শ্মশ্রুও আছে। স-ধর্মী প্রতিবেশীকে পূজার নিমন্ত্রণ অবশ্য কর্তব্য।

পরদিন বেলা ৯টার সময় পূজা দেখতে গেলাম। বৈঠকখানা রোড হ'তে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্টাপিসে যেতে ডা'ন দিকের ৯৩।৩ নম্বর বাড়ী। অট্টালিকার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'শিবকুমার সংস্কৃত-বিদ্যার্থী ভবন।' ভিতরে যেয়ে দেখলাম নীচের প'ড়বার ঘরখানি বনমালায় সজ্জিত হয়েছে, এখানে ওখানে ফুল ঝুলছে। এক মৃন্ময় গণেশ-প্রতিমার পূজা হয়েছে। ঘরের ভিতরে ত্রিশ চল্লিশ বালক এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, কিন্তু চেঁচামেচি নাই। সন্ধ্যার সময় আবার গেলাম, অনেক গণ্যমান্য মারোআড়ী ও বাঙ্গালী বসেছেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এক ব্যাখান শুনলাম।

পরদিন যেয়ে শিবকুমার-ভবনের বৃত্তান্ত শুনলাম। মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী-দ্রাবিড় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন, দেখলেন সেখানে বিদ্যার ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। তাঁকেও বিদ্যা বিক্রয় করতে হবে। তিনি এই দুষ্য কর্ম ছেড়ে দিয়ে এই বিদ্যার্থী-ভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক অধ্যাপক বাঙ্গালী, তাঁর নাম পণ্ডিত শ্রীচণ্ডীচরণ তর্করত্ন। তাঁর দশ বৎসরের এক পুত্রও ভবনে থাকে। শতাবধি

বালক বিনাব্যয়ে সংস্কৃত বিদ্যা লাভ করছে। এদের সঙ্গে পাঁচ-ছ জন অধ্যাপক থাকেন। ভবন হ'তে ভোজ্য এবং মাসিক কুড়ি-পঁচিশ টাকা পান। বালকেরা চা'ল, ডা'ল, আলু, ঘি পায়। কাঠ, নুন ও যৎসামান্য আনাজ নিজের পয়সায় কেনে। এরা কিন্তু কোথাও ভিক্ষা করতে যায় না। ভবনও কারও কাছে হাত পাতে না। পুণ্যশীলের অযাচিত দানে ভবনের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

বহির্দ্বারের বাঁ-দিকে একখানি ছোট একতলা ঘর আছে। সেখানে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হ'ত। অধ্যাপক মহারাষ্ট্রীয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এই বর্ষাকাল, শতাবধি বালকের মধ্যে কতজন রোগে পড়ে? কি রোগে পড়ে? তিনি বললেন, এমন কিছু নয়, তিন চারি জন কখন সামান্য উদরাময়ে কখনও সামান্য জ্বরে পড়ে। লঙ্ঘন ও পাচনেই প্রায় সেরে যায়। কদাচিৎ অন্য ঔষধ দিতে হয়। বালকদিকে দেখেও মনে হ'ল, দেহ পুষ্ট নয় বটে কিন্তু স্বস্থ। ভবনের অন্যান্য বৃত্তান্তে সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

২

আমার বাসার ডা'ন দিকে ছ-সাত ফুট দূরে আর এক প্রাসাদ। আমার ঘরের জানালা ও সে প্রাসাদের জানালা দিয়ে একটা ঘর দেখতে পেলাম। এ প্রাসাদে কে থাকে? দেখলাম, এক যুবা, কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উত্তম টেরিকাটা, গায়ে গেঞ্জি। একটা দোড়িতে তিন চারিটা রুমাল ও তিন চারিটা রঙ্গিন মোজা ঝুলছে। বোধ হয় সাবান দিয়ে কাচা হ'য়ে শুখাতে দেওয়া হয়েছে। যুবাটি যেই হ'ক, সৌখিন বটে। বর্ষাকাল; কাদাজলের ছিটা মোজায় লাগবারই কথা, জুতাও কোন্‌-না তিন চারি জোড়া আছে।

১১টার সময় আহারের পর আমাকে আধঘণ্টা বিছানায় গড়াতে হয়। ১১॥টা হবে, সেইমাত্র শুয়েছি, সে ঘর হ'তে দেবদারু কাঠের বাক্সের বাজনা বাজছে। গড়ের গোরার ঢাক। একটু পরে তক্তাপোষের গুড়্গুড় ধ্বনি উঠছে। আমি নূতন শুনছি। কানের কাছে নানা পরং বাদ্যে ঘুম আর হ'ল না। ৩টার সময় সে ঘর হ'তে তর্কাতর্কি শুনতে পেলাম, পরে শব্দ শুনে বোধ হ'ল মুষ্টিযুদ্ধ চলছে। তারপর একবার বাঁশী, একবার হারমোনি বাজছে। ৫টা পর্যন্ত এরকম চ'লতে লাগল। সন্ধ্যার পর তাড়িত-দীপে ঘর আলো হ'য়ে উঠল, শুনতে পেলাম দুতিন জন গল্প করছে। পরদিন সকাল বেলা, ৬টা হবে, সে ঘর হ'তে কে 'রাকাল' 'রাকাল' বলে' ডাকছে। নীচের তলা হ'তে কে উত্তর দিলে, "এই যাচ্ছি"; বুঝলাম রাকাল। আমি রাকাল নাম কখনও শুনি নি; নামটা রাখাল না আর কিছু, কে জানে। বোধ হয় চায়ের গরম জল দরকার।

দুতিন দিন এই রকম শুনতে শুনতে কৌতূহল হ'ল, কার বাড়ী, কে থাকে? মেছোবাজার হ'তে কলিকাতা মিন্সিপাল্টির গাও-খানা পাশে রেখে পথ আছে। নামটা গাও-খানা, কিন্তু তখন ঘোড়াখানা হয়েছে। রাস্তার ময়লা বইবার গাড়ী ও ঘোড়া থাকে। দেখি প্রাসাদ-ভিত্তি স্থূল, যেন যুগান্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। এদিক হ'তে কোন সন্ধান পেলাম না। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যেয়ে বুঝলাম, সেণ্ট পল্স্ কলেজের হোষ্টেল। সৌখিন যুবাটি কলেজের ছাত্র, কিন্তু পড়ে কখন? খ্রীষ্টান সমাজে বস্ত্র কিছু বেশী লাগে, কিন্তু বিনাপাঠে ডিগ্রি পাওয়া যায় না।

৩

ইস্কুলের ও কলেজের হিন্দু ছেলেদের হোষ্টেল আছে। ইস্কুলের হোষ্টেলে বাবুগিরি কিছু কম, কিন্তু কলেজের হোষ্টেলের যুবাদের অর্থব্যয় কম হয় না। প্রাসাদে হোষ্টেল, এতে দোষ নাই। কত কত ছাত্র, কত বৎসর বৎসর থাকবে। শিবকুমার-ভবনও প্রাসাদ। দরিদ্র বালকেরা আছে, কিন্তু টাকা নাই বলে' ব্রহ্মচারী, একথা ব'লতে পারি না। শিবকুমার-ভবন একটা মঠ, কেন যে 'ভবন' নাম হয়েছে, জানিনা। মঠ দেশী; আর ইস্কুল, কলেজ, হোষ্টেল বিদেশী। সেখানে বিলাতের হাওয়া বইতে থাকে। সে হাওয়ায় দেশের মানুষের মত থাকা কঠিন। ইংরেজী নামগুলা আমাদিকে বিদেশী করে' ফেলে। তথাপি নাস্তিকেরা নামের মাহাত্ম্য মানে না।

নাম-মাহাত্ম্যের একটা উদাহরণ দিই। জলে সাঁতার দেওয়া, খেলা করা বিলাতী আবিষ্কার নয়। দেশে নদী, পুকুর, দীঘি আছে, গ্রীষ্মও প্রচুর। পুরীতে জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রার সময় (বোধ হয়) একমাস নরেন্দ্র-সরোবরে হাজার হাজার লোক বিকাল বেলা জল-ক্রীড়া করে। ধুতি পরে' গামছা কাঁধে নরেন্দ্রের ঘাটে আসে, মাল-কোঁচা করে, কোমরে গামছা বাঁধে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেহবা ধুতি ছেড়ে গামছা পরে' লাফিয়ে পড়ে। গামছা সাত হাত লম্বা, বহরে খাট। দাঁড়া সাঁতার, চিৎসাঁতার, ভাসা সাঁতার, যে যেমন পারে, দেয়। আনাড়ীরা কলসী নেয়, কেহবা সোলার আটি দু-বগলে দিয়ে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে জলে দাঁড়িয়ে থাকে। দলে দলে গানও গাইতে থাকে। বেশির ভাগ, পাণ্ডা। এই জল-কেলি যে বহু পূর্বকাল হ'তে আছে, তার একটা প্রমাণ দিই। যারা সৌখিন, তারা কাঁধে মর্কটশিশু (লীলামৃগ), কিম্বা হাতে শুকপক্ষী (লীলাশুক) নিয়ে আসে। কলিকাতার গোলদীঘি নামে

পুকুরে বালক ও যুবকদের জলখেলা দেখেছি। শুনি, এরা সাঁতার দেয় না, swimming exercise করে। আর যদি swimming, তা হ'লে swimming costume চাই। এটা জাঙ্গিয়া-গেঞ্জি, গায়ে লেপটে থাকে। এটা সাদা হ'লে মগাভারত অশুদ্ধ হবে, নীল রঙের হওয়া চাই। বাজারে কিনতে হয়। চাণক্য পণ্ডিত থাকলে বলতেন, 'বাপু, যখন নৌকায় চড়বে, তখন সাঁতারের নীল পোষাকটি সঙ্গে রেখো, কি জানি নৌকাডুবি হ'তে পারে।'

রাঁচিতে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় আছে। আমি দেখি নি। বছর আষ্টেক আগে, জনকয়েক ছাত্র ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে' মেট্রিক পাস হ'তে বাঁকুড়ায় এসেছিল। এক ছাত্রের কলিকাতাবাসী পিতার অনুরোধে তাদের বাসায় গেছলাম। পুত্রের নাম, তারক গাঙ্গুলী। তারা এক ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে থাকত, দশ বার জন। দেখি, এক পাচক আছে, ভৃত্য নাই। ছাত্রেরাই চা'ল ডা'ল কিনে আনে। দুএক জন প্রত্যহ বাজার যায়, নিজেরাই আনাজপাতি বয়ে আনে। একদিন দেখি, তারকের কাঁধে একটা বড় ভারী বাক্স। সে নুয়ে নুয়ে চলেছে। তাকে দেখে আমার কষ্ট হ'ল। আমি বললাম, 'তারক, তুমি এত ভারী বাক্স বইতে পারবে কেন?' সে বললে, 'এত পথ আনতে পেরেছি, ঐ ত বাসা দেখা যাচ্ছে।' রাজপথের মাঝে, কতলোক আসছে যাচ্ছে, তার সঙ্কোচ হয় নি। তার পিতা দরিদ্রও নহেন, মুটে-খরচ অক্লেশে দিতে পারতেন। দিলে কিন্তু ছেলেকে ব্রহ্মচারী করতে পারতেন না। যে গেরুয়া ধুতি পরেছে, গেরুয়া উত্তরীয় নিয়েছে, (গেরুয়া 'পাঞ্জাবী' কিন্তু অবিধি), যার পায়ে এই কাঁকরো পাথরো পথে জুতা নাই, সে মুটের মাথায় বাক্সটি দিয়ে ফুলবাবু সেজে পেছু পেছু যেতে পারে কি? বিষয়-ভোগ ও ব্রহ্মচর্য পরস্পর বিরোধী।

৪

কলিকাতায় হাজার হাজার ছাত্র কলেজে পড়ে। যাদের নিবাস কলিকাতা, তারা কলিকাতায় থাকবে, পড়বে। কিন্তু যাদের নিবাস কলিকাতায় নয়, তারা কলিকাতার কোন্ গুণের জন্যে, কোন্ সুখের আশায় সেখানে পড়তে আসে? কলিকাতায় বাসের সুখ নাই। কেমন করেই বা থাকবে? একটা জেলার লোক জড় হয়েছে। এই চলিত্ ইংরেজী (১৯৩৪) সালের শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তিন ঋতু কলিকাতায় কাটিয়েছি। কাজকর্ম ছিল না, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় অব্যাহত ছিল। শীতকালে দেখি, সকাল-বেলা ৮টা ৯টা পর্যন্ত কুআসা। এই কুআসা ভালও নয়, ইন্‌ফ্লুঞ্জা বয়ে আনে। এবার সকাল বেলা নাকে কালি পাই নি, কিন্তু ঘরের মেঝেয় কালি, শাদা বিছানায় কালি। দু-বেলা রাস্তা ধোআ হচ্ছে, মোটর দৌড়ানার ধূলাও প্রায় নাই, কিন্তু ঘরে এত ধূলা হয় কেন? দু-দিন নিকানা না হ'লে কোণে কোণে কাপড়ের আঁশ জমা হয়। কলিকাতায় বেকৃটিরিয়া-বিৎ আছেন। তাঁরা ধূলা নিরীক্ষণ করেছেন কিনা, জানি না।

প্রকৃতিকে জব্দ করাই সভ্যতা। কলিকাতা সভ্য, পঞ্চইন্দ্রিয়কে কর্মচ্যুত করেছে। গ্রীষ্মকালেও দেখেছি সকলেরই গায়ে জামা। বড় বড় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি, হাজার হাজার লোক চলেছে, কেবল সেখানে সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু রবি-কর দেহ স্পর্শ করতে পারে না। বর্ষাকালের দুপর বেলার পচা গরমে ঘামের স্রোত বইছে, দেহেই শুখাচ্ছে! কেবল অসভ্য মুদী ও ময়রা, মুটে ও রিক্‌শ-টানক অদ্বিড় গায়ে আছে। কদাচিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বোধ হয় গেঁয়ো, উড়ানী-খানা আধ-কাঁধে ফেলে চলেছেন। এই সব অসভ্যদের শরদী-গরমী হয় না, এরা ১০৫ ডিগ্রি গরম টের পায় না।

কলিকাতায় বাড়ী আর গাড়ী। বাড়ী নয়, এক এক অট্টালিকা, এক এক প্রাসাদ। গাড়ী অল্প, খুঁজতে হয়। মোটর-রথ শূকরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সোজা দৌড়েছে, তুমি পাশে, মর আর বাঁচ, দেখতে পায় না। রথ এমন কদাকার হ'তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। কিন্তু এত ধন বোম্বাই শহরেও আছে কি না, জানি না।

একটা জেলার লোক কলিকাতায়, কিন্তু আধ কাঠা শাগের ক্ষেতও নাই। বাসি আনাজ, বাসি মাছ, জ্বাল-দেওয়া বাসি দুধ অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়, বেল পাতা আছে, দেশ-বিদেশ হ'তে আসছে। প্রফুল্ল এক 'শিরোমণি' হোটেলে থাকে, দু-বেলা খেতে পায়, মাসে তের টাকা দেয়। তার নিবাস রাঢ় দেশে, যেদেশে খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ আছে। সে কলিকাতা শহরে নূতন চাকরি করতে এসেছে। সে ভাতের সঙ্গে এক খামচা নূন না মাখলে ভাত খেতে পাবে না, ভাতের স্বাদ নাই। চা'র পাঁচটা ব্যঞ্জন পায়, ঝালের আস্বাদ পায়, আনাজের ও মাছের আস্বাদ পায় না। তার আরও বিপদ, ১টা বাজতে না বাজতে ক্ষিদেয় চোখে দেখতে পায় না। ময়রাদের পোয়া বার, এক এক জন দশ বার বছরের মধ্যে দু'একখানা বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে। একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লুচিভাজা দেখছিলাম। কলিকাতার ময়রার লুচি হাওয়ায় উড়ে যায়, আর গাছের ডালে লাগলে চিটিয়ে য য। এর লুচি মোটা ও ছোট। 'হেঁ হে মোদক, মোটা লুচি ক'রছ, ভেসে উঠতেই তুলছ যে।' সে একটু হাসল, দেখলে দাড়ি পাকিয়েছি বটে কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি। 'এ লুচি নয়, পুরী।' 'এতক্ষণ কাছে আছি, ঘিয়ের লুচি-ভাজা গন্ধ পাচ্ছি না ?' সে আবার হাসল, গেঁয়ো মানুষকে কত বুঝাবে। বৌ-বাজারে এক ময়রার দোকানে একথালা কাল কাল এক নূতন মিষ্টান্ন দেখলাম। 'ও হে, ঐ কালগুলার নাম কি ?' 'গোলাপজাম।' 'কিসের, কেন এত কাল করেছ ?' 'গোলাপজাম,

লাল-কাল করতেই হবে।' ময়রাটির মনেও রস ছিল। 'আজ্ঞে, শুনবেন, এটি আমার আবিষ্কার নয়। অমুকের দোকানে দেখলাম, খুব বিক্রি হচ্ছে, নূতন কি-না। সে ছোট ছোট পানতুয়া করছিল, কি এক কাজে তাড়াতাড়ি উঠে গেছল। ফিরে এসে দেখে, রস চুঁয়ে গেছে। পাঁচ-ছ সের জিনিস ফেলে দিতে পারে কি ? গোলাপজাম নাম দিলে, আর হু হু করে' বিক্রি হয়ে গেল। কত ছেনা আছে, ভাবতেও হ'ল না।'

কলিকাতায় বাসাভাড়া বেশী, হোটেলে ঠাক্রি-ভাড়াও বেশী। স্কটস্ লেনে আমাকে এক যুবকের সন্ধান করতে হয়েছিল। সে এক মেস-বাড়ীতে অর্থাৎ একান্নভোজীর বাসায় থাকত। বা'র হ'তে বাড়ীটা প্রাসাদ। চাকরেয়র সঙ্গে কলেজের জনকয়েক ছাত্রও থাকত। যার সন্ধানে গেছলাম, সে চাকরো, পঞ্চাশ টাকা বেতন পায়। বাড়ী ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাস্‌লাম, 'এখানে অবনী থাকে কি ?' তিনি নাম শুনে হাঁ করে' রইলেন, 'অবনী ? এখানে থাকে ?' আর একজনকে জিজ্ঞাস্‌তে তিনি বললেন, 'কি জানি, আপনি উপরে যেয়ে দেখুন।' আমি বললাম, 'উপরে যেয়ে কোন্ ঘরে খুজব ? এই ভর সন্ধ্যায় সিঁড়ি বাইতে যেয়ে পা খসে পড়তে পারে। আপনি একটু কষ্ট করে' জেনে আসুন।' বয়সের ও শাদাচুলের মান আছে। 'আপনি এই ঘরে বসুন, দেখে আসছি।' ঘরে ঢুকে দেখি তিনখানা ছোট ছোট তক্তপোষ পড়েছে। ৯×১১ ফুট ঘর, উঁচুও ১০ ফুট। তক্তপোষে বসে' কোথায় যে পা নামিয়ে রাখি, জায়গা পাই না। ঘরের তিনজন সজ্জন, বোধ হ'ল, চাকরো, কিন্তু কি কষ্টে আছেন, সে বোধ হারিয়েছেন। অবনীকে পেলাম। কিন্তু আমার আশ্চর্য ঠেকল সে সে-বাসায়, বৎসরাবধি আছে কিন্তু বাসার সকলে তাকে চেনে না ; সে নামের কেউ আছে কিনা জানে না। ছাত্রেরা কলিকাতায় এই দুর্গতিভোগ কেন করবে ?

কলিকাতায় নির্মল বায়ু নাই, গড়ের মাঠেও নাই। যদি থাকে বহু দক্ষিণে, গঙ্গার ধারে। সংস্কৃত কলেজের সামনের রাস্তায় তত গাড়ী চলাচল হয় না, কিন্তু এক 'রেস্তরাঁ'য় পলাণ্ডু রসুনের গন্ধে নাক জ্বলে' উঠে। সব গলিতে ঢুকবার জো নাই, রোদ নাই, যত রাজ্যের পচা গন্ধ আছে। সরু গলির কূপ-গৃহের গন্ধ তেতলায় হাওয়াখানায় নিশ্চয় বইছে। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক্ নামে একটা চারি পাঁচ বিঘা খোলা জায়গা আছে, হাজার ছেলেমেয়ে বিকাল বেলা একটু হাঁফ ছাড়তে আসে, কিন্তু পাশের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ফুটপাথে দুটা বড় বড় আঁস্তাকুড় আছে, কত পচা মাছের, কত রকম মলের গন্ধে সে পথ ভব্‌ভর্‌ করতে থাকে। একদিন নয়, দুদিন নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সে পথ দিয়ে শতশত লোক যাচ্ছে আসছে, প্রায় সবাই নাক খুলে রেখে যেতে আসতে পারছে। গন্ধ-বহ অ-দৃশ্য; যদি দৃশ্য হ'ত দেখতাম সে বাতাস ছেলেমেয়েদের নাকে ঢুকছে, তাদের open air excursion দরকার হচ্ছে। যাঁরা কলিকাতায় থাকেন, তাঁরা গন্ধ টের পান না। কিন্তু যখনই আমি কলিকাতা গেছি, তখনই হাওড়া ষ্টেশনে এক রকম ভসকা গন্ধ পেয়েছি। পরে আর সে গন্ধ পাই না। কলিকাতা-বাসী যে নাকে খাট, তার এক অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি! তিল তেল পেলে গ্রীষ্মকালে গায়ে ও মাথায় মাখি। সুবাসিত হ'লে উত্তম। যেটা পরে আসে সেটা আগের চেয়ে ভাল হয়ে থাকে। এই সামান্য বিধি স্মরণ করে' একটা হালি তেল কিনে আনলাম। এক শিশির দাম ৵৹ আনা। শিশির চেপটা আকার দেখে সন্দেহ হ'ল, শিশিটা টেবিলে সাজিয়ে রাখবার, না শিশির তেল মাখবার। বিজ্ঞাপনের বাহার দেখে, সে সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছিল, মাথায় মাখতে সাহস হ'ল না। একটি ফোঁটা মাথার এক পাশে মাখলাম, আর তার উৎকট গন্ধে মাথা ধরে' গেল। তৈলকারের নাক নিশ্চয় ভোঁতা হয়ে গেছে,

মৃদু মধুর গন্ধ টের পায় না। তেলটায় সত্য সত্য তেল আছে, না কেরাসিন আছে, দেখা হয় নাই।

কলিকাতাবাসীর কানকেও ধন্য। রাত্রি-দিবা 'লরি'র ঘড়্ঘড়ানি, মোটরের পোঁ-ভোঁ শৃঙ্গধ্বনি, বিশেষ করে পৈশাচিক কিড়্কিনানিতে কর্ণ-পটহচর্ম ছিঁড়ে যায় না! তার সঙ্গে 'রিক্শ'র একতালা ঠংঠং সইতে হবে! দুই এক দিন পরে দেখি আমিও শুনতে পাচ্ছি না! শুনতে পাই আর না পাই, কর্ণ-পটহচর্ম ও কর্ণাস্থি নিশ্চয় বেগে নড়তে থাকে। শুনি, অমুকের nervous break-down হয়েছে। বাত-নাড়ী কোমল পদার্থ। নড়তে নড়তে মাথার খুলি ভাঙ্গে না, এই আশ্চর্য।

চোখেরই বা দোষ কি। যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেদিকেই সামনে শাদা দেওয়াল। শিশুকাল হ'তে কাছের জিনিস দেখতে দেখতে, বইর ছোট ছোট অক্ষর দেখতে দেখতে চোখও হ্রস্ব-দৃষ্টি হয়ে পড়ে। ডাক্তার অভয় দিচ্ছেন, চশমা পরাচ্ছেন। অল্প বয়স, চোখে চশমা; এটা যে বিসদৃশ হচ্ছে, সে ভাবনা তাঁর নাই, আমাদেরও নাই। দিনের বেলা, দুপুর বেলা, বাঙ্গালা দেশে, এই কলিকাতায় যেখানে সূর্য বছরে দুবার মাথার উপরে আসে, দীপ জ্বেলে পঠন-পাঠন চলেছে, কিছুই বিসদৃশ ঠেকছে না। দীপও যেমন তেমন নয়। 'এটা কত?' 'পঞ্চাশ বাতি'। 'ওটা কত?' 'দু-শ বাতি!' 'এত প্রখর দীপ কেন বসানা হয়েছে?' 'নইলে দেখতে পাওয়া যায় না।' আমরা রেড়ীর তেলে সলিতা জ্বেলে পড়তে পারি। সেটা কলিকাতাবাসীর অসম্ভব। 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' বার-মাসিকের চিত্র দেখে অনেক দিন হ'তে জানতে ইচ্ছা হয়েছে, নববঙ্গীয় চিত্রকরদের নিবাস কোথায়। মনে হয়, তাঁরা কলিকাতাবাসী। তাঁরা দিনের আলোতে ঝাপসা দেখেন। আগে আগে দেখতাম, মানুষের,—দৈত্যের নয়, দৈত্যানীর নয়—মানুষের

হাতের পায়ের আঙ্গুলের শেষ নাই। এখন বছর দুই হ'তে দেখছি, দেব দেবীই হউন, মানুষ মানুষীই হ'ক, সব আঁধারে বসে' দাঁড়িয়ে আছে। এক এক চিত্রে এত অন্ধকার যে দ্রষ্টা বিড়ালাক্ষ না হ'লে কোথায় কি আছে, দেখতে পাবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-ছাত্রদের শরীর দেখতে এক কমিটি নিযুক্ত করেছেন। কমিটি দেখেছেন, কলেজের ছাত্রদের শতকে ৩৩ জনের চোখ খারাপ। সোজা কথায়, ৩৩ জন অন্ধ হ'তে বসেছে, পঞ্চাশ বছর আগে দুই এক জন দেখা যেত।

কলিকাতা-বাসের কষ্ট হাজার হ'ক, লোক বাড়ছে, বাড়বে। সেখানে টাকা ছড়ানা আছে, কত দেশের কত লোক বুদ্ধিবলে দু-হাতে কুড়াচ্ছে, কেহ আইন বাঁচিয়ে কেহবা আইনের চোখে ধূলা দিয়ে লুঠছে। কত ভদ্র অতিভদ্র, শিক্ষিত অতিশিক্ষিত লোক দ্বি-রূপ। তাঁদের এক রূপ বাইরে, আর এক রূপ ভিতরে। বাইরের রূপ দেখে মূর্খেরা ঠকে, আর ফেল্-ফেল্ চেয়ে থাকে।

টাকা উড়াবার এমন জায়গা আর কোথাও নাই। কলিকাতায় অলিতে গলিতে কত সিনেমা, কত থিয়েটর ও 'কার্ণিভাল' ছবি দেখিয়ে গান শুনিয়ে বাজনা বাজিয়ে পথিককে মুগ্ধ করছে। কলেজ-ছাত্রেরা যুবা, তারাও মানুষ , তারা কি লুব্ধ হয় না ?

যারা টাকা রোজগার করতে চায়, তারা কলিকাতায় আসে। আর, যারা টাকা উড়াতে চায়, তারা আসে। কলেজের ছাত্র বিদ্যার্থী, এই দু দলের বাইরে। সে কেন আসে ?

৮

বেঙ্গল গবর্মেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তি হ'তে জানছি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে ৫১টা কলেজ আছে, বিশ হাজার ছাত্র পড়ছে। ৫১টা কলেজের মধ্যে ৬টা কন্যা-কলেজ। বাকি ৪৫টার মধ্যে ১২টা কলিকাতায়, ৩৩টা অন্য স্থানে। ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে কলিকাতায় ১২,০০০, বাইরে ৩৩টা কলেজে ছাত্র ৮,০০০। এই গন্তিতে ঢাকা কলেজ নাই। থাকলেই বা কি হ'ত? ১,৩০২ বাড়ত। কলিকাতার ১২টা কলেজে ১২,০০০ ছাত্র সমান চারিয়ে নাই। প্রতি কলেজে ১,০০০ ছাত্র হ'লেও কর্তাদিকে হিমসিম খেতে হ'ত। হাজার যুবার তত্ত্ব রাখা কি সোজা কথা? কিন্তু শুনি, কোন কলেজে ৩,০০০, কোন কলেজে ২,০০০ ছাত্র! কলেজে চারি বর্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সমধিক। একই বর্ষের পাঠ নিশ্চয় তিন চারি ঘরে হ'তে থাকে। বোধ হয় সকলের ভাগ্যে সমান ভোজ্য পড়ে না। পাঠ্য বিষয়ের যত রকম সংযোগ বিয়োগ হ'তে পারে, সবই আছে। সকালে, দুপুরে, বিকালে কলেজের ঘর কখনও খালি হয় না, ঘরের ভিতরের গ্যাস বেরিয়ে যেতে সময় পায় কিনা, কে জানে। এই সব মহা-মহা-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা অবশ্য হচ্ছে, কিন্তু এসব শান্তিনিকেতন হ'তে পারে না।

দেখেছি কলিকাতানিবাসী ছাত্রও ছোট কলেজে যায়। কমল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র! তাকে জিজ্ঞাসলাম, 'কমল, তুমি বড় কলেজে না ঢুকে সেণ্টপলস্ কলেজে ঢুকলে কেন? সে কলেজের নাম তেমন শুনি না।' কমলের পিতা কলিকাতানিবাসী ধনবান্, বিদ্বান্, বিচক্ষণ, ভূয়োদর্শী। তিনি ছেলেকে বেছে বেছে ছোট কলেজে দিয়েছেন। এই কলেজের হাওয়া নাকি ভাল। ফটক হ'তেও দেখেছি, জায়গা

অনেক, তৃণ আছে। আর বোধ হয় দুপুর বেলা তাড়িত-দীপ জ্বেলে পড়তে হয় না। কমলকে দেখেও মনে হয়েছে, সে দেশী হাওয়ায় আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক সমাগমে, ভাইস্-চেন্সলার স্যর হুসেন সুরওয়ার্দি বলেছিলেন, কলিকাতার বাইরের কলেজে গুণী শিক্ষক নাই, কলিকাতার কলেজে আছেন, ছাত্রও জুটে। যদি গুণবান্ শিক্ষক নাই থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেখেন না? গুণহীন শিক্ষককে ইঙ্গিতে সরাতে পারেন।

পাশ গণে' কলেজের গুণের পরীক্ষা। বিজ্ঞাপনে দেখি, অমুক কলেজে দু-শ ছাত্র আই-এ পাশ হয়েছে, অমুক কলেজে বি-এ পাশ বেশী হয়েছে। এর দ্বারা কলেজের গুণ বুঝতে পারা যায় না। বলা উচিত,

২য় বর্ষে ছাত্র ছিল	...	এত
পরীক্ষা দিতে পেয়েছিল	...	এত
পাশ হয়েছে	...	এত

এই তিনটি সংখ্যা না পেলে কলেজের গুণ বুঝতে পারা যায় না। যদি দেখি, মনে করুন, ২য় বর্ষে ছাত্র ছিল ছ-শ, তাদের মধ্যে পাঁচ-শ পরীক্ষা দিতে পেরেছিল, আর দু-শ পাশ হয়েছে, তাহ'লে, সে কলেজের কোন্ গুণ আছে? ৬০০ মধ্যে ২০০ পাশ হয়েছে!

কলেজের গুণ পরীক্ষা আর এক রকমে করা হয়। দেখ, ২০০ মধ্যে কতজন প্রথম বিভাগে পাশ হয়েছে। পরীক্ষাটি কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। ছাত্রের ধার না থাকলে প্রথম বিভাগে পাশ হ'তে পারে না। যে কারণেই হউক, যদি কোন কলেজে ধারাল ছাত্র বেশী জুটে, তা' হ'লে প্রথম বিভাগে পাশও বেশী হবে। কলেজের গুণপণায় দু-চা'র জন প্রথম বিভাগে উতরে যেতে পারে, কিন্তু ছাত্রের ঈশ্বরদত্ত ধারই আসল কারণ।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ ছাত্র ঢুকতে পায়, আর দুই বিভাগে পাশ ছাত্র পায় না। ব্যবস্থাটি ভাল। অধম পাত্রে উত্তম দান কর্তব্য নয়। দেশে মতিমান্, বিদ্যাবান্ চাই। 'বাছা বাছা প্রোফেসর, বাছা বাছা ছাত্র। ছাত্রকে বেতনও কম দিতে হয় না। তথাপি কলেজের খরচ কুলায় না, রাম শ্যাম যদু হরি বছরে দেড় লক্ষ টাকা যোগাচ্ছে। এই কারণে তারা জানতে চায়, ২য় ও ৪র্থ বর্ষের কত ছাত্রের মধ্যে কতজন পাশ হয়, ১ম বিভাগে কত হয়। কলিকাতার আর এক কলেজে বাছুট ছেলে ভর্তি হ'তে পায়, রাশিকে অন্য কলেজে ঢুকতে হয়। বাছুট কলেজের সঙ্গে রাশি কলেজের তুলনা করা অন্যায়।

কলেজে ধাবান ছাত্র আনবার উপায় করতে হয়েছে। পূর্বকালে যাত্রাদলের ছোকরা ভাঙ্গানা হ'ত। কোন অধিকারী তিন চারি বছর লেগে থেকে ছোকরা তালিম করলে, অন্য একদলের লোক এসে দু টাকা বেশী দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল। এখন বোধ হয় চুক্তি লেখাপড়া চলছে। কলেজে কিন্তু ছোকরা ভাঙ্গানা মন্দ চলছে না। বছর দুই হ'ল বাঁকুড়ার এক ইস্কুল হ'তে এক ছাত্র প্রথম বিভাগে, ২০ টাকা বৃত্তি পেয়ে মেট্রিক পাশ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণনায় ছাত্রটি মেট্রিক-গগনের এক তারকা। আমি তাকে কেপ্‌টেন বলতাম। যখন সে ইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত, তখন আমার বেড়াবার মাঠে তার দল ফুটবল খেলত, সে কেপ্‌টেনি করত। এখানে কলেজ আছে, সে এখানে পড়বে। কেপ্‌টেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। শুনলাম, কলিকাতার এক কলেজ হ'তে ভাঙ্গানে চিঠি এসেছে। 'তুমি এখানে আসবে, থাকতে খেতে খরচ লাগবে না, কলেজের বেতন লাগবে না, আর, জলপানি ১৫৲ টাকা পাবে।' কেপ্‌টেন লোভে পড়ল। আর পিতা এখানে থাকেন, ইস্কুলে মাষ্টারি করেন, টাকার টানাটানি নাই, তথাপি টোপ গিললেন। ছেলে কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে মাসে মাসে ৩০৲ টাকা রোজগার করবে,

লোভটা কম নয়। ফলে হ'ল এই, এই কলেজ এক ধারাল ছাত্র পেতে পেতে পেলে না।

পুত্র মেট্রিক পাশ হয়েছে, পিতা গ্রামে থাকেন। তিনি ঠিক করে' রেখেছেন, কলিকাতায় না পড়লে ছেলে মানুষ হবে না, চোখ ফুটবে না। এ কলেজের, সে কলেজের শিক্ষকদের নামও দু একটা শুনে রেখেছেন। পুত্রের মাকে বুঝালেন, ওঁদের কাছে পড়ে' সুখ, পাশ হয়েও সুখ। তিনি ভাবলেন না, কলেজের পঞ্চাশ শিক্ষকের মধ্যে নামজাদা শিক্ষক দুই-এক জন। পুত্রের ভাগ্যে তাঁদের দর্শন-লাভ ঘটবে কিনা সন্দেহ। আর এক ছাত্র এক কলেজে ভর্তি হ'ল, দু-চা'র দিন পরে পিতাকে বললে, এ কলেজে পড়া ভাল হয় না, এখানে পড়লে পাশ হ'তে পারবে না। সে জানে না, ইস্কুল হ'তে কলেজে উঠবার ধাপ উঁচু, এক মাসের কম উঠতে পারা যায় না। পিতা কি করেন, তাঁকে পাশ হ'তে হবে না, ছেলেকে হবে, ছেলেকে কলিকাতা পাঠালেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এক বছর পরে সে ছেলে যখন বাড়ী আসবে, তাকে চিনতে পারা যাবে না। ইস্কুলে পড়বার সময় তার টেরি থাকত না, এখন টেরি দেখা যাবে, হয়ত আরও উন্নত সভ্যতা মাথায় প্রকাশ পাবে, মাথার সামনের চুল পেছু দিকে ঘুরানা থাকবে। এখানে ৪২ ইঞ্চি বহরের কাপড়ে চলত, এখন ৪৬ ইঞ্চি কাপড় হয়েছে, কোঁচার ফুল জামার বাঁ পকেটে রয়েছে। এখানে মুড়ি খেত, মুড়ির সঙ্গে কাঁচা গুড় পেলে খুশী হ'ত। এখন মুড়ি রোজ খাওয়া যায় না, কচুরী নিমকি আর অপক্ক স্পঞ্জ রসগোল্লা চাই। কলিকাতায় মাসে মাসে ৪০৲ টাকা খরচ করবে। বি-এ পাশ হয়ে চল্লিশের সিকি, দশ টাকাও আনতে পারবে না, গাঁয়ের লোক বলবে, ষাঁড়ের গোবর। তা বলুক। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ-বিদ্যালয় দেখতে চাই না। তার দোষ কি? যৌবন ভোগের দিকে টানে, কলিকাতার হাওয়া ভোগের উপকরণ পথে পথে বয়ে বেড়াচ্ছে। এই

প্রথম বর্ষের ছাত্র চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রকে সঙ্গী পেয়েছে। পথে যেতে যেতে দেখলে 'কেবিন'। 'ওহে চল, একটু চা খেয়ে আসি।' বালকটি বাড়ীতে চা খেত, কিন্তু 'কেবিনে'র পেয়ালায় মুখ দিতে তার গা ঘিন-ঘিন করতে লাগল। কিন্তু 'না' বলতে পারলে না, অসভ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাকে গেঁয়ো ভূত বলবে। তা ছাড়া চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বিদ্যাজ্যেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে সমীহ করা স্বাভাবিক। মন বলিষ্ঠ হ'লে 'না' বলতে পারত, বলতে পারত 'না, আমি কেবিনের চা খাব না।' কিন্তু মন আপনই বলিষ্ঠ হয় না। শরীরের ব্যায়াম দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ হয়, মনের ব্যায়াম দ্বারা মন বলিষ্ঠ হয়।

৬

আমরা চাই ছাত্রেরা স্বস্থ, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী হয়। এই তিন গুণ পেতে হ'লে কলেজকে ছোট হ'তে হবে। নিয়ম করতে হবে, কোন কলেজে পাঁচ শতের বেশী ছাত্র থাকবে না। ৬৲ টাকার অধিক বেতন হবে না। পাঁচ শত ছাত্র পাঁচটা হোষ্টেলে থাকবে। আমি হিন্দু ছাত্র ও হিন্দু হোষ্টেল চিন্তা করছি। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ ব্যায়াম করতে হবে। মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল আছে। হিন্দুর ধর্ম ও কর্ম এক। ছাত্রদের পক্ষে কর্মযোগ এক মাত্র পথ। ইস্কুলে অভ্যাস আরম্ভ হবে, কলেজে সে অভ্যাস চলতে থাকবে। লোক চিনে হোষ্টেলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে হবে। তিনি কলেজে আধা শিক্ষক, হোষ্টেলে ছাত্রের পিতা ভ্রাতা ও সুহৃদ হবেন। এঁরই কাজ সকলের চেয়ে কঠিন। বাহ্য অনুষ্ঠান ভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান অসম্ভব। হোষ্টেল নাম তুলে দিয়ে মঠ বলব। মঠবাসীকে যম ও নিয়ম পালন করতেই হবে। কখন্ শয্যা ত্যাগ করবে, কখন্ স্নান ও আহার করবে,

কথন্ ঈশ্বরের স্তোত্র আবৃত্তি করবে, কথন্ পড়বে, কথন্ ব্যায়াম করবে, কথন্ শয়ন করবে, এ সব বিষয়ে ছাত্রের স্বাধীনতা থাকবে না। মঠে যে কাপড় ইচ্ছা পরবে, কিন্তু মঠের বাইরে গৈরিক পরতে হবে। বেড়াতে যেতে চায়, স্বচ্ছন্দে যাবে, যেখানে ইচ্ছা যাবে, কিন্তু গৈরিক পরে' যেতে হবে। গৈরিক ধুতি ও পাঞ্জাবী দেখলেই বুঝব, কে। সন্ন্যাসী করবার মতলবে গৈরিক নয়। ধুতি ও পাঞ্জাবী কোন এক রঙ্গের চাই। গৈরিক সুসাধ্য। অধ্যক্ষ যথা-যোগ্য ব্যবস্থা করবেন। উপরে কেবল নীতির আভাস দিলাম।

আমি ব্যায়ামের পক্ষে, ক্রিকেট ফুটবলের পক্ষে নই। ব্যায়াম দ্বারা দেহ বলিষ্ঠ ও সুডৌল হয়। ব্যায়াম করতে মাঠ খুজতে হয় না, খরচও হয় না। প্রত্যহ করতে পারা যায়, কলেজ হ'তে ছাড়পত্র পেয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে কবতে পারা যায়। দল বেঁধে বিলাতী খেলার দোষ অনেক। প্রথম দোষ, এ সব খেলা এক এক ব্যসন। ব্যায়ামের মাত্রা ঠিক রাখতে পারা যায়, ব্যসনের মাত্রা ঠিক থাকে না, শরীর মন অবসন্ন হয, খেলার পর পড়া অসম্ভব হয়। দ্বিতীয় দোষ, কু-সংসর্গ জুটিযে দেয়। একথা ঠিক, যারা খেলায পাকা হয়, তারা প্রায়ই বিদ্যায় কাঁচা। অথবা বিদ্যায় কাঁচা বলেই খেলায মাতে। ফুটবল কত জনই বা খেলে? বাকিরা কি করে? খেলায় জিতলে সুরা-পানের 'কাপ' পুরস্কার লাভ হয়। মঠে সুরাপান-টুবাপান চলতে পারে না।

যে ছেলে ফুটবল খেলার দিকে ঝুঁকেছে, তাকে বাগিয়ে রাখা কঠিন। সলিলকুমার কলিকাতায় জ্যেঠার কাছে থাকে, বৌবাজারের এক ইস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। পিতা ডেপুটি, কলিকাতার বাহিরে থাকেন। আমি তাকে ছেলেবেলা হ'তে জানি। অনেক দিন পরে দেখছি, দেখে দুঃখ হ'ল। 'সলিল, তোমাকে রোগা দেখছি কেন?'

'কই, আমি কিছু বুঝতে পারি না।' 'বল ত তুমি দিনের মধ্যে কখন কি কর।' শুনলাম, সে ৪টার সময় ইস্কুল হ'তে বাড়ী এসে কিছু খেয়েই গড়ের মাঠে ফুটবল খেলতে ছুটে। বাড়ী হ'তে গড়ের মাঠ ২ মাইলের কম হবে না। জ্যেঠামশায়ের কড়া হুকুম, ৭টার মধ্যে ফিরতে হবে। সেও ৭টার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী ফিরে, বই নিয়ে বসে, আর ঘড়ীতে ৯টা দেখতে থাকে। তারপর খেয়ে পরদিন সকালবেলা ৭টার সময় উঠে। বাড়ীতে মাষ্টার আসেন, এক মাষ্টার ন'ন, পরে পরে দু মাষ্টার। ৯টা বাজে, সলিলও নেয়ে খেয়ে ইস্কুলে দৌড়ে। সে নিজেই স্বীকার করলে, খেলা বেশী হয়, over exercise হয়। কিন্তু সে জানে না, তার ৪টার সময়ের খাবার কম হয়, তাকে এক বাটি চা খেয়ে ক্ষিদে মারতে হয়। সে ইস্কুলের পড়া পারে না, বাড়ীতে পড়বার যে গতিক, পারবার কথাও নয়। তার পিতা কিন্তু বুঝে রেখেছেন, ছেলেটার বুদ্ধি মোটা। সত্য সত্য মোটা কিনা জানি না। কিন্তু জানি, কারও না কারও অবহেলায় অনেক সলিল সুনীল অনিল প্রনীলের বুদ্ধি মোটা হয়েছে।

শিক্ষার যে ব্যবস্থাই করি, এই খানে আটকে যায়। পিতামাতা স্বভাবতঃ চান, পুত্র কাছে থাকে। মাতার স্নেহ প্রবল, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা হা'র মানে। তিনি পুত্রকে চোখে চোখে রাখতে চান। কিন্তু পারেন কি? পিতা নিষ্কর্মা বসে' থাকেন না, নিজের ও সংসারের ধান্দায় ঘুরেন। পিতা পারেন না, খুড়ো জ্যেঠা মামা মেসো পিসের কথাই নাই। কেহই পুত্র ও আশ্রিতের হিতের প্রতি উদাসীন ন'ন, কিন্তু এ কথা সত্য, অনেকে ছেলে মানুষ করতে জানেন না, পারেন না। এক এক বাড়ী আছে, সেখানে দিনের কাজ কলের মতন চলে, ছেলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় না। এমন বাড়ী অতি অল্প।

একটা অনেক দিনের কথা মনে পড়ল। এক কলেজে প্রথম বর্ষের

ছাত্র ভর্তি হচ্ছিল। অধ্যক্ষ দেখলেন, একজন বুদ্ধিমান্ কিন্তু রোগা, মেলেরিয়ায় ভুগে এসেছে, মুখ এখনও ফেকাসে, চোখ হলদে। সে কলেজের হোষ্টেলে থাকল। অধ্যক্ষের ভার দ্বিগুণ হ'ল। মাস খানেক গেছে, ছেলেটি একটু সেরে আসছিল, এক দিন অধ্যক্ষ ছাত্রের পিতার এক পত্র পেলেন, পুত্রকে বার দিন ছুটি দিতে হবে। কেন ছুটি, কিছু লেখা নাই। কেরানী শুনেছিলেন, ছেলেটির বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা বরপণ ধার্য হয়েছে। পিতা শিক্ষিত, ডেপুটি। বরপণের জন্যে নয়, পুত্রের হিতের জন্যে অধ্যক্ষ ছুটি দিলেন না। পিতা অবাক্; রেলে ঘণ্টাখানেক দূরে থাকতেন, অধ্যক্ষের কাছে এলেন।

পিতা। আমি পিতা, ছুটি চেয়েছি, আপনি দিবেন না ?

অধ্যক্ষ। ছুটির প্রয়োজন কি ?

পিতা। প্রয়োজন বাড়ীর।

অধ্যক্ষ। আমি শুনেছি, প্রয়োজনটা কি। আমি পুত্রের হিতের তরে বলছি, সে প্রয়োজন দুই এক বছর থাক। বয়স ত মাত্র ষোল সতর।

পিতা। আপনি কি পিতার চেয়েও তার হিত চিন্তা করছেন ?

অধ্যক্ষ। নিশ্চয়। আপনি পিতা, আপনার বাৎসল্য স্বাভাবিক, আপনার সংসারচিন্তাও স্বাভাবিক। আমার বাৎসল্য গৌণ, আমি আপনার সংসার হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে বালকের হিত ভাবছি।

পিতা। আপনি এ অধিকার কোথায় পেলেন ?

অধ্যক্ষ। আপনই দিয়েছেন। যখনই আপনার পুত্রকে এই কলেজে দিয়েছেন, হোষ্টেলে রেখেছেন, তখনই আপনি আমাকে তার পিতৃস্থানীয় করেছেন। ইচ্ছা করলে, সে অধিকার তুলে নিতে পারেন।

পিতা তাই করলেন, পুত্রের নাম কাটিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন।

যে নগরে কলেজ সে নগরে পিতামাতার কাছে পুত্র না থেকে মঠে

যেয়ে থাকবে ? প্রথম প্রথম আশ্চর্য ঠেকবে। কিন্তু এইটি সুব্যবস্থা। মঠের অদৃশ্য শাসনে পুত্রের বি-ন-য় শিক্ষা হবে। এই শিক্ষা মহামূল্য। বিনয় হিন্দুধর্মের মূল। সলিলকুমার পাঠে মন লাগাতে পারে না, যম-নিয়মের মঠে দু-মাস থাকলে দেখত তার মন অনেকটা বশ মেনেছে। তার সহপাঠীরা ভোরে উঠেছে, কেউ কিছু না বললেও সে ভোরে উঠত। সে অবশ্য প্রথম প্রথম শনিবারে শনিবারে বাড়ী যেতে চাইত। কিন্তু মাস দুই পরে চাইত না। মঠে এত সঙ্গী, সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেও পেত না। দেশ নিঃসন্দেহে পিতাকে বলতে পারেন, 'পুত্র তোমার একার নয়। তোমার ভাগ্য ভাল, আমি তোমার পুত্রকে মানুষ করবার ভার নিয়েছি।' পিতার এক আপত্তি থাকবে, তাঁকে মঠে থাকবার খরচ দিতে হবে। দেখতে গেলে তাঁকে অর্ধেক দিতে হবে, নিজের কাছে রাখলে অপর অর্ধেক পড়ত। কলেজের কাছে মঠ; কলেজে সকালে বিকালে পঠন-পাঠন চলতে পারবে, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম।

এখন নগরে নগরে কলেজ হয়েছে, মহানগরে আসবার প্রয়োজন নাই। সব কলেজে সেই থোড়-বড়ি-খাড়া। কোনটায় হয়ত কোন ব্যন্নন ভাল বাঁধা হয় না, কিন্তু সকল ব্যন্নন বিস্বাদ হয় না। যদি কোনটা হয়, অধ্যক্ষের গোচরে আনলে দক্ষ পাচক নিযুক্ত হ'তে পারেন। আর, যদি কোন শিক্ষক দুটা কথা ভুলই শিখান, সে ভুলে কিছুই এসে যায় না। নগরে নগরে মহাবিদ্যালয়; নগরে নগরে সরস্বতীর অর্চনা হ'তে থাকবে, মূর্খেও দু-একটা মন্ত্র শুনতে পাবে। মধ্যে মধ্যে কলেজও নগরবাসী ও গ্রামবাসীকে সরস্বতীর প্রসাদ পেতে ডাকবেন, ইংরেজী-শিক্ষিত ও ইংরেজী-অশিক্ষিতের অন্তর কমে যাবে। এই এক কারণেই কলিকাতার গ্রাস হ'তে নগর রক্ষা উচিত। অনেকে বলছেন, গ্রামে ফিরে যাও। আমি বলি, মহানগর হ'তে প্রথমে নগরে ফিরে এস।

কিন্তু পাঁচ শত ছাত্র, ও ছাত্রের বেতন ৬৲ টাকা, ধরে' বি-এ,

বি-এস্‌সি কলেজ চালানা যেতে পারে কি ? পারে, পারেও না। এখন বিশ হাজার ছাত্র, চল্লিশটা কলেজের দরকার। চল্লিশটা আছে। অনেক কলেজ বদান্যের দানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টান মিশনারী কলেজ, মিশন হ'তে অর্থসাহায্য পান। দেশের পক্ষে এটা নিন্দার কথা। বিদেশী, তোমাব আমার পুত্রকে মানুষ করে' দিয়ে যাবেন, আব আমরা হাঁ করে' তাকিয়ে থাকব, নিন্দার কথা বই কি। নিন্দা সইব, টাকাও দিব, দুটা হ'তে পারে না। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় পূর্বে মিশনারী কলেজ গবর্মেণ্টেব কাছে হাত পাততেন না। সে যা হ'ক, ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে, কলেজের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। দেশহিতৈষী বদান্যও জুটবেন।

একটা মোটামুটি হিসাব কবি। ৫০০ ছাত্র, ৬৲ টাকা বেতন, মাসিক আয ৩০০০৲ টাকা। পাঠ্যেব নানা ওড়ন-পাডন আবশ্যক মনে হয কি ? মানুষ হ'তে যে জ্ঞান তোমাব পুত্রেব চাই, সে জ্ঞান আমার পুত্রেবও চাই। তথাপি পঁচিশ শিক্ষক চাই। গড়াহাড়ি ২০০৲ টাকা বেতন ধরলে মাসে ৫০০০৲ টাকা চাই। এর উপর অন্ততঃ ১০০০৲ টাকা চাই। এই ৬০০০৲ টাকার অর্ধেক ছাত্রের পিতারা দিবেন, অপব অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় দিবেন। এখন ৫০টা কলেজ আছে। যদি প্রত্যেককেই ৬০০০৲ টাকা দিতে হয়, তা হ'লে গবর্ণমেণ্টকে বৎসবে আঠার লক্ষ টাকা দিতে হবে। এ আর বেশী কি। শিক্ষকদেব বেতন গড়াহাড়ি ২০০৲ টাকা ধরেছি। বর্তমানে এটা কম মনে হবে। কিন্তু এই বেতনে কোন কোন কলেজ চলছে। আব এটাই স্থায়ী বেতন হবে। দশ পনর বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় বিভাগের মাথাদের বেতন নেমে যাবেই যাবে। তখন অপরের বেতনও অল্প অল্প নামবে, তুলনায় মনঃকষ্ট হবার কারণ থাকবে না।

গবর্মেণ্ট কয়েকটা কলেজ খুলেছেন, এখনও হাতে রেখেছেন। খুলবার

প্রয়োজন ছিল, অন্য কলেজ ছিল না। এখন সে প্রয়োজন গেছে। শুনি, 'মডেল' কলেজ হয়েছে। আদর্শের প্রয়োজন অবশ্য আছে, চিরকাল থাকবে। কিন্তু সে আদর্শ অধ্যবসায়ীর প্রযত্নের উর্ধ্বে থাকলে কোন ফল নাই। হাতের লাগাল না পেলে সেটা উপহাস। আদর্শ কলেজে পাঁচ শতের বেশী ছাত্র থাকবে না, ছাত্র প্রতি বৎসরে ১৪৪৲ টাকার বেশী খরচ পড়বে না, এই নিয়মে আদর্শ দেখাতে পারলে আনন্দের বিষয় হবে।

যে পিতা পুত্রের চোখ ফুটাতে তাকে কলিকাতার কলেজে দিয়েছেন, তিনি অবশ্য এই ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিবেন। তিনি বলছেন, কলিকাতায় কত সাধু পুণ্যাত্মা আছেন, বিদ্বান্ মহাবিদ্বান্ আছেন, উপাধ্যায় মহা-মহা উপাধ্যায় আছেন, কত বিদ্যালয় মহামহাবিদ্যালয়, গ্রন্থশালা পাঠশালা আছে, কত সভা, সম্মেলন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যান চলছে! এ সব দেখা ও শোনা যে মস্ত শিক্ষা। এরই জন্যে হাজার অসুবিধা হ'লেও কলিকাতায় থাকা উচিত। যুক্তিটা কিছু সত্য, বেশীর ভাগ কাল্পনিক। সাধু ও উপাধ্যায় তোমার পুত্রের কল্যাণ-চিন্তায় বসে' নাই। কলিকাতা দেখা চাই, উত্তমরূপে দেখা চাই। কিন্তু দেখা ও শোনার কালাকাল আছে। যদি দেখতে ও শুনতে মন করে' কলিকাতা যাই, তা হ'লেই দেখা ও শোনা সত্য হবে। পুত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতায় বিশ পঁচিশ দিন থেকে এক-মনে দেখতে ও শুনতে পারে। যেটা আন্‌মনে দেখি ও শুনি, সেটা দেখা ও শোনা নয়। এটাই ত মহাদুঃখ, ছাত্রেরা চোখ কান বুজে থাকে। তারা বই পড়ে, 'টেষ্ট টিউব' ধরে, আর সময় পেলে গল্পের রস পান করে। এখন বাংলা ভাষা শিখতে হবে কি-না। সোজা নয়, ১০০ নম্বর রাখতে হবে!

অন্নচিন্তা

আমাদের ছেলেরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখছে, দুতিনটা পাসও দিচ্ছে, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সময় অন্নচিন্তায় কাতর হয়ে চোখে আঁধার দেখছে। শিক্ষিতের সজাতি, শিক্ষিত। কাজেই শিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের দরদ দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞজন এদের অবস্থা ভাবছেন, বেকার-সমস্যা এদেরই জন্য উঠেছে।

কিন্তু এরা ক জন! আ-শিক্ষিত ভদ্র গণ্‌লে বেকার ও পেটভাতায় চাকরের দল বিপুল দেখা যাবে। বহু বহু ভদ্র আছেন, যাঁরা বিদ্যামন্দিরে প্রণামী দিতে পারেন নাই, তাঁরা নীরবে অর্ধাশনে দারিদ্র্যপাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। গ্রামবাসী যাঁরা পারছেন, তাঁরা গাঁ ছেড়ে শহরে যাচ্ছেন, বস্ত্রের আবরণে মলিন ও ক্ষীণ দেহ আর ঢাকতে পারছেন না।

ব্যাপার তুমুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, যাঁরা 'ইতর' নামে খ্যাত, তারাও যে সকলে সুখে আছে, তাও নয়। এরাই দেশের কারু ও কার্মিক। এদের কর্মের অভাব ছিল না; কিন্তু দুর্দৈব এই, বাহির হ'তে লোক না এলে বাঙ্গালা দেশ অচল হয়ে থাকত। কলিকাতায় পা দিলেই মনে হয়, কলিকাতা বাঙ্গালা দেশ নয়। জেলার শহরে গেলেও দেখি, কায়িক-কর্মে ও শ্রমসহিষ্ণুতায় বাঙ্গালী পরাভূত হচ্ছে।

যে সকল কারু ও কার্মিক শহরে ও শহরের কাছে বাস করছে, তাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল হয়েছে। হয়েছে বটে; কিন্তু সেটা কর্ম-সামর্থ্যের গুণে নয়, অবাঙ্গালীর সহিত সংগ্রাম বাধে নাই বলে' হয়েছে। যেখানে সংগ্রাম বেধেছে, সেখানে বাঙ্গালীকে হঠে আসতে হচ্ছে। অনেকের

রোজগার বেড়েছে, কিন্তু স্থিতি হচ্ছে না। চওড়া ফিন্-ফিনা ধুতি ও গেঞ্জি ও কোটে, মদে ও জুয়ায় টাকা উড়ে যাচ্ছে। 'হঠাৎ বাবু'র কাঁচা পয়সা সহজে জীর্ণ হয় না। গ্রামে যাদের দুই এক বিঘা চাষ আছে, তারা বরং ভাল। কৃষির উৎপন্নের সঙ্গে বেতন যোগ হয়ে মোট আয় বৃদ্ধি হয়েছে, সঞ্চয়প্রবৃত্তিও আছে। যারা কৃষিজীবী, কৃষিকর্মই এক সম্বল, অত্যাপাত না ঘটলে, তারাও এক রকম করে' খাচ্ছে। কিন্তু সঞ্চয় নাই বলে' একটু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, অমনই হাহাকার।

এই সকল 'ইতর' লোকের অবস্থা দেখে হঠাৎ মনে হতে পারে, 'ভদ্র' বেকার-সমস্যার এই ত পূরণ চোখের সাম্‌নে রয়েছে। 'ভদ্রেরা' চাষ করুন না, হাতুড়ী দিয়ে লোহা পিটুন না, মাথায় মোট নিয়ে কুলির কর্ম করুন না। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা ভুলে যান ভদ্রেও এই কর্ম করলে ইতরে কি কর্ম করবে? ভদ্রে কতক কর্ম করেন না বলে'ই ইতরের অবস্থা ভাল হয়েছে, কর্মপটুতা হেতু নয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসী অধিকাংশ ভদ্রের জমি আছে, কিন্তু কৃষাণ অভাবে কৃষি হ্রাস হচ্ছে। যে কৃষিকর্মে পোষায়, তা একজনের কায়িকশ্রমে নয়। তৃতীয়তঃ, 'ভদ্র' তাঁরা, যাঁরা পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রম করেন নাই, এখন করলে সমাজে মান থাকে না, নিন্দা হয়। অনেক উপদেশক কিন্তু এ কথা জেনেও কানে তোলেন না, মনে করেন দেশটা বুঝি আমেরিকা, একটু বলবার অপেক্ষায় বসে' ছিল! যাঁরা অন্নচিন্তায় কাতর, তাঁরা মুর্খ হ'লেও নির্বোধ নন। ঘরের আনাচ-কানাচ হাতড়েও কিছু না পেয়ে জড়বুদ্ধি হয়ে পড়েছেন।

উচ্চশিক্ষিত বেকারের প্রতিও এই উপদেশ শুনে আস্‌ছি। "বাপু হে, চাকরি চাকরি ক'রো না। চাষ কর, ব্যবসা বাণিজ্য ধর।" কিন্তু চোরা যে ধর্মের কাহিনী শোনে না, সে কি তার দুষ্টামি? দেখছি, উপদেশটা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। এর অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ, যাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা লেখা-পড়া শিখে' লেখা-পড়ার কর্মই

করছেন কথনও ক্ষেতে গিয়ে রোদে তেতে জলে ভিজে কোদাল ধরেন না, সিন্দুকের মতন দোকানঘরে চটের উপর বসেন না, কিম্বা হাটে হাটে গাঁয়ে গাঁয়ে ধান ও পাটের দর চর্চে বেড়ান না। আমি চাকরি করব কিন্তু তুমি করবে না, যেহেতু চাকরি থালি নাই, এই যে যুক্তি, সেটা কটূক্তি। তা ছাড়া, লেখাপড়ার চাকরও ত চাই, নইলে সংসার অচল। চাকরির উমেদারও চাই, নইলে ভাল মন্দ বাছ্‌তে পারা যায় না। বড়লাট সাহেব চাকর, ভারত-সেনাপতিও চাকর; হাইকোর্টের জজ চাকর, আর মুদীর দোকানের কেষ্টাও চাকর। তফাৎ এই, বেতনের ও মানেব। বেতনেরও তত নয়, মানের যত। কুলীর সর্দারি করলে অনেক রোজগাব হয়, কিন্তু মান নাই। মারোআড়ী মোটবেই চড়ুন, আর টাকাব গদীতেই বসুন, মানীর মান পান না। মান সেখানে, যেখানে প্রভুত্ব আছে, বেতন যতই হ'ক। বাহুবলে বলার্থীর মধ্যে, ধনবলে ধনার্থীর মধ্যে প্রভুত্ব ঘটতে পারে, কিন্তু নৃপত্ব ও বিদ্বত্ব কদাচ তুল্য নয়। লেখাপড়ার কর্ম, বিদ্বানের কর্ম, মানের কর্ম। কেবল ধন উপাস্য নয়; ধন ও প্রাণ অপেক্ষা মান কাম্য। আদালৎ তার সাক্ষী।

এই যে প্রবৃত্তি, মানরক্ষার ও মানবৃদ্ধির ইচ্ছা, এটা বঙ্গদেশ নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, বর্বর ও সভ্য, সকল মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করে' সন্ন্যাসী হ'তে গেলে নূতন করে' সৃষ্টি ফাঁদ্‌তে হবে। বিলাতে কি অভিজাতি নাই? 'ভদ্র' ও দোকানদারের মানের প্রভেদ নাই? আমেরিকায় প্রেসিডেণ্টের পুত্র মাথায় মোট নিয়ে যেতে পারেন, কারণ সেখানে ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই, লাট নাই, লাটীও নাই। কিন্তু এ দেশ ত আমেরিকা নয়। কেবল মাথায় মোট বইবার বেলা আমেরিকা, আর বর্ণাশ্রমধর্মের বেলা ভারত? তাই কি ছাই বর্ণাশ্রমধর্ম আছে? বামুনের ছেলেকে আদালতের পেয়াদা হ'তে দেখ্‌লে বুঝি, বর্ণাশ্রমধর্মে দিন চলে না।

এই সুযোগে সমাজসংস্কারপ্রার্থী বলেন। বালাই গেছে, দেশটা পশ্চিমের কাছাকাছি হচ্ছে। কিন্তু যদি টাকার গরবে বিদ্যার গৌরব ভুলতে হয়, তা হ'লে পশ্চিমের দিকে না গেলেই ভাল ছিল। পশ্চিমের রক্তচ্ছটায় চোখ খরে' গিয়েই ইতর ভদ্র, সবার অন্নচিন্তা দারুণ হয়ে পড়েছে। ইস্কুল কলেজের ছেলেদিকে রাখলাম বিলাতী উদ্যানের মনোহারী নিকুঞ্জে; এখন বলছি বাইরে এস! শেখালাম বিলাতী মতিগতি; এখন বলছি, টেরি কাটা, মোজা পরা, বাবু সাজা চলবে না! কায়িক শ্রম, প্রাণধারণের নিমিত্ত কায়িক শ্রম, যাকে চৌদ্দ পনর বছর করতে দিই নাই, সে এখন কেমন করে' করবে? কাজেই সে বণিকের দোকানে লেখা-পড়ার কাজ করছে।

আরও কথা আছে। বৃত্তিমাত্রেই পাদবিশিষ্ট। চাকরি একপাদ, একা স্বশরীরে হাজির হ'তে পারলেই এই বৃত্তি চলতে থাকে। আর কোনও বৃত্তি একপাদ নয়। কোনটা দ্বিপাদ, যেমন মহাজনি, ধন ও বুদ্ধি থাকলে করতে পারা যায়; কোনটা ত্রিপাদ, যেমন কৃষি ও বাণিজ্য, ধন জন মন বা বুদ্ধি থাকা চাই। ব্যবসায় (industry), কলা (manufacture) চতুষ্পাদ, ধন জন মন ও সরণী (system) চাই।

আসল কথা এইখানে। বিদ্যাহেতু শিক্ষিতের গৌরব আছে, কিন্তু যে বুদ্ধির কথা বলছি সে বুদ্ধি নাই। ছবছর বয়স হ'তে বিশ বছর তক যাকে কেবল লিখতে পড়তে শেখালাম, লেখাপড়ার কর্মেরই যোগ্য করলাম; এই সব বৃত্তির সহিত পরিচিত করাই নাই, যাকে সে বুদ্ধিই দিই নাই, সে সাঁতার না শিখে কেমন করে' জলে ঝাঁপ দিতে পারবে?

এই অভিযোগ খাড়া করে' কয়েকজন বিজ্ঞ দোষ দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের। তাঁরা এমন আড্ডা খোলেন কেন, যদি চাকরি জোটাতে না পারবেন? যেন গিরিমেণ্ট ছিল ছাত্রদের খোর-পোষের ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে! ধমকে চমকে কর্তারা কিন্তু ভয়

পেলেন, বললেন ইস্কুলে বৃত্তি শেখানা হবে, কলেজে বাণিজ্য বিদ্যায ডিগ্রি দেওযা যাবে। আশ্চর্যের কথা, কেহ ভাব্‌লে না, সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষীর পেচক পশলে দুজনের একজনকে পলাযন করতেই হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা। আর, বৃত্তি'শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, অর্থ উপার্জন। বিদ্যা ও প্রযোগ-কৌশল এক ত নয়। যে বিশ্ববিদ্যালয প্রবেশপথে রেখা-চিত্র পরীক্ষা করতে পারলেন না, তাঁরা বৃত্তিশিক্ষার কি পরীক্ষা করবেন, ভেবে পাই না। বসালাম ময়দার কল, এখন লোকের কথায় তাতে শুরকী ভাঙ্গতে গেলে, না পাব ময়দা, না পাব শুরকী, কলটাই ভেঙ্গে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয বৃত্তি শেখাচ্ছেন না, তা নয। উকীলি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিযারি শেখাচ্ছেন। কিন্তু সে নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান আছে, বিপুল অর্থ ব্যযও হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয অন্য বৃত্তিও শেখাচ্ছেন। লেখাপড়ার বৃত্তিও বৃত্তি। কেরাণী ও মাষ্টার, হাকিম ও উকীল, পত্রসম্পাদক ও লেখক, লাটের মন্ত্রী ও সভাসদ,—এঁরা আগাছার মতন আপনই জন্মেন নাই।

তথাপি, জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালীর পরাভব দেখতে পাচ্ছি। এই পরাভব দুই প্রকারে দেখতে পাই। অন্য ভারতীর সহিত প্রতিযোগিতায যে পরাভব, সেটা স্পষ্ট। আর, অন্নচিন্তায যে আর্ততা, সেটা অস্পষ্ট। মনে করি যেন, বাঙ্গালী ছাড়া স্বদেশী বিদেশী কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালা দেশে নাই। তা হ'লেই কি বাঙ্গালীর কর্মসামর্থ্য বেড়ে যেত, ধন উপার্জনের শক্তি বাড়ত, না অকাল-মৃত্যু হ'তে রক্ষা পেত, না জীবনকে উৎসবময় করে' রাখতে পারত ?

অনেকদিন হ'ল ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন,—

ব্যবসাযে পটু নহে, সাহসবিহীন।
আলস্যের দাস হয়ে, থাকে চিরদিন॥

সর্বদা ব্যসনে রত, ক্ষীণ কলেবর।
নিয়ত নির্ভর করে দৈবের উপর॥
অতিশয় ভয়শীল, সদা মরে ত্রাসে।
জন্মভূমি ছেড়ে কভু না যায় প্রবাসে॥
শ্রমভয়ে অল্পেতে সন্তোষ হয় মনে।
তাদের মহত্ত্ব লাভ হইবে কেমনে॥

কিন্তু দেখছি, অনেক বাঙ্গালী শৌর্যে ও বীর্যে, শ্রমে ও ব্যবসায়ে, ও অন্য বহুবিধ গুণে মহত্ত্ব লাভ করেছেন। যখন বাঙ্গালীরই মধ্যে আদর্শ পাচ্ছি তখন উত্থানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু যখন দেখি অগণ্য বাঙ্গালী আদর্শের ধার দিয়াও যায় না, বহু দূরে পড়ে' আছে, তখনই মনে চিন্তা হয়, দোষ স্বভাবজ হয়ে গেছে, নানা দিকে নানা প্রতীকার চিন্তা করতে হবে, গোরু-হারালে-গোরু-পাওয়া-যায় মার্কা-মারা ওষুধের সাধ্য নয়। এই দোষ গ্রাম্যজনের চোখও এড়ায় নাই। তারা বলে, বাঙ্গালী তালপাতার সিপাই, বাতাসে হেলে, সোজা দাঁড়াতে পারে না! যদি দৈবক্রমে আগুনের ফুল্‌কি গায়ে পড়ে, অমনই দাউ-দাউ করে' জ্বলে' ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, তালপাতার আগুন থাকে না।

আমরা তালপাতা বটি, তেল জল মাখিয়ে রাখতে পারলে মন্দ দেখাই না। কিন্তু মেষ নই, আজ্ঞানুগামিতা আমাদের কোষ্ঠীতে নাই। যদি সংহতি-শক্তি থাকত, তা হ'লে এই তালপাতা অসাধ্য সাধন করতে পারত, মদমত্ত হাতীকেও ধরতে পারত।

এই যে বাঙ্গালী প্রকৃতি, এর গোড়া কোথায়? যখন দেখি, শিক্ষিত বাঙ্গালী এই বিপুল ধরিত্রীতে কর্মক্ষেত্র খুজে পান না, স্ব-স্থ হ'তে পারেন না, এক মুঠা অন্নের তরে ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন বুঝি মনের বোঝা নিজের বাঁধা, কর্ম করবার সামর্থ্য নাই, নিজের

সামর্থ্যে বিশ্বাস নাই। অতএব কর্ম-সামর্থ্য বাড়াতে হবে, বিশ্বাস জন্মাতে হবে। যে কায়িক শ্রমে পরাভূত হয়, সে মানসিক শ্রমেও পরাভূত হয়, মন বইতে চাইলেও শরীর বইতে চায় না, একাগ্রতা থাকে না, বহুকালব্যাপী কর্ম সাধ্য হয় না।

এই অবস্থার তিন কারণ মনে হয় (১) দেশজ, (২) জন্মজ, (৩) উপার্জিত। এই কারণত্রয় প্রতিপন্ন করতে হ'লে অনেক কথা বলতে হয়। এখানে সংক্ষেপে সারছি।

দেশ বলতে জলবায়ু সম্বলিত ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে মানুষ বাস করে, তার প্রভাব মানুষের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। জঙ্গলদেশের মানুষ দারুণ হয়, পাহাড়্যে দেশের মানুষ শ্রমপটু হয়, উষ্ণ ও আর্দ্রদেশের মানুষ অলস হয়, ইত্যাদি। বাঙ্গালী চরিত্রের সুকুমার ভাব যে দেশের গুণে স্থায়ী হয়ে আছে, তাও স্বীকার করতে হবে। প্রাচীনকালেব আযেরা সেকালেব বাঙ্গালীকে বিহঙ্গম বলে' গেছেন। কি দেখে বলেছিলেন, কে জানে। হয়ত, লঘুগতি ক্ষীণদেহ দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ, জন্মজ। পিতামাতার ও পূর্বপুরুষের দোষগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়। আমাদের প্রাচীন মনস্বীরা এই দেখে সু-জন সৃজনের জন্য যে কত দিক ভেবেছিলেন, তা স্মরণ করলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সু-জন্ম বিদ্যাকে মাথা নোয়াতে হবে। কিন্তু তাঁদের উপদেশ কেউ শুনলে না, মানলে না। পশ্চিমদেশেও শুনছে না, মানছে না। লোকে বুঝলে, সকলকে বিবাহ করতেই হবে, নইলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ। বুঝলে না, যে-সে পুত্র দ্বারা নরক হ'তে ত্রাণ হয় না। তাঁরা চারি বর্ণ দেখে চারি বর্ণ স্বীকার করে' গেলেন। পরে ঘটল, চারি বর্ণের চারি কুড়ি জাতিভাগ, চারি কুড়ির চারি কুড়ি 'ঘর' ভাগ। তাঁরা বললেন, সবর্ণ বিবাহ যদিও শ্রেষ্ঠ, অনুলোম বিবাহও করতে পার। লোকে বুঝলে, ওবর্ণ জাতি এক, জাতি ও ঘর এক। তাঁরা মৌলিক হ'তে কুলীন

উৎপাদনের তরে কুলীনের লক্ষণ দিয়ে গেলেন। লোকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিশুদ্ধ ধারা' (pure line) বুঝলে না, উত্তম সঙ্কলন হ'ল না ; অশুদ্ধ বিশুদ্ধ মিশে গেল। অতএব বিবাহ হ'ল না-প্রাকৃতিক না-ব্যবস্থানুগত। ঘুণ-ধরা কাঠে ঘুণ বাড়তে লাগল। যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ—এই সত্য ভুলে গিয়ে সন্তানে কি ধর্ম কি গুণ থাক্‌লে সে জয়ী হবে, সে ভাবনা কারও হ'ল না। কিন্তু দেশের হাওয়া বদ্‌লাবার নয়, সমাজবিধিও সহজে পরিবর্তিত হয় না। কাজেই উপার্জিতের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে হবে।

গোড়ার কথা আবার ভাবি। জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী অযোগ্য হয়ে পড়ছে ; শিক্ষিত, আ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র অ-ভদ্র সবাই। দুদশজনের কৃতিত্ব দেখে একটা রয়ের (race) কৃতিত্ব বুঝতে পারা যায় না। বরং ক্রম দেখে বুঝি, এরণ্ডের অরণ্যে আরও ক্রম জন্মিতে পারত। অসামর্থ্যের কারণ দেহের বলের অভাব ও শিক্ষার দোষ।

কৃশ দেহেও বল থাকতে পারে, আর স্থূল দেহও দুর্বল হ'তে পারে। অতএব দেহ দেখে বলাবল নির্ণয় করতে পারা যায় না। আয়ুর্বেদে বলবানের লক্ষণ উক্ত আছে, সে লক্ষণ, চেষ্টা-পটুতা। চেষ্টা—কায়িক কর্ম, সে কর্ম শরীর দ্বারা সাধ্য। যে কায়িক কর্মে পটু, সমর্থ, সে বলবান্। যে শুতে পেলে বসতে চায় না, বসতে পেলে উঠতে চায় না, মুখ ম্লান, শরীর বিবর্ণ, যার তন্দ্রা ও নিদ্রা সর্বদা, তাকে বলবান্ বলতে পারা যায় না। কারণ বলের এমনই গুণ, মানুষকে নিশ্চেষ্ট হ'তে দেয় না। তখন উৎসাহ, অধ্যবসায়, নিরালস্য আপনই আসে। সুস্থ ব্যক্তিরও লক্ষণ কতকটা এই। তার শরীরানুরূপ কর্মসামর্থ্য থাকে, তার ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকে। যার না থাকে, তাকে আমরা রো-গা অর্থাৎ রুগ্ন বলি।

গণ্‌তিতে বাঙ্গালী সাড়ে চারি কোটি, কিন্তু ক জন স্ব-স্থ, এবং ক জন বলবান্? নারী, বালক, বৃদ্ধ বাদ দিলে যে যুবা থাকে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলেও ক জন? নগরবাসী দেখলেও চলবে না। গ্রামবাসী দেখতে

হবে। কলিকাতায় যে সব ছাত্র কলেজে পড়ছে, তারা দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী ভদ্র শ্রেণীর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রায় সাত হাজার ছাত্রের দেহ নিরীখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, শতকে ষাটি সত্তর জনের দেহ রুগ্ন! অর্ধেক কুজা হয়ে দাঁড়ায়, আর মাত্র আটজন সংহত-গাত্র! বাকি নিরানব্বই জন কি কর্মের যোগ্য? বাঙ্গালী যে টানা-পাখার নীচে চেয়ারে হেলান দিয়ে কেরাণী হ'তে ভালবাসে, তার একটা কারণ এখানে। বাঙ্গালীর যে সংহতি-শক্তি নাই, তারও একটা কারণ এখানে। বলবান্ পরস্পর মিলতে পাবে, দুর্বল পারে না। একাকী প্রাণগতিক ভালয় ভালয় চালাতে চায়। দুষ্টবুদ্ধি আশ্রয় করে' পরকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে বড় হ'তে চায়। এ কথা সত্য, বাঙ্গালী মেলেরিয়ায় জর্জর। দু পুরুষ ধরে' এই দারুণ ব্যাধি ভোগ করলে, বল-বীর্য কত থাকবে? বিপদ এই, কার্য ও কারণ এক হয়ে গেছে; বলহানির কারণ মেলেরিয়া, মেলেরিয়ার কারণ বলহানি।

আমাদিকেই কিন্তু এই সঙ্কট হ'তে মুক্তির পথ দেখতে হবে। স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র আসবেন না, বরুণও আস্‌বেন না, হাত ধরে' পথ দেখিয়ে দিবেন না। "দেশ ত দেশেই আছে কি তার উদ্ধার—" এ কথা আর কতকাল বলতে থাকব? গ্রাম পরিষ্কার, পুকুর পরিষ্কার কে না চায়? কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও চেষ্টার অভাব; কারণ খাটবার শক্তি নাই, এই হেতু প্রবৃত্তি নাই।

আশা এই, অভ্যাস দ্বারা শক্তি বাড়াতে পারা যায়। ব্যায়াম দ্বারা বল লাভ করতে পারা যায়। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা হয়, কর্মসামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, দেহ সুঠাম হয়, আর রোগও দৃঢ়গাত্রকে সহসা আক্রমণ করতে পারে না। ব্যায়াম ও খেলা এক নয়। ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা হাডুডুডু নুনকোট প্রভৃতি খেলার গুণ আছে। কিন্তু ব্যায়ামের চারি গুণ ক্রীড়াতে নাই। ইস্কুলে যে চলন (Drill) ও চার-কর্ম (scouting)

শেখানা হয়, তারও গুণ আছে, বিনয় (discipline) লাভ হয়। কিন্তু ব্যায়ামের ফল হয় না। বি-আয়াম—দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রসারিত করা। প্রসারণের পর সঙ্কোচন। যে অঙ্গ যেমন সরু যেমন মোটা হ'লে শরীর সুন্দর হয়, সুঠাম হয়, তা ব্যায়াম দ্বারা হ'তে পারে, ক্রীড়া দ্বারা নয়। ব্যায়ামের এক রূপ মল্লক্রীড়া বা কুস্তি। ইহার প্রধান লক্ষ্য, আত্মরক্ষা। বাহু দ্বারা, লাঠি দ্বারা, অসি দ্বারা, যাহা দ্বারা হউক, ব্যায়ামের লক্ষ্য আর মল্লক্রীড়ার লক্ষ্য এক নয়।

বাল্যকালে দেখেছি, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আখড়া ছিল। সে আখড়ায়, ভদ্র ইতর, সকলকেই দেখতে পেতাম। কিন্তু মেলেরিয়ার পর হ'তে আখড়া-টাখড়া সব উড়ে গেছে। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, জ্বরের কোঁ-কোঁ-রবে বাহুর অস্ফোট ডুবে গেল। এখন সামান্য চোরের ভয়ে লোকে দরজায় খিল আঁটে, তখন ডাকাত পড়লে ধরতে দৌড়াত। পুরীতে এখনও পঞ্চাশটা আখড়া আছে, পাণ্ডাদের শরীর দেখ্‌লে বুঝি সে গুলায় এখনও চাবি পড়ে নাই। চাবি দিবার জো নাই, পাণ্ডারাই যাত্রীর রক্ষক। পূর্বকালে শত্রুর আক্রমণ হ'তে তাঁরাই মন্দির রক্ষা করতেন। কিন্তু আর বুঝি সে দিন থাকছে না। একদিকে মেলেরিয়া ঢুকছে, অন্যদিকে ছেলেরা ইস্কুল কলেজে পাঠ করতে আরম্ভ করেছে। এ এক আশ্চর্য-কথা, ইংরেজী ইস্কুলে ঢুকলে মতি আর পূর্বপথে চলে না। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশের কি ঘোর পরিবর্তন হয়েছে, তা স্মরণ হলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। আজ যদি বিদ্যাসাগর নব্য হয়ে জন্মাতেন, একখান বাঁশ নিয়ে দামোদরের বানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কদাপি পারতেন না।

বলহানির আরও এক কারণ ঘটেছে। পূর্বকালের দুধ ঘি নাই, মাছ মাংস নাই, যেন শনির দৃষ্টিতে অন্তর্হিত হয়েছে। সে ভোক্তা নাই, সাবু খেলেও অম্বল হচ্ছে। শাগ-ভাত-মুড়ি—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীর

নিত্য খাদ্য হয়েছে। পূর্ববঙ্গ এখনও ভাল আছে, পুষ্টিকর ও বলকর অন্ন এখনও পাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এই খাদ্যগুণে পূর্ববঙ্গের ওজস্বিতা ও উদ্যম দেশের মুখ রক্ষা করছে। সেন্‌সস্‌ রিপোর্টেও আমার যুক্তির সমর্থন আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রজাক্ষয় হচ্ছে ; সারা সঙ্গে যে কিছু বৃদ্ধি, সে পূর্ববঙ্গের কল্যাণে।

কি দুঃখ ! শক্তিসাধকের দেশ শক্তিহীন হচ্ছে। ক্রমশঃ নিরামিষাশী হয়ে পড়ছে, কিন্তু নিরামিষাশীর বলকর ও পুষ্টিকর দুধ ঘি পাচ্ছে না। কেবল ভাত ও ডা'লের জলে জীবন রক্ষা হ'তে পারে, কিন্তু এই পর্যন্ত। ঘিয়ের নাম নাই, তেলও না থাকার মধ্যে। লোকে জানে না, কিসে কি হয়, একটা খাদ্য কমলে তার কি পরিবর্ত ধরতে হয়। আর কত নগণ্য নরনারী দুবেলা পেট ভরে' নূন-ভাতও পায় না, তা ধনশালী কলিকাতাবাসীর কল্পনাতেও আসবে না। এক বেলা ভাতডা'ল, আর বেলা ডা'লরুটি খেতে বললে দেশকে উপহাস করা হবে। তথাপি জানি, পশ্চিমা দরিদ্র লোকেও ডা'ল রুটি খায়। এমন কি, ভারতীর প্রধান খাদ্য ভাত নয়, রুটি। কেবল বাঙ্গালা দেশ নিয়ে ভারতের পূর্বভাগে ভাত প্রধান খাদ্য। সে যা হ'ক, ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেখা উচিত। কৃশ ও ক্ষুধিতের ব্যাযাম নিষিদ্ধ। ক্ষুধার্ত হ'লে, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর ; যদিও ইস্কুলে ইস্কুলে এই বিধি নিত্য ভাঙ্গা হচ্ছে। আহারের পর, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর। কিন্তু কে সে আজ্ঞা পালছে ? খেয়েই সকলে বিদ্যাস্থানে ও কর্মস্থানে ছুটছে। সে বিদ্যায় কি হবে, যদি লাভ করতে অগ্নিমান্দ্য জন্মে, বাড়ন্ত মুখে শরীর ভেঙ্গে যায় ? দুবেলা ইস্কুল কলেজ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে ; চলছে না, যেহেতু যাঁরা চালিয়েছেন, তাঁরা দুবেলা ইস্কুলে যান নাই।

সুস্থ থাকবার নিমিত্ত আনন্দ-উৎসবের কি প্রয়োজন, তা এখন যুক্তি দ্বারা বুঝতে হচ্ছে। কলেজের উচ্চ শ্রেণীর এক ছাত্র একবার আমায়

জিজ্ঞাসা করেছিল, তৃষ্ণা কাকে বলে। সে লক্ষণ দিয়ে মিলাতে চায়, তার তৃষ্ণা পায় কি না। আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধেও আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, লোককে বুঝাতে হচ্ছে, আনন্দ চাই। ইন্দ্রিয় ও মনের স্ফূর্তি না থাকলে স্বাভাবিক মানুষের বাঁচাই কঠিন। দেশে বহু উৎসব ছিল, হিন্দুর জীবনই উৎসবময়, দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা প্রভৃতি পূজা পূর্বকালের যজ্ঞ। কিন্তু সে ঘটা গেছে, উৎসাহ গেছে, যজ্ঞের হোমমাত্র আছে। এর এক কারণ অর্থাভাব; প্রধান কারণ, ইংরেজী শিক্ষিতেরা এখন সমাজ শাসক, যাঁরা মনে করেন উৎসব করা কুসংস্কার। আরও শোচনীয়, তাঁরা আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য হারিয়েছেন। থিয়েটার হ'লে মন্দ নয়, কিন্তু উপলক্ষ্য কই? বারোয়ারী, বার ভূতের কাণ্ড! এখন শিখেছেন, "দরিদ্র নারায়ণ"। আত্মারাম না হয়ে নারায়ণ দেখছেন, দরিদ্রে! বর্তমান শিক্ষার এ কি পরিণাম! বিদ্যা-আয়তনের ভিৎ না বদলালে রক্ষা নাই।

অন্নচিন্তা লঘু করতে হ'লেও ভিৎ বদলাতে হবে। কিন্তু সে ত অল্প কথায় বলবার নয়।* সূত্রটা এখানে আছে। বিদ্যালয় চাই, বিশ্ববিদ্যালয় চাই; সে সবে লক্ষ লক্ষ বালক ও যুবা কাতারে কাতারে প্রবেশ করুক। কিন্তু যারা পূজারী, তারাই করুক; অন্যে গেলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। কারণ এরা সন্ন্যাসী নয়, ভেখধারী। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও শ্রমশীল, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য। এমন ছাত্র শতকে পাঁচ জন মেলে কি না, সন্দেহ। এদিকে পড়াতে হবে, দক্ষিণা নিয়ে নয় দরকার হ'লে বেতন দিয়ে পড়াতে হবে। এদের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত রাখতে হবে, যত কাল চাইবে তত কাল পালন

---

* বিশ্বভারতী প্রকাশিত আমার "শিক্ষা-প্রকল্প" গ্রন্থে ও "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার" পুস্তকে শিক্ষার ধারা পরিবর্তনের কথা লিখেছি।

করতে হবে। কারণ দেশে বিদ্বান্ চাই, পণ্ডিত চাই। এরা পরে চাকরি করুক, কি বাণিজ্য করুক, যে কর্মই করুক, তাতেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। শিক্ষার ব্যয় বহু লাভে পূরণ হবে। পূর্বকালে এমনই করে' ব্রাহ্মণ জন্মেছিলেন। আর এক শ্রেণী আছে, যাদের অন্নচিন্তা নাই, লক্ষ্মীর কৃপায় চাকরির উমেদার হ'তে হবে না, এরাও কলেজে যাবার যোগ্য। এখানেও দেশের স্বার্থ দেখছি। অনেকে বিলাতী ব্যসনে মত্ত হবে বটে, কিন্তু এমন লোকও পাব যাদের ধন ও বিদ্যার গুণে দেশের নানা দিকে হিত হ'তে পারবে।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া, যাকে অন্নচিন্তা করতে হবে, তাকে প্রথম হ'তে শ্রমসহিষ্ণু আত্মনির্ভরশীল স্ব-স্থ করতে হবে। এর অর্থ এমন নয় যে সে মূর্খ থাক্‌বে, অবিনীত হবে। চাকর্যে, কারু, কলাজীবী, বা বণিক হ'তে গেলে যে বিদ্যা চর্চা কমাতে হবে, তা নয়। বর্তমান শিক্ষায় কিন্তু এই হচ্ছে। দোকানী জাহাজের খবর রাখছে না, উকীল মকদ্দমা ছাড়া কথা কন না, হাকিম বড় হাকিমের মেজাজ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেন না। অবশ্য বহু বহু ব্যতিক্রম আছে। তথাপি বলতে পারি, জীবিকা উপার্জন ছাড়া আরও কিছু আছে, যা নইলে জীবন অপূর্ণ থাকে। মানব জমীন্ যে কত পতিত আছে, তার সংখ্যা হয় না।

ইস্কুল, কলেজ, হোষ্টেল, প্রভৃতি নামগুলি তুলে দিয়ে দেশী নাম রাখা আবশ্যক হয়েছে। কারণ ভাবানুষঙ্গ হেতু বিলাতের অনুকরণ ইচ্ছা হয়। বোধ হয়, এখন কোনও শিক্ষক বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের বিরোধী নন। ২৫।২৬ বছর পূর্বে শিক্ষকের ধুতি চাদরে বাঙ্গালী হয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার হুকুম ছিল না। আপাদকণ্ঠ বস্ত্রাচ্ছাদিত না হ'লে যে শিক্ষণ কর্মে বিঘ্ন হয়, তাও ত নয়। ইংরেজ শিক্ষক তাঁর দেশের পোষাক পরেন, আমরাও আমাদের দেশের পরব। বেশভূষা, চা'ল-চলন, ভাব-ভঙ্গি, ক্ষুদ্র বিষয় নয়। কৃত্রিমতার আবরণ দেখতে দেখতে

মানুষ কৃত্রিম হয়ে পড়ে, নিয়মের দোহাই দিয়ে আত্মরক্ষা করে। ইংরেজী ভাষা শেখাতে যদি ইংরেজ সাজতে হয়, জাপানী শেখাতে জাপানী সাজতে হয়, তা হ'লে দেশকে ছোট করে ভাষাটাকেই বড় করে' তুলি। ইস্কুল কলেজের হোষ্টেলের দেশী নাম, মঠ। তফাৎ এই, মঠ চলে ধার্মিকের দানে, হোষ্টেল চলে ছাত্রের দক্ষিণায়। যদি হোষ্টেলকে মঠ বলি, মঠের নিত্য নৈমিত্তিক বিনা আপত্তিতে চলতে পারবে। মঠের ছাত্রদের চাকর নাই, বহু স্থলে পাচকও নাই। ধনীর ছেলে যদি নিজের কাপড় নিজে কাচতে, নিজের বাসন নিজে মাজতে, হাট বাজার গিয়ে দ্রব্যাদি বয়ে আনতে না পারে, তা হ'লে মঠে তার না আসাই উচিত। এই ভাব কিন্তু এ দেশী নয়। আমাদের দেশে ছাত্রের আদর্শ, ব্রহ্মচারী। এই আদর্শ হঠাৎ পরিবর্তন করাতে ছাত্রের চরিত্র দেশের বিসদৃশ হয়ে পড়েছে। সে আসন-আহ্নিক নাই, সে ব্যায়াম নাই, সে উৎসব নাই, সে আত্ম-সংযম ও আত্ম-মান নাই। ইস্কুল-কলেজে দুই এক ঘণ্টা 'নীতি' উপদেশ দিয়ে ছাত্রদিকে 'মানুষ' করবার প্রয়াস, নিতান্তই হাস্যকর। মঠের নীতিতেই ছাত্রেরা মানুষ হয়ে ওঠে। এই হেতু সকল ছাত্রকে মঠে থাকতে হবে; নিকটে বাড়ী কি বাড়ীর গাড়ী থাকলেও মঠে থাকতে হবে।

বিদ্যালয় অবশ্য বিদ্যালয় থাকবে। শিক্ষার ক্রম প্রথম হ'তে প্রাচ্য করতে হবে; ইংরেজী শিক্ষা ছাত্রের বার বছর বয়সের পর আরম্ভ করতে হবে। শিক্ষার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ক্রম আছে। ইদানী বি-টি পাশ হয়ে শিক্ষকেরা বুঝছেন, দুই ক্রমে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পশ্চিমদেশের বহু শিক্ষণবিদ্যাবিৎ বালচরিত্র লক্ষ্য করে' সে দেশের সনাতন বৃদ্ধশিক্ষা তুলে দিয়ে বালশিক্ষা প্রচলিত করেছেন। বালশিক্ষাক্রমই প্রাচ্যশিক্ষাক্রম। এই ক্রম সফল, অন্য ক্রম বিফল। তথাপি, বলতে দুঃখ হয়, ক্রমের সূত্রটা ছেড়ে অনেকে কাচের পুঁতি কুড়িয়ে বেড়ান। বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষা চলবে না, রথ দেখা আর কলা বেচা কখনও এক সঙ্গে চলে না। তেমনই

কলা-শিক্ষাও চলবে না, কিন্তু কলার সূত্রশিক্ষা, বিদ্যার নিমিত্ত, কর্তব্য। কণ্ঠে হ'ক, যন্ত্রে হ'ক, গীতের যেমন স্বরগ্রাম আছে, যাবতীয় কলারও তেমন আছে। এটা যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) নয়, কর-শিক্ষা (manual training)। শুনেছি, বঙ্গদেশে মাত্র কযেকটা ইস্কুলে কর-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। যদি চিত্র-লেখনের তুল্য বাহ্যবস্তু বিবেচিত না হয়ে মানব-প্রকৃতির সহিত কর-শিক্ষার সম্বন্ধ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, তা হ'লে এই শিক্ষা সার্থক হবে, অন্যথা কালক্ষেপ মাত্র।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, কলেজেও দেখা গেছে, বালশিক্ষাক্রম সফল হয়, বৃদ্ধশিক্ষাক্রম চর্বিতচর্বণ মাত্র। চর্বিতচর্বণে আমরা এত দক্ষ হয়েছি যে আখের ক্ষেতে আখ ভেঙ্গে চিবাতে গেলে দাঁতই ভেঙ্গে যায়; যেখানে যাই, সেখানেই থোড়-বড়ি-খাড়া। খেয়ে খেয়ে ছেলেদের অরুচি জন্মে, তারা ঘড়ীর ঘণ্টা গণতে থাকে, ছুটি পেলে মুখ বদলাতে ঘরে দৌড়ে। কিন্তু পালাবার জো নাই, অষ্ট বাঁধনে অষ্টাঙ্গ বাঁধা আছে, না শিক্ষকের না ছাত্রের হাত পা মেলবার জো আছে। ছাত্রেরা চৌদ্দ পনর বৎসর কারা ভোগ করে' পাকা কয়েদী হয়ে যায়, মুক্তির পরোয়ানা পেলেও ঘরে যাবার পথ খুজে পায় না। পোষা পাখী পিঁজরা ভুলতে পারে না, ঘুরে ঘুরে পিঁজরার কাছে আসে। চাকরি, সেই পিঁজরা; ছাতু আছেই আছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় বলেছিলাম, অনেক জায়গায় অনেক হাঁড়ীতে থোড়-বড়ি-খাড়ার ডালনা রান্না হচ্ছে, নূতন হাঁড়ীতে একটু নূতন ব্যন্নন রান্না হ'ক, বালক্রমে প্রয়োগ হ'তে বিদ্যায়, মূর্ত বিজ্ঞান হ'তে অমূর্ত বিজ্ঞানে যাবার পথ খোলা হ'ক। কথাটা কর্তাদের মনে লাগে নাই। কারণ এর মানে সীমা লঙ্ঘন! গণ্ডীর মাহাত্ম্য লোপ, জাতি-নাশ! আমার হাঁড়ীর ডালনা তুমি খাবে, তোমার হাঁড়ীর ডালনা আমাকে খেতে হবে! সুজ্জিঠাকুর তুদশ দিন নাই উঠুন, কিন্তু বিহার ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালা দেশে যাবে, আর বাঙ্গালাবাসী বিহার-ওড়িষ্যায়

আস্‌বে, টাকার জন্য যেতে আসতে পারে, কিন্তু বিদ্যার জন্য যাবে আসবে? দেশভক্তেরাও বললেন, সে যে প্রলয় কাণ্ড! এই সকল রুদ্ধগবাক্ষ অচলায়তন উৎপাটিত না হ'লে কোনও প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হবে না।

অথচ কলা-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলে এই প্রলয়কাণ্ড না ঘটিয়ে গতি নাই। জেলার শহরে দু চারিটা বিদ্যালয় থাকতে পারে, কিন্তু, কলা-শিক্ষালয় একটা বই দুটা থাকতে পারে না, একটা কলা বই দুটা কলা শেখানা যেতে পাবে না। ব্যয বাহুল্য ভাবছি না, ভাবছি শিক্ষিতেব অন্ন। মনে করি যেন কোথাও কামারের কাজ শেখানা হচ্ছে, বছব বছব বিশ পঁচিশ দক্ষ কামাব তৈয়ার হচ্ছে। কিন্তু পরে খাবে কি? গোলামখানা, উকীলখানার বিরুদ্ধেও ত এই অভিযোগ।

অথচ দেখছি, অকর্মণ্য অ-শিক্ষিত কারু স্বচ্ছন্দে গ্রামে থেকেই অন্নচিন্তা লঘু করতে পেরেছে। এবা যে জীবনসংগ্রামে টিকে আছে, তা তাদের নিজেব গুণে নয, কর্মসামর্থ্যে নয়, লোকেব দয়ায় নয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুবতায় ও আমাদের নির্বুদ্ধিতায। যে দেশে মুড়ি-মুড়কির সমান দর, সে দেশে মুড়কি দুর্লভ। কর্ণিক হাতে নিলেই যে রাজমিস্ত্রী হয়, আর বিকালবেলা একটা চক্‌চক্যে টাকা হাতে পায়, তার শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? এইরূপ সকল কর্মেই। আমরা গুণীর আদর করতে শিখি নাই, তাই গুণহীনে দেশ ভরে' গেছে।

অথচ কারুর কর্মসামর্থ্য বাড়াতে হবে। কেবল মাথার সামর্থ্য বাড়ালে হাত পা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হবে। কারুর কর্মসামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াবার অভিপ্রায়ে দুপাঁচটা কারুশিক্ষালয় (Industrial school) স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে সব অভাবের পর পূরণ নয়, কারুকরি শিক্ষার্থীর ইচ্ছায় নয়, কাজেই জলপানি যুগিয়ে চালাতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম এতে দোষ নাই; কিন্তু শিক্ষিতকে দেখে অন্যে শিখতে আসছে না কেন?

অতএব বলতে হবে, উদ্দেশ্য সাধু বটে, কিন্তু কল্প প্রশস্ত নয়। পৃথক শিক্ষালয়ের সময় এখনও আসে নাই, পৃথক শিক্ষাশালা আমাদের দেশের কল্পও নয়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্তমানে এম্-ই ইস্কুলগুলা প্রায় উঠে যাচ্ছে। কোনটা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে পরিণত হচ্ছে, কোনটা কম বেতনে উচ্চ ইস্কুলের নীচের ধাপ হয়েছে। কারণ ইস্কুলে ঢুকলেই কর্ম-তীর্থে যাবার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়। দরিদ্র যাত্রী পাসেঞ্জার ট্রেনে ওঠে, ধিকি ধিকি যায়, থার্ড ক্লাসে কষ্ট খুব, কিন্তু ভাড়া কম। তীর্থের গরিমা শুনেছে, কিন্তু কষ্ট ভুগে নাই। এ সকল যাত্রীর নিমিত্ত চাই ধর্মশালা ; শিক্ষালয় সে ধর্মশালা। শিক্ষালয়, বিদ্যালয় বটে, আরও কিছু। গ্রামে শিক্ষালয়, চারি পাশের গ্রামের ছেলেরা আসে। বার বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমান হবে। তার পর প্রভেদ। বিদ্যালয়ের যোগ্য ছাত্র বিদ্যালয়ে যাবে, শিক্ষালয়েব যোগ্য ছাত্র সেখানে থাকবে। দেখতে হবে, চারি পাশের গ্রামে কোন্ কারুর অভাব আছে। প্রথমে তার কর্ম শেখাতে হবে। কতকগুলি আমাদের সর্বদা আবশ্যক হয়, যেমন গৃহনির্মাণ। গৃহনির্মাণ একার দ্বারা হয় না। পূর্বকালে চারি ভাগ ছিল, এবং যদিও চারি ভাগের সবাই শিল্পী নাম পেত, প্রত্যেকের নাম ও কর্ম পৃথক ছিল। প্রথম শিল্পী স্থপতি, যিনি গৃহ স্থাপনা (plan) করেন। তিনি স্থাপনা কর্মের যোগ্য, সর্বশাস্ত্রবিৎ ধার্মিক, গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্বদেশজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ, সত্যবাদী, মৎসারাদিরহিত। এইরূপ স্থপতি ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন, যে-সে কারুর দ্বারা হয় নাই। তার পর সূত্রগ্রাহী, স্থপতির পুত্র বা শিষ্য, গুণে প্রায় তুল্য, স্থপাতির মতিগতিপ্রেক্ষক হয়ে মান উন্মান প্রমাণাদি নির্ণয় করতেন। তদনুসারে তক্ষক কাষ্ঠাদি স্থূল বা সূক্ষ্ম করতেন। তার পর মৃৎশিলা কাষ্ঠাদি সম্মেলনপটু বর্ধকি গৃহ নির্মাণ করতেন। এই চতুষ্টয় বিনা দেবালয়, মনুষ্যালয়, কোন গৃহ নির্মিত হ'ত না। প্রাসাদশিল্প হ'ক,

কুটীরশিল্প হ'ক, যে শিল্পই হ'ক, একটা বিদ্যা, বাস্তবিদ্যা। এখন সে বিদ্যা লুপ্ত হ'তে চলেছে, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয়। এইরূপ কামারের কর্ম। বহু গ্রাম আছে যেখানে দুই এক ক্রোশের মধ্যে কামার নাই, যদি বা আছে, হাতুড়ে। এইরূপ, অভাব দেখে যদি কলাশিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষিতেরা অক্লেশে আত্মমান রক্ষা করতে পার্‌বে, অন্যে অন্য বৃত্তি শিখতে প্রবৃত্ত হবে, চাকরির মোহও কাটতে থাকবে।

যেখানে তাঁত ব্যবসায় আছে, পিতল কাঁসার ব্যবসায় আছে, যেখানে যে ব্যবসায় আছে, সেখানে সে-সে ব্যবসায়ের বিদ্যা শেখালে ছাত্রের সহজে পটুতা হবে, ব্যবসায়ে যোগ দিতে প্রবৃত্তি হবে, পরে তা সফলও হবে। যেখানে গঞ্জ আছে, সেখানে ব্যাপার-কর্ম। মারোআড়ী কত সহজে ব্যাপার করে, আমরা আশ্চর্য হই। তারা যে পাঠশালায় পড়বার সময় ব্যাপার করতে শেখে, সে বার্তা রাখি না। তার পক্ষে ব্যাপার করা নূতন নয়। কে না দেখেছে, যে ছেলে দোকানে বসে, সে বড় হয়ে অক্লেশে দোকানী হয়। এম-ই ইস্কুল, ইস্কুল; ছেলেরা আসবে, বিদ্যা অর্জন করবে, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিজ্ঞানও লাভ করবে। শুনেছি এমন ইস্কুল আছে, পাদ্রী সাহেবেরা করেছেন। ক্রমে এই কল্পনা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে চালাতে হবে, ক্রমে কলেজেও চলতে পারবে।

এখানে একটা কথা উঠবে। এ সব শেখাবাব টাকা কোথায়, শিক্ষক কোথায়? বাস্তবিক, যদি অট্টালিকা না হ'লে কিংবা অমুক কোম্পানীর বেঞ্চি না পেলে শিক্ষালয় হবে না মনে হয়, তা হ'লে টাকা নাই, হাত পা গুটিয়ে কুবেরের মুখপানে চেয়ে থাকলেও নাই। যদি সর্বশাস্ত্রবিৎ স্থপতি নইলে শিক্ষালয়ের স্থাপনা হ'তে পারে না মনে হয়, তা হ'লে বাস্তবিক শিক্ষকও নাই। শিক্ষক গড়ে' নিতে হবে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক হ'তে বেছে নিতে হবে। শিক্ষক যে অনেক চাই, তাও নয়। কারণ এক একটা বৃত্তি দু চারি বছর মাত্র এক শিক্ষালয়ে চলতে পারবে,

তার পর বদলাতে হবে। জেলার শহরে নানা বৃত্তি চলছে, বিলাতী কলের জিনিসে বাজার ভরে' আছে। সেখানেও দু চারি বছর পরে কলা বা বৃত্তি বদলাতে হবে। মনে করি যেন একটা জেলায় উপস্থিত দশটা বৃত্তি শেখার প্রয়োজন আছে। মনে করি যেন সকল প্রয়োজন সমান, টাকাও অল্প। তখন দশ জন শিক্ষক স্ব স্ব সাজ নিয়ে দু চারি বছর ছাড়া শিক্ষালয়ে শিখিয়ে বেড়াবেন। কি করে' সাবান করতে হয়, কিংবা জুতার কালী ক'রতে হয়, সে সব কলা গ্রামিক নয়। গ্রামে যা ছিল বা লুপ্তপ্রায়, আগে তাকে রক্ষা করি; প্রথমে ক্ষেম তার পর যোগ।

গ্রামে ও নগরে কত যুবা কারু ও কার্মিক আছে, শিক্ষা অভাবে কর্মপটুতা নাই, দক্ষতা নাই। কেহ কেহ এদের নৈশ বিদ্যালয় করেছেন, অশেষ যত্নে পাঠ পড়াচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষা শব্দের অর্থে লেখা-পড়া বুঝে ঠিক পথ ধরতে পারেন নাই। কর্মে দক্ষতা জন্মাবার এ পথ নয়। কর্ম ধরে' বিদ্যায় পঁহুছিয়ে দিলে বালক্রমে শিক্ষা হবে, সে বিদ্যা স্থায়ী হবে। অশিক্ষিত মাত্রেই বালক, বয়স যতই হ'ক। তাদের পক্ষে আগে ক্ষেত্র, পরে ক্ষেত্রতত্ত্ব; আগে শব্দজ্ঞান, পরে বানান; আগে বানান, পরে লিখন। অতএব নৈশবিদ্যালয় নাম তুলে দিয়ে শিক্ষালয় রাখলে ভাল হয়।

যাবৎ মানুষ, তাবৎ চিন্তা থাকবে, কখনও লঘু হবে কখনও গুরু হবে। গুরু হ'লেই লঘু হবে, প্রকৃতি দ্বারা হ'ক মানুষের দ্বারা হ'ক। দেখা গেল, একটি কারণে দাস্যবৃত্তি আমাদের অবলম্বন হয় নাই। এই বৃত্তি কারও প্রিয় নয়। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ বিহঙ্গম; যেখানে বিহঙ্গম আছে, কার সাধ্য তাকে পিঁজরায় পোরে? না খেতে পেয়ে শুখিয়ে থাকবে, কুলি হ'তে পারবে না, বাড়ীর চাকর হ'তে পারবে না। যেখানে বাগুরায় বদ্ধ হয়েছে, সেখানেও পোষ মানে নাই, পালাবার তরে ছট্-ফট

করছে। আমাদের নন্দনেরা নিন্দার্হ নয়; নিন্দার্হ আমরা, বৃদ্ধেরা। কে তাদিকে বাবু করেছে? কে বাপু বাপু বলে' দুলাল করে' তুলেছে? কে বাঙ্গালীকে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করেছে? কে পশ্চিম দেশের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছে?

বলের অভাবে চেষ্টা-পটুতা নাই। এই অভাবে লেখাপড়ার কাজেও অবসাদ আসে। ক্ষুর দিয়ে কাঠ কাটতে পারা যায় না, কাটারী কুড়াল চাই। ক্ষুর-ধার বুদ্ধি যার, সে যে বলহীন, কর্মসামর্থ্যহীন, 'ভেতো' হয়ে থাকে, সেই ত আশ্চর্য! দেশ বদলাবার নয়, জন্ম বদলাবার নয়, কিন্তু শিক্ষা দ্বারা দেহের ও মনের বল আনতে পারা যায়। এই হেতু শিক্ষা বিষয়ে দুচারি কথা বলতে হয়েছে। যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধি, এই বাক্য স্মরণ করে' সেই ভাবনা-তরঙ্গের একটা কণা উপস্থিত করেছি।

আচারের উৎপত্তি ও প্রয়োজন

একবার এক মান্যা বিদুষী মহিলা বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। বাঁকুড়া সাহিত্যপরিষদ তাঁর সমাদর নিমিত্ত এক জনসভা আহ্বান করেছিলেন। পরিষদের ব্যবহর্তা আহ্বান-পত্রে লিখেছিলেন, "শ্রীমতী অমুক দেবীকে অভ্যর্থনা করা হইবে।" আমি পরিষৎ-পতি, অভ্যর্থনায় কি আচার পালন করা হবে, সে চিন্তায় পড়লাম।

নগরবাসী শিক্ষিত লোকে মান্য অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করেন, তাঁর স্তব করেন। এই কি অভ্যর্থনা? গ্রামে কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে মান্য অভ্যাগত এলে গ্রামের পাঁচ-সাতটি ভদ্রলোক অপরাহ্নে যেয়ে তাঁর কুশল-প্রশ্ন করেন এবং যাতে তাঁর অবস্থিতি সুখকর হ'তে পারে, সেই চিন্তা করেন। কেহ তাঁর নিজের গাছের ভাল আম, কি কাঁঠাল, কেহ পুকুরের মাছ, কেহ টাটকা আনাজ-পাতি, কেহ বা টাটকা গাওয়া ঘি, এইরূপ যিনি যা পাবেন, তিনি সেই গৃহস্থের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি সেই গৃহস্থের কুটুম্ব হ'লেও এইরূপ শিষ্টাচার ছিল। ৩০।৪০ বৎসর হ'ল গ্রাম হ'তে এ ভাব চলে' গেছে। এখন, যার কুটুম, সেই দেখে। পূর্বে লোকে মনে করত, একটি গ্রাম এক পরিবার। আর, অভ্যাগতের অনাদর হ'লে গ্রামের অপমান। কিন্তু এই যে উপায়ন দেওয়া হ'ত, সেটাই কি অভ্যর্থনার আচার?

হঠাৎ মনে হ'ল, অভ্যর্থনা শব্দের অর্থ প্রার্থনা। শ্রীমতীর নিকট পরিষদ কিছুই প্রার্থনা করবেন না, তাঁর পূজা করবেন। তবে, দেখছি, অভ্যর্থনা শব্দটার ভুল প্রয়োগ হচ্ছে! আমরা করতে চাই অভ্যর্চনা, বলছি অভ্যর্থনা। বোধহয়, অভ্যর্হণা শব্দ ভুলে অভ্যর্থনা হয়েছে। অভ্য-

র্থনা যদি পূজা হয়, পূজার আচার আমরা সবাই জানি। পঞ্চোপচারে পূজা হয়ে থাকে। ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য বা নৈবেদ্য, এই পাঁচ উপচারের ইতর-বিশেষ হয়। গৃহে মান্য অভ্যাগত বা অতিথি (সত্যিকার অতিথি) এলে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, আসন ও কুশল-প্রশ্ন দ্বারা তাঁর পূজা করা হ'ত। এই পঞ্চোপচারের মধ্যে দেখা যায়, সুগন্ধ দ্রব্য ও সুন্দর পুষ্প দ্বারা তাঁকে প্রফুল্ল করাই উদ্দেশ্য। দীপের কি প্রয়োজন হ'ত, আমরা এখন বুঝতে পারি না। দুর্গা-পূজা, সরস্বতী-পূজা ইত্যাদি পূজা হয়, দীপ জ্বলতে থাকে। পুরীতে জগন্নাথের বিগ্রহের সম্মুখে দুইটি ঘৃত-দীপ দিবারাত্র জ্বলতে থাকে। মান্য ব্যক্তিকে বরণ করবার সময় বরণ ডালায় প্রদীপ থাকে। দেবদেবীর পূজায় আরতির সময় দীপ প্রদর্শন করতে হয়। আমি এই আচারের উৎপত্তি জানি না। বোধহয় ইহাদ্বারা সম্মান জ্ঞাপিত হ'ত।

শ্রীমতী সভাগৃহে আসবার সময় দুই সুবেশা কুমারী তাঁর প্রত্যুদ্গমন করেছিল। গৃহে উপস্থিত হ'লে সকলে তাঁর প্রত্যুত্থান করেছিল। তিনি তাঁর আসনে উপবেশন করবার পর কুমারীরা এক গীতদ্বারা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। তদনন্তর পরিষৎ-পতি তাঁর কৃতকর্মের প্রশংসা দ্বারা পরিষদের সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ইহাই অভিনন্দন। পরে এক বালিকা তাঁর কপালে চন্দনের তিলক ও গলায় পুষ্পমাল্য দিয়েছিল। তখন তিনি বালিকার চিবুক স্পর্শ করে' স্বীয় করাঙ্গুলি চুম্বন করেছিলেন। ইহাই অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাকে আশীর্বাদ করার আচার। বালক-বালিকার শৈশবাবস্থায় পিতামাতা ও তত্তুল্য গুরুজন তাদের মুখচুম্বন করতে পারেন, অন্যেরা পারে না। পুত্রকন্যার একটু বয়স হ'লে পূর্বকালে পিতামাতা তাদের মস্তক আঘ্রাণ করতেন। এখন এই আচার উঠে গেছে। এর পরিবর্তে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করা রীতি দাঁড়িয়েছে। এইরূপ কত আচার আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সে সব শিষ্টাচার।

প্রণাম বা নমস্কারের অনেক ভেদ আছে। নমস্কার নমঃ, এই ক্রিয়া। মাথা সম্মুখে নত করলেই নমস্কার। প্রণাম বা নমস্কার যাই করি, হাত জোড় করে' পা জোড় করে', গলায় কাপড় দিয়ে মাথা সম্মুখে বুক পর্যন্ত নোয়াতে হবে। সেখানে জোড হাত থাকবে। এর অর্থ, মাথা নীচু করলাম আপনি আমার শিরশ্ছেদ করতে পারেন। একবস্ত্রে কারও সহিত সাক্ষাৎ করতে পারা যায় না, প্রণাম বা নমস্কারও করতে পারা যায় না। যখন হাত জোড় করি, তখন দেখাই, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র নাই। যখন জোড় হাত মাথার উপরে তুলি, তখন দেখাই বাহুমূলেও অস্ত্র নাই। পূর্বকালে বদ্ধাঞ্জলি মাথার উপরে তোলাই রীতি ছিল (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। এখন আমরা হাত জোড় করে' কপালে ঠেকাই। ইহার নাম নমস্কার নয়, খড়্গাঘাত, অবজ্ঞা প্রদর্শন। প্রণামে মাথাদ্বারা ভূমি স্পর্শ করতে হয়। সেখানে আরও দীনতা। মাথা আপনার পায়ের কাছে রাখলাম, ইচ্ছা করলে আপনি কাটতে পারেন। ইহা ভূমিষ্ঠ প্রণাম। সাষ্টাঙ্গ প্রণামে লম্বা হয়ে শুয়ে অষ্ট অঙ্গ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করতে হয়। এই অষ্ট অঙ্গ,—দুই বাহু, দুই পদ, দুই পার্শ্ব, বক্ষ ও শির। এর অপর নাম দণ্ডবৎ প্রণাম। দেহকে দণ্ডবৎ লম্বা করে' মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে দুখানা হাত মাথার উপর দিকে মাটিতে রেখে প্রণাম। এখানেও দেখান হয়, হাতে কিছু নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে শিরশ্ছেদ করতে পারেন। পাদস্পর্শ করে' প্রণামেও দেখান হয়, হাতে কিছু নাই। কেবল গুরুজনের পাদস্পর্শ করে' প্রণাম করতে পারা যায়। একটা চলিত বাংলা শব্দ আছে, 'গড় করা।' এর অর্থ, দুইবাহু দ্বার পদযুগল বেষ্টন করা। গড় গর্ত, দুই হাত দুর্গপ্রাকার। পূর্বকালে বাংলায় এর নাম 'শিয়লী করা' ছিল (শূন্য পুরাণ)। শিয়লী শৃঙ্খল। পদযুগলকে হস্তরূপ শৃঙ্খলদ্বারা বেষ্টন করা। নারী জোড় হাত বুক পর্যন্ত তুলে মাথা নুইয়ে হাত স্পর্শ করবে। হাত উপরে তুলবে না (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। নারী গুরুজনের

পাদস্পর্শ করে' প্রণাম করতে পারে, কিন্তু পুরুষকে গড় করতে অর্থাৎ পদদ্বয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করে' প্রণাম করতে পারে না। যদি কাকেও জোড় পায়ে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে' জোড়হাত কপালে ঠেকাতে দেখি, তখন বুঝি, সে হিন্দু।

হিন্দুর আরও লক্ষণ আছে। তারা যুগ্মবস্ত্র পরিধান করে,—অন্তরীয় ও উত্তরীয়, ধুতি ও উড়ানী। উড়ানী অর্থাৎ আবরণী। ঋগ্‌বেদের কাল হ'তে যুগ্মবস্ত্র ধারণের রীতি চলে' আসছে। নারীদেরও যুগ্মবস্ত্র ছিল, পশ্চিমে এখনও আছে। বহুকাল পূর্বে, ইং ১৮৮১ সালে কলিকাতায় যুবকেরা 'চাদর-নিবারিণী-সভা' করেছিল। কথাটা এই, যদি উড়ানীর উদ্দেশ্য ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণ করা, তা হ'লে জামা গায়ে দিলে আর উড়ানীর প্রয়োজন কি? আমরা তখন কলিকাতা হ'তে দূরে এক কলেজে পড়ি। 'চাদর-নিবারিণী'র ঢেউ আমাদিকেও স্পর্শ করেছিল, কিন্তু বিচলিত করে নাই। কারণ, সার্ট বা কোট গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, গায়ে বাতাস খেলতে পায় না। বিশেষ কারণ, উড়ানী অথবা ওড়নায় বস্ত্রের উড়ন্ত অবস্থা দ্বারা দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়। সাহেবেরা কোট-প্যান্টু পরুন আর মেমেরা যা-ই পরুন, গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে। মনে হয়, যেন কাঠের পুতুল, কাঠে রং দিয়ে নর বা নারীর মূর্তি। সাহেবরা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে থাকেন, বিশ্রী দেখায়। মেমেরা হাঁটু পর্যন্ত একটা কাপড়ের খোল পরে' চলেছেন, শোভা কোথায়? সার্ট গায়ে দাও, কিম্বা কোট গায়ে দাও, তার উপর একখানি উড়ানী থাকলে সৌন্দর্য-বৃদ্ধি হয়। যার চক্ষু আছে, সে-ই বুঝতে পারে।

হিন্দুর আর এক লক্ষণ, সে করাঙ্গুলি দ্বারা অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করে। আমি তখন কটক কলেজে ছিলাম। এক ইংরেজ ইংরেজী-সাহিত্যের প্রোফেসর ছিলেন। বয়স ২৬।২৭ হবে, লোকটি ভদ্র। তিনি আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার জানতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমরা কেমন করে'

দাঁড়াই, কেমন করে' কথা কই, কেমন করে' হাত নাড়ি, ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব লক্ষ্য করতেন। আমি তখন কলেজে বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি আমাকেই বেশী লক্ষ্য করতেন। একদিন আমি করতল নীচের দিকে রেখে করাঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ পেছুদিকে বাঁকিয়ে দূরের একটি লোককে আসতে ইঙ্গিত করছিলাম। সাহেব দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি করতল নীচের দিকে করলেন কেন ? আমরা করতল উপর দিকে রাখি।"

"যদি উত্তর চান তা হ'লে বলব, আমি লোকটিকে চলে' আসতে বললাম, আমার করাঙ্গুলি তার পা। আপনারা উপর দিকে করেন কেন ?"

"এটাই ত স্বাভাবিক।"

আমি হেসে বললাম, "আপনারা এখনও ভুলতে পারেন নাই, এক-কালে আপনারা লাফাতেন।"

একদিন আমি এক প্রৌঢ় প্রোফেসরকে যুক্তকর কপালে তুলে নমস্কার করেছিলাম। কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে মাথা ক্ষণমাত্র নীচু করে' ডান হাত একটু তুলতাম। সাহেব ধরেছেন।

"আপনি আপনার ভারতীয় বন্ধুকে যুক্তকরে নমস্কার করলেন, আর আমাকে দেখে শুধু এক হাত একটু তোলেন। কেন এই প্রভেদ করেন ? আপনি কি আমাকে আপনার বন্ধু মনে করেন না ?"

"আপনি যুক্তকর দ্বারা নমস্কারের অধিকারী নন, যেহেতু আপনি ম্লেচ্ছ।"

"ম্লেচ্ছ কি ?"

"বর্বর।"

"আমি বর্বর ?"

"আমাদের চোখে তাই। আপনারা ক-দিন মানুষ হয়েছেন ?"

দেড় হাজার বছরের বেশী নয়। আর, আমরা যে কতদিন হ'তে মানুষ, সে আপনারা ধারণা করতে পারবেন না।"

"আমি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছি। আপনারা সাড়ে তিন হাজার বছরের বেশী পুরাতন ন'ন।"

"আপনার জাত-ভাইরা এই কথা বলে, আমি হাসি।"

"আপনি কি আরও পুরাতন মনে করেন? আপনার মতের প্রমাণ দিতে পারেন?"

"নিশ্চয় পারি। কিন্তু আপনি কিছুই জানেন না, আপনাকে কেমন করে' বোঝাব?"

"আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি, এমন কিছু প্রমাণ বলুন।"

কি করি, তাঁর জন্য একদিন এক জনসভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে হ'ল। বিষয় ছিল, আমরা কাকে দিবস বলি। সাহেব সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি আমার বক্তৃতার সিকিও বুঝতে পেরেছিলেন কি না, কে জানে। কিন্তু এইটুকু বুঝেছিলেন, যারা এত প্রকার দিবস গণে' থাকে, যে সব দিবসের মূলতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন, যে সব তত্ত্ব মনে আসতে বহুকাল লেগেছে, তারা সাড়ে তিন হাজার বৎসরের অনেক বেশী পুরাতন।

সাহেব একদিন বললেন, "আমাকে হিন্দু করে' নিতে পারেন?"

"এই ভারত-ভূমিতে চৌদ্দ পুরুষ না গেলে পারব না।"

"এতকাল লাগবে? যাই হোক, আপনি যা বলবেন আমি সব পারব, কিন্তু আপনাদের মত ধুতি পরে' উলঙ্গ থাকতে পারব না।"

"আপনিও ত সেইরূপ প্যান্‌ট্‌ পরে' উলঙ্গ।"

"আর একটি পারব না, আপনাদের মত আঙ্গুল দিয়ে খেতে পারব না।"

যেমন বলা, অমনই তাঁর দেহটা শিউরে উঠল।

"এই দেখুন, আঙ্গু া দিয়ে খেতে হবে মনে হবা মাত্র আপনার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। এর কারণ, আপনাদের দেহ অশুচি থাকে। আমরা সর্বদা শুচি থাকি, খাবার আগে হাত, মুখ, পা উত্তমরূপে ধুয়ে নিই। হিন্দু কত শুচি, এই তার প্রমাণ।"

আর একদিন সাহেব বল্লেন, "আপনারা দেহেব শুচিতার গর্ব করেন। আজ আমি দেখেছি, একটি লোক ঘোলা জলে স্নান করছিল। জলের কাদা মাথা কি রকম শুচিতা?"

"বোধ হয় নির্মল জল পায় নাই। অস্নাত থাকা অপেক্ষা ঘোলা জলে স্নানও প্রশস্ত। ঘোলা জলের একটা গুণও আছে, দেহের মল দূব হয়। বর্ষাকালে নদীর ঘোলা জলের অনেক গুণ আছে।"

সাহেব হিন্দুর লক্ষণ ঠিকই ধরেছিলেন। আব, এই সব লক্ষণ ভারতের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায।

এক এক প্রদেশেবও এক এক বিশেষ আচাব আছে, যা দেখলেই আমরা বলি, লোকটি উত্তবপ্রদেশের কিম্বা টামিল দেশেব, বঙ্গদেশেব কি গুজরাটের ইত্যাদি। বঙ্গের উচ্চ-নিম্নবর্ণনির্বিশেষে সকলেই মাছ খায়, ইহা বঙ্গের দেশাচাব। কিন্তু অন্য প্রদেশের উচ্চবর্ণেরা মাছ খায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময এক তেলেগু বণিক কাপড় রঙ্গাবাব দেশী লাল রং খুজতে খুজতে কটকে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের দেশে সধবা নারীর লাল শাড়ী পরাই আচার। কিন্তু জার্মানী হ'তে রং আসছিল না, শাড়ীও রঞ্জিত হচ্ছিল না। হাহাকার পড়ে' গেছল, সাদা শাড়ী পরা অমঙ্গল। আমি বণিককে কিছু উপদেশ ও একটা গাছের শিকড় দিয়ে হাওড়ার শিবপুরে যেতে বলেছিলাম। তৎকালে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কিমিতিবিদ্যার এক বাঙ্গালী প্রোফেসর বিলাতে বস্ত্ররঞ্জন দ্রব্য শিখে এসেছিলেন।

বণিককে আমার গাছ নিয়ে তাঁর কাছে যেতে বলেছিলাম। দিন সাত পরে বণিক ফিরবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি শুধালাম, "আপনি শিবপুরে কোথা ছিলেন? আহারাদির কষ্ট হয় হয় নাই ত? লোকটি অত্যন্ত ভদ্র, প্রথমে কিছু বলেন না। পরে বললেন, "আমার কোন কষ্ট হয় নাই, সাতদিন পাকাকলা আর ডাব খেয়ে ছিলাম। অন্ন-পাকের সুবিধা হয় নাই। যে দোকানে যাই, সেইখানেই দেখি, সব উনানে মাছ রান্না হয়ে থাকে।" শুনে আমার দুঃখ হ'ল।

বাঙ্গালী সধবা নারী সাদা শাড়ী পরেন, কিন্তু সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রঙ্গীন শাড়ী; প্রায়ই গাঢ় রক্তবর্ণ, কদাচিৎ সবুজ রঙ্গীন শাড়ী পরতেই হবে, সাদা শাড়ী পরা বিধবার লক্ষণ। পূর্বকালে বাংলাদেশেও এই বিধি ছিল তার প্রমাণ, দুর্গাপ্রতিমায় লাল শাড়ী পরাইতে হয়।

আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা তাম্বুলপ্রিয় ছিলেন। আমরা আহারের পর তাম্বুল চর্বণ করি। তাম্বুলের ১৪টি গুণ এমন প্রসিদ্ধ যে, ১৪ সংখ্যা জানাতে হ'লে তাম্বুল-গুণাঃ বললেই চলত। ইদানীং তাম্বুলপর্ণের আর এক গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে 'ভাইটামিন-এ' নামক পোষদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা শুধু তাম্বুলপর্ণ ভক্ষণ করি না। এর সঙ্গে সুধাচূর্ণ, খদির, গুবাক, ধন্যাক, মধুরী, যমানী, এলা, লবঙ্গ, কর্পূর ইত্যাদি যোগ করলে সজ্জিত তাম্বুলের গুণগ্রাম বেড়ে যায়। মুখ-মারুত সুরভিত হয়, সুন্দরীদের অধর-ওষ্ঠ পক্ববিম্ববৎ রক্তিম হয়। আধুনিকারা পান ছেড়েছেন, কারণ, মেমেরা খান না। মেমেরা ঠোঁটে লাল রং মাখেন, আধুনিকারাও মাখতে আরম্ভ করেছেন।

অতি অল্প ব্রাহ্মণ আহারের পর হরীতকী ভক্ষণ করেন, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। নিমন্ত্রণের ভোজনের পর তাম্বুল দিতেই হ'ত, নচেৎ ভোজন ব্যর্থ। বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক এলে তাঁকে পান দিয়ে অভ্যর্থনা

করতে হ'ত। কাকেও কোন কাজে নিযুক্ত করতে হ'লে তার হাতে পান দিতে হ'ত। অদ্যাপি বিবাহাদি শুভকর্মে আমরা যাঁকে নিমন্ত্রণ করতে চাই, তাঁর বাড়ীতে পান-গুআ অথবা কেবল গুআ পাঠাই। তিনি পান-গুআ কিম্বা গুআ নিলে বুঝতে হয়, তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন। বরণডালায় ২১টি দ্রব্যের মধ্যে পান একটি। পূর্বকালে রাজারা যেখানেই যেতেন, এক তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে যেত। এখনও সেকেলে রাজারা যেখানে বসেন, সেখানে এক ভৃত্য তাম্বুলকরঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক এক প্রয়োজনে এক এক আচারের উৎপত্তি হয়। বহু কালান্তরে লোকে উৎপত্তি ভুলে যায়, কিন্তু পারম্পর্যক্রমাগত আচাব আমরা এখনও পালন কবি। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, আমাদের জীবনের তিন প্রধান ঘটনা। প্রত্যেক জাতির এই তিন ঘটনার সহিত বহুবিধ আচার সংযুক্ত হয়ে আছে। এই তিন আচার লক্ষ্য করলেই এক জাতিকে অন্য জাতি হ'তে পৃথক করতে পারা যায়।

হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে, আত্মা স্বর্গে চলে যায়। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি জাতি শবদেহ মাটিতে পুতে রাখে। তাদের বিশ্বাস, আত্মা সেখানেই থাকে।

বিবাহ ব্যাপার নরনারীর জীবনের চিরস্মরণীয় মহোৎসব। সকলেই চায়, বর-বধূ সুখে থাক। বিবাহের যত কিছু অনুষ্ঠান, সব মাঙ্গলিক। ঋগ্‌বেদে সূর্যার বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু কি আচারে হয়েছিল তা' নাই। অথর্ব বেদে সূর্যার বিবাহ বর্ণনায় কয়েকটি আচারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কয়েকটা আমরা এখনও পালন করছি। যেমন, কন্যার গাত্রমল দূর করা, এটি আমাদের কন্যার গাত্রহরিদ্রা। তারপর উষ্ণোদকে ও শীতোদকে কন্যাকে স্নান করান হ'ত। সে স্থলে এয়ো স্ত্রীরা

পাঁচ কিম্বা সাত পুষ্করিণীর জল সইতে যায়, মঙ্গলবাদ্য বাজতে থাকে। পাঁচ বা সাত পুকুরের জল, মনে করতে হবে, পঞ্চ বা সপ্ততীর্থের জল ইত্যাদি। সহরে জলসহা নাই। কুআর জল কিম্বা চৌবাচ্চার জলে পুরাতন আহ্লাদকর অনুষ্ঠান লুপ্ত করেছে। ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যার বিবাহ হয়েছিল। সে নক্ষত্রে এখনও আমাদের বিবাহ প্রশস্ত। দিবারাত্রির কোন্ সময়ে বিবাহ হয়েছিল, তার উল্লেখ নাই। কিন্তু সূর্যার বিবাহ প্রকরণ বুঝতে হ'লে গোধূলিতে বিবাহ মানতে হবে। এখনও গোধূলিতে বিবাহ প্রশস্ত মনে করা হয়।

বর সভায় বসবার একটু পরে তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেয়ে পুর-স্ত্রীরা স্ত্রী-আচার করেন। সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রবীণা নারী আচার্যা। প্রত্যেক পাড়ার, জাতির ও কুলের আচার ভিন্ন ভিন্ন। আচার্যাদের মুখ-নির্গলিত শাস্ত্রের একচুলও এদিক ওদিক হবার জো নাই। বর বাটনা-বাটা শিল কিম্বা যাঁতার এক পাটির উপরে দাঁড়ায়। কোনও শাস্ত্র মতে জল দিয়ে, কোনও শাস্ত্রমতে দই দিয়ে তাব পা ধোয়ান হয়। ক'লকাতার বর মোটর-গাড়ীতে যেমন কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়, অমনই তার নামবার জায়গায় রাস্তায় এক কলসী জল ঢেলে দেওয়া হয়। অথর্ব বেদে এই আচার লিখিত হয়েছে, কিন্তু সে সবের অর্থ রূপক হয়ে গেছে। সেখানে কন্যা শিলায় আরোহণ করে। বোধহয় এই আচার আরম্ভকালে বর শিলায় দাঁড়াত, তার পা ধুয়ে দেওয়া হ'ত, পায়ে কাদা হ'ত না। অথর্ববেদ অন্ততঃ চারি হাজার বৎসরের পুরাতন। তার কতকাল পূর্ব হ'তে এই সব আচার চলে' আসছিল, কেউ বলতে পারে না। কন্যা যাতে সৌভাগ্যবতী হ'তে পারে, সেই কামনায় স্ত্রী-আচারের উৎপত্তি। কিন্তু প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অর্থ বুঝতে পারা যায় না।

ঋগ্‌বেদের কালে গোধূলি-সময়ে বিবাহ হ'ত। সূর্যার বিবাহ এই* সময়ে হয়েছিল। সে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের কথা। সে

সময়ে একটি তারা ধ্রুব হয়েছিল, অর্থাৎ নিশ্চল থাকত। তারই নিকটে একটি ছোট তারা আছে, সে সন্নিকটে থেকে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করত। এই হ'তে বৈদিক কালে বিবাহের একটা আচার দাঁড়িয়েছিল, বর বধূকে ধ্রুব দেখাতেন। অর্থাৎ, বর ধ্রুবতারা দেখিয়ে বধূকে বলেন, "আমি ধ্রুব, আর তুমি ঐ ছোট তারা, সর্বদা আমাব অনুগত হয়ে থাকবে।" এই আচার অদ্যাপি ব্রাহ্মণের বিবাহে প্রচলিত আছে। এই হ'তে এক স্ত্রী-আচার দাঁড়িয়েছে। বর দাঁড়ায়, কন্যা পীঁড়িতে বসে, আর দুই নারী পীঁড়ি তুলে বরের চারিদিকে সাত বার ঘুবায়। বর ধ্রুবতারা, কন্যা তার সন্নিহিত ছোট তাবা। কিন্তু বহুকাল হ'তে সে তারার আর ধ্রুবত্ব নাই, তাকে কেউ চেনেও না। বহুকাল পরে, আর দুইটি তাবা, বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী, দেখাবার রীতি দাঁড়িয়েছিল। বসিষ্ঠ সপ্তর্ষিব একটি তারা। তার নিকটে একটি ছোট তারা আছে, সে বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী। বসিষ্ঠ অন্য তারাব মত ঘুবতে থাকে, অরুন্ধতীও তার নিকটে থেকে ঘুরতে থাকে, কখনও বসিষ্ঠকে ত্যাগ করে না। কবি-কঙ্কণ চণ্ডীতে বিবাহের পর বসিষ্ঠ অরুন্ধতী প্রদর্শনের কথা আছে।

চতুর্বর্ণের এক এক বর্ণের বিশেষ বিশেষ আচার আছে। বিবাহেব পর ধ্রুব-প্রদর্শন ব্রাহ্মণাচার বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ-বালকেব উপনয়ন-কালে তা'কে শাণ বস্ত্র অর্থাৎ শণ-নির্মিত বস্ত্র পরতে হয। এই শণ ভঙ্গা বা সিদ্ধি গাছ। এর অংশুতে বস্ত্র হ'ত। ঋগ্‌বেদের কালে আর্যেরা এই বস্ত্র পরতেন। বহুদিন হ'তে আমরা সে বস্ত্র দেখতে পাই না। তার পরিবর্তে এখন ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নকালে চেলী পরতে দেওয়া হয। ওড়িশ্যার সে শণকে পীতপুষ্প শণ মনে করে' এই শণের সূতায় নির্মিত ছোট কাপড় পরতে দেওয়া হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন-কালে অন্য কাপড় পরবার ব্যবস্থা ছিল।

আমরা মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ সবাই জানি। কোনও ব্রাহ্মণের

মৃত্যু হ'লে তাঁর পরিবার দশ দিন অশুচি থাকেন। সে সময়ে সে বাড়ীতে ধোপা-নাপিত যাবে না, গ্রামের অপর লোকও যাবে না। ধোপা-নাপিত দ্বারা রোগ সঞ্চারিত হয়। সে বাড়ীর ব্রাহ্মণকে অন্য জাতিরা প্রণামও করবে না। অর্থাৎ, দশ দিনের জন্য সে পরিবারের অস্তিত্ব নাই, মনে করা হয়। এই আচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কোন সংক্রামক রোগে মৃত্যু হয়েছে, ধরে' নেওয়া হয়। যাতে গ্রামে সে রোগ ছড়িয়ে না পড়ে, সেই অভিপ্রায়ে সমগ্র পরিবারকে অশুচি মনে করা হয়। এখন ডাক্তারেরা সে পরিবারের পৃথক্ বাসের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য একই। অবশ্য, সকল রোগই সংক্রামক নয়, কিন্তু, কে ডাক্তার ডেকে রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করবে? ব্রাহ্মণেরা সর্বদা শুচি থাকতেন। তাঁদের দশ দিন পৃথক্ বাসই যথেষ্ট। শূদ্রেরা অশুচি থাকত, তাদের পক্ষে এক মাস অশৌচ পালন বিহিত হয়েছিল। কারও অপঘাত মৃত্যু হ'লে, যেমন জলে ডুবে, গাছ হ'তে পড়ে' বাড়ী চাপা পড়ে' ইত্যাদিতে মৃত্যু হ'লে অশৌচ নাই।

বাড়ীতে শিশুর জন্মের পূর্বে সূতিকা-গৃহ নির্মাণ করতে হয়। প্রসূতি এবং ধাই ব্যতীত অপর কেহ সে গৃহে যেতে পারে না। কিছুদিন পর্যন্ত বাড়ীসুদ্ধ সবাই অশুচি। সে সময় ধোপা-নাপিতও যায় না। এখানে প্রসূতি ও শিশুকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে তাদের পৃথক্ বাস বিহিত হয়েছে।

আমাদের অনেক লোকাচার আছে। আমাদের অধিকাংশ পার্বণ লোকাচার। অম্বুবাচী পালন একটা প্রসিদ্ধ লোকাচার। যেদিন সূর্যের দক্ষিণায়ন হয়, সেদিন অম্বুবাচী। সেদিন মনে করা হয়, বর্ষাঋতুর আরম্ভ। বর্তমানে ৭ই।৮ই আষাঢ় অম্বুবাচী। পৃথিবী জলময় হয়। নানাস্থানের অশুচি জল একাকার হয়। শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ ও বিধবা পাক্‌দ্রব্য ভোজন করেন না, ফল-মূল ও কাঁচা দুধ খেয়ে থাকেন। ঠিক

কোন্ দিন দক্ষিণায়ন, সন্দেহ হ'তে পারে, এই কারণে তিন দিন অম্বুবাচী। এই তিনদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ, ক্ষেতে জল দাঁড়িয়ে যায়। বিল হ'তে সাপ বেরিয়ে ঘরে আশ্রয় নেয়। রান্নাঘরের মেঝে প্রায়ই নীচু হয়, সাপ রান্নাঘরের উনানে গিয়ে থাকে। সাপের জন্য বাটীতে দুধ রাখা হয়, সাপ গৃহস্থকে কামড়াবে না। উদ্দেশ্য এইরূপ, কিন্তু সকলে বুঝে না।

অরন্ধন এরই অনুরূপ আর এক লোকাচার। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। সেদিন কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে উনান জ্বালা হয় না। লোকে পূর্বদিনের পক্ব অন্ন ভোজন করে। সেদিন মনসা-পূজা। মনসা সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উনানে পাতা-মনসা গাছের ডাল রেখে সাপের উদ্দেশে দুধ ঢেলে তাঁর পূজা হয়। দেখা যাচ্ছে, এই আচার বর্তমানের অম্বুবাচী দিনের অনুরূপ। অতএব, বহুকাল পূর্বে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে অম্বুবাচী হ'ত। সে বহুকাল বড় অল্প নয়। অম্বুবাচীর দিন ভাদ্র-সংক্রান্তি হ'তে বর্তমানে ৭ই আষাঢ়ে পেছিয়ে এসেছে। একমাস পেছিয়ে আসতে প্রায় দু-হাজার বছর লাগে। ২ মাস ২৩ দিনে কত হাজার বছর, হিসাব করে' দেখুন। কত পূর্ব কালের স্মৃতি আমরা এখনও আচাররূপে পালন করছি!

একটা বিধি আছে, আমরা সবাই মানি, উত্তর কিম্বা পশ্চিম শিয়রে শুতে নাই। অর্থাৎ লোকে দক্ষিণ দিকে কিম্বা পূর্বদিকে পা রেখে শোয় না। এই বিধির হেতু অজ্ঞাত। বোধ হয়, এইরূপ কারণ ছিল,—ঋগ্‌বেদের আর্যেরা বিশ্বাস করতেন দক্ষিণ-স্বর্গে পিতৃলোক এবং যজ্ঞকালে দেবতারা পূর্বস্বর্গ হতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সূর্য এক প্রধান দেবতা, তিনি পূর্বদিক হতে আসেন। কাজেই সেদিকে পা রেখে শোবার জো নাই। আমরা গ্রীষ্মকালে বাতাস চাই, তৎকালে সে বাতাস দক্ষিণ বা পূর্বদিক হতে আসে। সে বাতাস মাথা হতে পায়ের দিকে বয়ে যায়, ইহাই সুখকর।

একটা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। যখন গিরিজা-পুত্র গণেশের জন্ম হয়, সকল দেবতাই শিশুকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু শনি আসেন নাই। শনিকে ডাকা হ'ল। আর যেমন তাঁর দৃষ্টি শিশুর প্রতি পড়ল, অমনই তার মুণ্ড উড়ে গেল। হাহাকার উপস্থিত। হরির বুদ্ধিতে গণেশের নূতন মুণ্ড হ'ল। দেখা গেল, সেই রাত্রে শ্বেত ঐরাবত উত্তর শিয়রে শুয়েছিল। তার মুণ্ড কেটে এনে গণেশের মুণ্ড করা হ'ল।

কারণ ব্যতীত কার্য্য নহে কদাচন।

গণেশের শ্বেত গজমুণ্ড হবার কারণ কি? যেহেতু শ্বেত ঐরাবত উত্তর শিয়রে শুয়েছিল। সেই দোষে তার প্রাণ বিয়োগ হ'ল। গণেশের মানুষ-মুণ্ড কেন উড়ে গেল? অবশ্য কারণ আছে। সে কারণ, শনির দৃষ্টি। এই পৌরাণিক উপাখ্যানে শনির দৃষ্টি আর ঐরাবতের উত্তর দিকে শির রেখে শোয়ার ফল, দুই-ই প্রতি-পাদিত হয়েছে। এই উপাখ্যানটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে।

উত্তর শিয়রে শুলে স্বাস্থ্য-হানি হ'তে পারে, ইহা অসম্ভব নয়। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যশোর-নিবাসী সীতানাথ ঘোষ মেডিকেল কলেজে তিন-চারি বৎসর পড়ে' কলিকাতায় রোগীর দেহের চারিদিকে তাড়িত-প্রবাহ চালিয়ে তার চিকিৎসা করতেন। তিনি Animal magnetism নামে এক বই লিখেছিলেন। সে বই-এর শেষদিকে রোগ, রোগীর নাম-ধাম, ও কতদিন প্রবাহ চালিয়ে রোগী নীরোগ হয়েছিল, সে সব বিবরণের এক তালিকা দিয়েছিলেন। পড়লে আশ্চর্য বোধ হ'ত। তাঁর তন্ত্রের মূল-সূত্র এইরূপ ছিল,—মনুষ্য-দেহ এক চুম্বক। চুম্বক-দণ্ডের যেমন উত্তর-মুখ ও দক্ষিণ-মুখ থাকে, মনুষ্যদেহের মাথায় ও পায়ে সেইরূপ আছে। যখন আমাদের দেহের চৌম্বক ধর্মের সাম্য থাকে, তখন আমরা নীরোগ থাকি। যদি কোন কারণে সাম্যের হানি হয়, তা হ'লে রোগ উৎপন্ন হয়। পৃথিবী

এক বিশাল চুম্বক। ইহারও দুই মেরুর দিকে দুই মুখ আছে। ইহা বিজ্ঞানে সুপরিজ্ঞাত, সকলেই জানে। দুই মুখ আছে বলে'ই সূত্র-লম্বিত চুম্বক-শলাকা উত্তর-দক্ষিণে স্থির হয়। উত্তর-শিয়রে শুলে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব-হেতু মনুষ্য-দেহের চৌম্বকত্ব বিপর্যস্ত হয়। তাঁর মতে এই কারণেও রোগ উৎপন্ন হয়। রোগীর দেহ বেষ্টন করে' তাড়িত-প্রবাহ চালিত করলে সামঞ্জস্য আসে। বর্তমান চিকিৎসা-বিদ্যায় এই মত সমর্থিত হয় কি না, বলতে পারি না। তবে, ফলেন পরিচীয়তে, এই নীতি অনুসারে তাঁর তন্ত্র মিথ্যা বলতে পারি না।

ইংরেজদের নিকট হ'তে আমরা দু-একটা আচার ধরেছি। ধন্য বড়লাট কার্জন সাহেব, যিনি চা-বণিকদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বঙ্গের গ্রামে গ্রামেও চা-পান প্রচলিত করে' গেছেন। গ্রামের লোকে নিজেরা চা খায়, বন্ধু এলে তাকেও চা দিয়ে সমাদর করে। এখন চা-ই পুরাকালের 'অর্ঘ্য' হয়েছে।

বড় বড় অনুষ্ঠানে আমরা ইংরেজী আচার অনুকরণে প্রয়াসী হয়ে থাকি। ইংরেজেরা ১লা জানুআরি নূতন বৎসর গণে, আর সেই উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধবাদিকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানায়। অতএব আমাদিগকেও ১লা বৈশাখ বন্ধুদিকে নমস্কার ও তাদের শুভ-কামনা করতে হবে। সভা আহ্বান করলে বিলাতী আচার অনুসারে সভার অনুষ্ঠানের মধ্যে দু-টি নূতন পদের আবির্ভাব হয়েছে। এতদিন সভাপতি ও সম্পাদক দ্বারা কার্য নির্বাহ হ'ত। এখন একজন উদ্‌বোধক চাই, আর একজন 'প্রধান অতিথি' সভার কার্যের প্রশংসা করতে নিমন্ত্রিত হন। অতিথিই বটে! তাঁকে ডেকে ডেকে আনতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে চা ও সিগারেট জোটে না।

আমরা আচার পালন দ্বারা নানা নৈমিত্তিক কর্ম সম্পন্ন করছি। কবে উৎপত্তি জানি না, কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অনেক দিন হ'ল, বৈরাগ নামে আমার এক মালী ছিল। সে

মালীর কর্ম কিছুই জানত না, সে গ্রামবাসী, চাষবাস করতে জানত। বয়স পঞ্চাশ। লোকটি সজ্জন, শিষ্ট ও বিনীত। একদিন গ্রীষ্মকালে, বোধ হয় বৈশাখ মাসের শেষাশেষ, বেলা দুটা-আড়াইটার সময় আমি ইজি-চেয়ারে শুয়ে একখানা বই পড়ছি। কি কারণে মালী সে ঘরে এসেছিল।

"মালী, লোকে ধানের বীজ ফেলেছে কি?"

"আজ্ঞে, এখনও রোহিণী উদয় হয় নাই।"

"রোহিণী উদয়?"

"আজ্ঞে, আছে।"

দেখি, সে মুখ টিপে হাসছে।

"রোহিণী উদয় কি?"

আজ্ঞে, আছে।"

বোধ হয়, সে ভাবলে, যে রোহিণী-উদয় জানে না, তাকে সে কেমন করে' বুঝাবে? সে আর কিছু না বলে' ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। আমি এখানকার আচারজ্ঞ একজনকে শুধিয়ে জানলাম, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী-উদয়। সেদিন কৃষক প্রাতঃস্নান করে' শুচি হয়ে ফুল, সিঁদুর, আলোচাল ও ফলমূল নিয়ে তার ক্ষেতে যেয়ে পূজা করে। তারপর খানিক জমি কোদাল দিয়ে কুড়ে ধানের বীজ ছড়িয়ে দেয় ও ক্ষেত্রকে প্রণাম করে। যদি সে ক্ষেত পূর্বে লাঙ্গল-করা থাকে, তাতেই বীজ ছড়ায়। একদা ঋগ্‌বেদের ঋষিগণও ক্ষেত্রপতির প্রসাদ প্রার্থনা করতেন, আর ক্ষেত্রপতির প্রসাদে প্রচুর শস্য উৎপাদন হবে, দৃঢ়স্বরে আবৃত্তি করতেন। এইদিন যেমন-তেমন দিন নয়। যে শস্য দ্বারা কৃষক সপরিবারে সম্বৎসর জীবিত থাকবে, যেদিন সেই শস্য বপনের আরম্ভ, সেদিন পুণ্য দিন। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবি রোহিণী নক্ষত্রে গমন করেন, সেটা পাঁজি হ'তে জানি। কিন্তু কে বা পাঁজি দেখে, কে বা বুঝে? রোহিণী উদয় কৃষকমাত্রেই বুঝতে

পারে। রোহিণী উদয়ের দিন আরও কয়েকটা অনুষ্ঠান আছে। যেমন, ঘরের চালের ঈশান কোণে শাওড়া গাছের ডাল গুঁজে দিলে সে ঘরে বাজ পড়ে না, ইত্যাদি।

যে আচারই দেখি, প্রত্যেকের প্রয়োজন হয়েছিল। কালে কালে আচারের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আচার পালন ব্যতীত কোনও জাতি আপনাকে স্থির রাখতে পারে না। আচার দ্বারাই প্রত্যেক জাতি জাতিস্মর হয়ে আছে। নব্যেরা মনে করে, হিন্দুরা আচারের জন্যই অধঃপাতে গেছে। তারা জানে না, ইংরেজের মত আচার-রক্ষণশীল জাতি আর একটি নাই। নূতন রাজার অভিষেক হবে, বড় বড় পণ্ডিত শাস্ত্র উল্টাতে থাকেন। তাঁর কি রকম বেশ হবে, কে কি মন্ত্র পাঠ করবেন, সে-সব উত্তমরূপে বিচার ও তাদের মোহড়া চলতে থাকে। খ্রীষ্টের জন্মদিনে এক প্রকার পিষ্টক ভক্ষণ করতে হবে, গৃহিণীরা সে পিষ্টকের আয়োজন করতে থাকেন, সেদিন অন্য পিষ্টক চলবে না। কত সামাজিক আচার আছে, তার একটু এদিক-ওদিক হবার জো নাই। তদ্দ্বারা সামাজিক পবিত্রতা, দেহের ও মনের স্বাস্থ্য, ঐতিহ্য ও সৌজন্য রক্ষিত হয়। নরনারীর সম্পর্ক পবিত্র রাখবার জন্য প্রত্যেক জাতি কতকগুলি বিধি-নিষেধ পালন করে। যদি অন্য জাতির নরনারী-সম্পর্কিত আচার গ্রহণ করতে হয়, তার বিধি-নিষেধও গ্রহণ করা উচিত। সামান্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সাঁওতাল নারী তার পুরুষ সঙ্গে না থাকলে একা কোথাও কাজ করতে যায় না। যে দরিদ্র নারী কায়িক শ্রমদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, সে কারও বাড়ীতে রাত্রিবাস করে না। সন্ধ্যার পূর্বেই নিজের ঘরে যায়। দক্ষিণ ভারতে নারী ঘোমটা দেয় না। কিন্তু পর পুরুষের সম্মুখে নিম্নদৃষ্টি হয়ে শালীনতা রক্ষা করে। পূর্বকালে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে দরিদ্র নারী চরকায় সূতা কেটে রাজ-ভাণ্ডারে এনে বিক্রয় করত। নিয়ম ছিল, সে সন্ধ্যার পর আসবে। ক্ষীণ আলোকে

ভাণ্ডারী সূতা ওজন করে' নিত, নারীর মুখের দিকে চাইলে ভাণ্ডারী দণ্ড পেত।

আচারই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। তুমি সে আচার মেনে চল, তুমি ঠিক থাকবে, তোমার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ হবে। কালের অনুপযোগী আচার আপনিই খসে' যাবে। কিন্তু প্রয়োজন না বুঝে বল-পূর্বক ত্যাগ করবে না।

নরনারীর কর্মভেদ

অসাম্যে সৃষ্টি

কেহ কেহ সৃষ্টিতে সাম্য কল্পনা করিতে ভালবাসেন, দুই একটা বিষয়ে সাম্য দেখিয়া সকল বিষয়ে সাম্য অনুমান করেন। নিজের রচিত রূপক ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহারা প্রতারিত হইয়া মনের তৃপ্তি অনুভব করেন। যথা, যেহেতু ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, অতএব তাঁহার সৃষ্ট রাম ও শ্যাম সমান। রাম দুধে-ভাতে আছে, শ্যাম না থাকিলে সেটা রামের দোষ। যেহেতু নর মানুষ, নারীও মানুষ; অতএব নর ও নারী সমান। অতএব উভয়ের শিক্ষা ও বিদ্যা সমান হওয়া চাই, উভয়ের কর্ম ও অধিকার সমান হওয়া চাই। এইরূপ ভুল সিদ্ধান্ত হেতু কত অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে, যেটা যার প্রাপ্য নয়, সেটা সে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে অসন্তোষ জন্মে, এবং অসন্তোষ জন্মিলে মনের সুখ চলিয়া যায়।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝি, অসাম্যই জগতের স্থিতির কারণ। সাম্য অর্থে লয়, অর্থাৎ সৃষ্টি-লোপ। পশ্চিমদেশের বহু বিজ্ঞ, ধন-সাম্য ও জন-সাম্য ঘটাইবার প্রয়াসে প্রচলিত রাজ-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র বিপর্যস্ত করিতেছেন। হয়ত, কিছুদিন কিয়ৎ পরিমাণে ধন-সাম্যের উদ্যম সফল হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহার স্থায়িত্ব কল্পনা করিতে পারি না। কারণ বিধাতা সাম্যের বিরোধী। রাম ও শ্যাম জন্মে সমান নয়, দেহে নয়, মনেও নয়। কাজেই ধনে ও অধিকারে সমান করিয়া দিলেও বহুদিন সমান থাকিবে না, একের প্রভুত্ব ও অন্যের দাসত্ব ঘটিবেই ঘটিবে। কতক লোক হীনবুদ্ধি হইবেই, কতক লোক দুর্বল হইবেই। পূর্বে দাস দাসী বিক্রয় হইত, এখনও হইতেছে, মাত্র সে নামে নয়। এখন সে কলের কুলী।

পূর্বকালের সমাজ-ব্যবস্থা পূর্বকালের উপযোগী ছিল। ইহার অর্থ এমন নয় যে, সমাজে সনাতন বিধি নাই, সবই কাল-সাপেক্ষ। দেশধর্ম ও কালধর্ম ব্যতীত সাধারণ মনুষ্যধর্ম আছে। মনুষ্যধর্ম সনাতন। অন্য দুই ধর্মের ভেদ ঘটে। ধর্মশাস্ত্রকারও যুগে যুগে ধর্মের ভেদ স্বীকার করিয়া একই দেশের পক্ষে নূতন নূতন বিধি করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য আচার ব্যবহার এ দেশে চলিতে পারে না। কারণ সে দেশ, সে দেশ; এ দেশ, এ দেশ। ভারতীয় নরনারী যুগযুগান্তরগত স্মৃতি ভুলিতে পারিবে না। কৃত্রিম উপায়ে ভুলাইতে গেলে তাহাদের সত্তাই থাকিবে না। আর, যদি সত্তাই যায়, তাহা হইলে থাকেই বা কি? কি ধরিয়া বিধি ব্যবস্থা? কি ধরিয়া সুখ-দুঃখ চিন্তা? আমি, আমি, এই জ্ঞান লুপ্ত করা অসম্ভব। আর, আমি'র পশ্চাতে যে কত ভূতকাল প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে, তাহার লোপ করা, আর নূতন সৃষ্টিতেও অসাম্য ও অশান্তি থাকিবেই থাকিবে।

নরনারীর ধর্ম

। নরনারীর ভেদ বিধাতার কৃত। মানুষের কৃত হইলে মানুষ তাহার পরিবর্তন করিতে পারিত। বিধাতার ইচ্ছা সৃষ্টি; তিনি কেবল নরের দ্বারা কিংবা কেবল নারীর দ্বারা প্রজা সৃষ্টি না করিয়া যুগল মিলন অবশ্যম্ভাবী করিয়াছেন। দুই সমানের মিলন নয়, দুই অসমানের মিলন, যেন অযস্কান্তের দুই অসম মুখের মিলন। কোন কোন বিজ্ঞ মনে করেন, নারী যদি সমাজ-শাসন লিখিতেন, তাহা হইলে নরের অধিকার খর্ব, নারীর অধিকার দীর্ঘ হইত। মানব-সমাজের আদিম অবস্থায়, কোথাও কোথাও স্ত্রীরাজ্য ছিল, কিন্তু, সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম। অধিকাংশ স্থলে পুরুষ-রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্বকালে মায়ের

নাম উল্লেখ দ্বারা পুত্রের নির্ণয় হইত। যেমন, কৌশল্যানন্দন রাম, কুন্তীপুত্র অর্জুন, ইত্যাদি। ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে, নারী প্রখ্যাতা হইতেন। বস্তুতঃ ঠিক বিপরীত। এক পতির অনেক পত্নী থাকিত বলিয়াই মাতৃনামযোগে পুত্রেব পরিচয় হইত। সকলেই জানেন বহু-পত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্রের পরিচয় করিতে হইলে, অমুক নারীর পুত্র বলা আবশ্যক হইত। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, নারী প্রধানা হইতেন। যে সমাজেই দেখি, নারী প্রধান হইতে পারে নাই, নব পারিযাছিল। অতএব নারীকে নর খর্ব করিয়া রাখে নাই, নাবী নিজেই নবের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

ইহার কারণ একটু বুঝিযা দেখা যাউক। প্রথমে নরের ও নারীর লক্ষণ বিবেচনা করি। নর-জাতিতে অধিকাংশ নরের গুণ বর্তমান। এইরূপ, নারীজাতিতে অধিকাংশ নারীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। নর-ও নারী-জাতি কেমন ? নারী স্থিতিশীল, নর ব্যয়শীল, নারী স্থৈর্য ও ধৈর্য্যের মূর্তি, নর বিপরীত ; সে চঞ্চল ও অধীর। কেবল মানুষে নয়, যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদে নর নারীর এই বিরুদ্ধ গুণ বর্তমান। নর জনক, নারী পোষয়িত্রী ; নর বীজ, নারী ক্ষেত্র ; পুত্রজন্ম দ্বারা উভয়ের সমাপ্তি। সৃষ্টির এই মূল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ। ইহার ফল নরনারীর সম্পর্কে সমাজ-শাসনে ছড়াইযা পড়িয়াছে। যথা, নর ভর্ত্তা, নারী ভার্যা ; নর পতি, নারী পত্নী ; নর স্বামী, নারী স্ত্রী ; নর সহকাররূপ আশ্রয়-তরু, নারী নবমালিকারূপ লতাবধূ। নর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে, নারী নরের সেবা করিবে ; নর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবে, নারী গৃহস্থিতি সাধন করিবে। হিন্দুশাস্ত্রকার বিধাতার এই বিধান স্বীকার করিয়া নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেন নাই। কারণ বিধাতাই নারীকে "অবলা" করিয়াছেন অবলার স্বাতন্ত্র্য তাহার স্থিতির প্রতিকূল। আধুনিক কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, নারীর ব্যভিচার-শঙ্কায় হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে স্বাতন্ত্র্য দেন নাই।

সে শঙ্কা ছিল না বলিতে পারা যায় না। কিন্তু অবলার রক্ষক যে চাই, তাহাও ত অস্বীকার করিতে পারা যায় না। স্ত্রী-রক্ষা সকল সমাজেই প্রধান ধর্ম। আদর্শ নারীর সুখেরও ইয়ত্তা নাই। কৌমারে পিতামাতার স্নেহের, যৌবনে পতির প্রেমের, বার্দ্ধক্যে পুত্রের ভক্তির পাত্রী হইয়া তাহার জীবন সুখেই কাটে।

নর-ও নারী-জাতির যে গুণ, তাহাতে নরের বহুপত্নী থাকা আশ্চর্যের নয়। অবশ্য যে-সে নর বহু পত্নী করিতে পারে না; কেহ কেহ এক পত্নীও পায় না। নারীর কিন্তু এক পতি। একদা তাহার বহুপতি হইবার জো নাই। কারণ সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলেই এই ধর্ম চাই। গৃহ এবং গৃহিণীর একদা বহু স্বামী হইলে গৃহই টেকে না। অতএব পতিপ্রাণা সতীনারী যত, বোধ হয় পত্নীপ্রাণ সৎ নর তত নাই। পতির সহমৃত নারী হইত, পত্নীর সহমৃত নর হইত না। পত্নীর বিরুদ্ধে পতির ব্যভিচার বরং ক্ষন্তব্য ছিল, পতির বিরুদ্ধে পত্নীর ছিল না। এ বিধি নরের প্রণীত নহে। স্বাভাবিক বলিয়া সকল সমাজেই মানিয়া লইয়াছে। শাস্ত্রকার স্বভাবের বিপরীত বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন না; পারেন, যে প্রবৃত্তি আছে, তাহার সংযমের উপদেশ করিতে। যে সমাজে বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ নিন্দনীয় নয়, সে সমাজেও সকল বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না। তাহার পুত্র থাকিলে দ্বিতীয়পতিগ্রহণে তাহার আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। তা ছাড়া, অনন্যপূর্বা কন্যা সুলভ হইলে বিধবাবিবাহে নরও ইচ্ছুক হয়না। ইহার কারণও স্পষ্ট। দুই পক্ষেই বাধা থাকাতে কোন দেশেই বিধবার বিবাহ অধিক দেখা যায় না। অসম্ভাব্য ও অহেতুক কল্পনা দ্বারা দুই এক জন চালিত হইতে পারে, সকলে নয়। দয়ার্দ্র চিত্তে করুণার কষ্টের তুল্য আর কষ্ট নাই। দুর্ভিক্ষে, অনাহারে কঙ্কালপ্রায় নরনারীর মূর্তি যে দেখিয়াছে সে ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু মানুষের এমন সাধ্য নাই যে, সকল নরনারীকে উত্তম ভোজ্য দান করিতে পারে। কতকলোক কষ্ট

পাইবেই; সুখের ভাগ সকলের কদাপি সমান হইবে না। অবীরা বিধবার দুঃখে কে না দুঃখিত হয়। এখানে কারুণ্যের কথা নয়, বাস্তবের কথা হইতেছে। বিপত্নীক পুরুষ যে সুখী, তাও নয়। সে সংসারে উদাসীন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়-দারপরিগ্রহ করিলেও সে সুখী হয় না, অস্বস্তি ও অতৃপ্তি বোধ করিতে থাকে। এইরূপ, বোধ হয়, বিধবা নারীও দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করিলে মনে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না।

পশ্চিম দেশে গান্ধর্ব বিবাহ বিবাহের একমাত্র বিধি। সে দেশের যে সংবাদ পাই, তাহাতেও সকলের শান্তি নাই। সে দেশের বাল্য শিক্ষা ও নরনারীর ভেদ অস্বীকার, এই দুই মিলিয়া অনেক কন্যাকে অনূঢ়া রাখিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র নর-নারীর ভেদ স্বীকার করিয়াও করেন নাই, নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেন নাই, বরকন্যার পরস্পর অনুরাগকে বিবাহের ঘটক করেন নাই। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জ্ঞানের অধীন করিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহের অন্য পথ আদৌ ছিল না। এ বিষয় পরে অন্য প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

নরনারীর শিক্ষা ও বিদ্যা ভেদ

যে মানুষ সুখ-দুঃখ বোধ করে, সেই বলিতে পারে। আমরা মনে করি আমার যাহাতে সুখ বা দুঃখ, অন্যেরও তাহাতে সুখ বা দুঃখ হয়। কিন্তু এটা স্থূল কথা। পশ্চিম দেশের নারী মনে করে, হিন্দুনারীর দুঃখের অবধি নাই, কারণ সে পিঞ্জরাবদ্ধ, বহুকুটুম্ববেষ্টিত, ব্রতনিয়মক্লিষ্ট, হয়ত বা সপত্নীর ঈর্ষানলদগ্ধ। বিধবা জীবন্মৃত হইয়া পরের দাসীবৃত্তি করিতে থাকে। এইরূপ উক্তি হইতে বুঝি, পশ্চিম দেশের নারীর পক্ষে এ দেশ অন্ধকার। বাহ্য দেখিয়া অভ্যন্তর অনুমান করিতে পারা যায় না। হিন্দুনারী অসুখী বা অসন্তুষ্ট হইলে হিন্দুর সংসার-যাত্রা অসম্ভব হইত।

আর, হিন্দু পুরুষ-জাতিকে নিষ্ঠুর এবং নারী-জাতিকে মৃদু মনে করাও ঠিক নয়। পশ্চিম দেশীয়া নারী শুনিয়াছেন কি "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"। যেখানে নারীদিগের পূজা আছে সেখানে দেবতারা প্রসন্ন।* শিক্ষা ও আচারগুণে যদি অধিকাংশ নরনারীর জীবনযাত্রা সন্তোষে নির্বাহ হইতে পারে, তাহাতে ক্ষোভের বিষয় কি আছে? সুখ-দুঃখ পরিমাণের বিষয় নয়, মনের অবস্থা। গো-যানে ভ্রমণে সুখ নাই, ভ্রামক-যানেই সুখ, এ তর্ক নিষ্ফল। গো-যান-আরোহণে হর্ষ নাই, কয়েক দিন পরে বিমানেও হর্ষ মিলিবে না। পুরুষ এক-পত্নীক হইলেই যে পরদারাসক্ত হয় না, তাহা ত নয়। আর, পরদারাসক্ত না হইলেও যে সংযতেন্দ্রিয় হয়, তাহাও ত নয়। হিন্দুশাস্ত্র এক-পত্নীক পুরুষের পক্ষেও সংযম উপদেশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন সে পুরুষও ব্রহ্মচারী নামে আখ্যাত হইতে পারে।

নরনারীর সাম্যদর্শী মনে করেন, নারীকে স্বাধীনতা না দিয়া চিরকাল শিশু করিয়া রাখাতে হিন্দুনারীর মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ কথা যদি বা বর্তমান কালে খাটে, পূর্বকালে হিন্দুর স্বাধীনতার সময়ে খাটিত না। হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী নারী অশ্বারোহণ পূর্বক বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। শুধু বঙ্গ নয়, ভারতের নানা স্থানে হিন্দু নারীর শৌর্যের ও কর্তৃত্বের পরিচয় আছে। কেহ কেহ বড় বড় রাজ্যশাসন করিয়াছেন। তাঁহাদের পতিপ্রাণতারও তুলনা নাই। হিন্দু পুরুষ অজ্ঞান শিশু নয়। কে তাহাদের গৃহস্থিতি ও মতিগতি অদৃশ্যভাবে নিয়মিত করিতেছেন? নরনারীর স্বাধীনতার সীমা থাকিবেই। এক

---

* মনুতে এইরূপ বচন আরও আছে। তন্ত্রেও আছে। যথা, মহানির্বাণ তন্ত্রে, "ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা", কদাপি ভার্য্যাকে তাড়না করিবে না সতত মাতার ন্যায় পালন করিবে। ইত্যাদি।

হাত বড় কিংবা এক হাত ছোট, প্রভেদে নরনারীর বিধাতৃ-বিহিত অ-সাম্য কদাপি লুপ্ত হইবে না।

স্বাধীনতার সীমানির্দেশ কোনও একজন করে না; করে সমাজ। আর, সমাজতন্ত্র ও জনতন্ত্র একই। জনের মতেই সমাজ চলে, ইহার নাম লোকাচার। কেহ কেহ আচার নামে কুসংস্কার ভাবিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। মনে করেন, এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি বিহঙ্গমের ন্যায় উড্ডীন হইতে পারিবেন। বালকেরা কাগজের ঘুড়ী উড়ায়। একদা ঘুড়ী ভাবিয়াছিল, সুতা না থাকিলে ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিতে পারিত। লোকাচার বন্ধন বটে, কিন্তু সেই বন্ধন-সূত্রই মানুষকে উচ্চ করিয়াছে। বিনা কারণে কার্য্য হয় না, আচারও হয় না। এক কারণে সব আচার আসে নাই, এবং আচারের মধ্যে শিষ্টাচার আছে। ইহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কিন্তু দেশজ্ঞ অক্লেশে বুঝিতে পারেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী পাঠ না পড়িয়া যুক্তিতর্কে না গিয়া যে স্বচ্ছন্দে ধর্মাধর্ম নিরূপণ করিতেছে, তাহা এই সদাচার শিক্ষার গুণে। কুসংস্কার নাই, এমন নহে; নারী রক্ষণশীলা বলিয়া নানা কালের সু-কু-শঙ্কা তাহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে হিন্দু-নরও বড় কম নহে। তথাপি সব আচার কুসংস্কার নহে। এই শব্দটির মধ্যে আমাদের চিন্তার দুর্বলতা ও আমাদের বর্তমান ইংরেজী শিক্ষার ফলস্বরূপ পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবৃত্তি কতখানি, তাহাও স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর্তব্য। ইংরেজী শিক্ষার অর্থ, ইংরেজী আচার ব্যবহার শিক্ষা, ইংরেজী সভ্যতা-শিক্ষা। আমরা অসভ্য ছিলাম, সভ্য হইতেছি। কিন্তু এই সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা পরস্পর বিপরীত বলিলেও চলে।

নববিবাহিত বর তাহার বধূর অন্তর জানিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই ইন্দ্রজালই প্রেম। সে অন্তর যদি অন্নবস্ত্রের তুল্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিত, প্রেমও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইত। পশ্চিম দেশে বিবাহের পর নবদম্পতী "মধুমাস" ভোগ করিতে বসেন। বোধ হয় সে মধুমাস অচিরে শেষও

হয়। এদেশে নবোঢ়া কন্যা বহুকাল যাবৎ পতির সম্মুখে দিবাভাগে বাহির হয় না, উভয়ের মধুমাসও শেষ হয় না। যখন হয়, তখন নব-শিশু আসিয়া উৎসবের আর এক পর্ব আরম্ভ করে। শিশুটি কার অধিকারভুক্ত, কেহ বলিতে পারে না।

আমাদের দেশে নারী স্বামী-সম্মুখে আহার করেন না। নব্য শিক্ষিত মনে করেন, কি কুসংস্কার! কিন্তু বোঝেন না, জীবনরক্ষার ব্যাপারগুলি একেবারে বাস্তব। বাস্তব স্পর্শে মায়াময়ী প্রতিমা ভগ্ন হইয়া যায়। সে কল্পনা রক্ষার নিমিত্তে নারী অবগুণ্ঠনবতী হইয়াছিল। বোধহয় প্রথমে শীর্ষাবগুণ্ঠন নরের উষ্ণীষস্থানীয় হইয়াছিল; এবং পরে মুখাবগুণ্ঠন দ্বারা নারীর ভূষণ যে লজ্জা, তাহার সার্থকতা হইয়াছে। এই কারণে স্থানও অন্তঃপুরে, এবং অন্তঃপুর ও বহিঃপুর সকল জাতির মধ্যে আছে। ইহার অর্থ এমন নয় যে, নারী বাহিরে আসিতে পাইবে না। বঙ্গদেশে তাহাই ঘটিয়াছে; নারীর অনিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাকে রক্ষিতা করিতে গিয়া অরক্ষিতা অগতিকা করা হইয়াছে। কিন্তু দেশাচারের এমনই প্রভাব, একা একা প্রাচীর লঙ্ঘনের উপায় নাই। আশ্চর্য এই, যেখানে দস্যুর ভয় নাই, সেখানেও নারী বাহিরের বাতাস গায়ে লাগাইতে পায় না। এটা নরের গতানুগতিকতার ফল।

এমন সমাজ-ব্যবস্থা, এমন শিক্ষা চাই, যাহা দ্বারা অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন সহজ হইতে পারে। ইহার প্রথম সোপান, পুত্র ও কন্যার কর্মভেদ-স্বীকার। শাস্ত্র লিখিয়াছেন, "পুত্র আত্ম-সদৃশ, কন্যাও তদবৎ।" তথাপি কন্যা, পুত্র নহে, পুত্রবৎ। এই হেতু, পুত্রকন্যার কর্মক্ষেত্র এক নয়। নরনারীর কর্মভেদ মানিলেই শিক্ষায় ও বিদ্যায় ভেদ মানিতে হয়। কর্মভেদ আছে, অথচ দুই কর্ম পরস্পর-সাপেক্ষ, এক গার্হস্থ্য ধর্মের দুই অঙ্গ। যদি নরনারী এক পূর্ণের দুই অর্দ্ধাংশ, তাহা হইলে যে বিদ্যায় নরের প্রয়োজন, সে বিদ্যায় নারীর

প্রয়োজন থাকিতে পারে না। বিদ্যা ব্যতীত কলাও আছে। উভয়ের শিক্ষণীয় কলাও এক হইতে পারে না। গার্হস্থ্যধর্ম শ্রেষ্ঠ আশ্রম। বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে সে আশ্রমের যোগ্য হইতে পারে, তাহাদের তদনুরূপ শিক্ষা আবশ্যক। বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষা এক বস্তু নয়। অশ্বকে নানাবিধ গতি শিক্ষা দেওয়া হয়, কেহ তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে যায় না। তন্ত্রে আছে, কন্যাকেও গুণশিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস করাইতে হইবে। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" এই তন্ত্রেই আছে, পিতা পতিমর্যাদানভিজ্ঞা, পতিসেবানভিজ্ঞা ও ধর্মশাসনভিজ্ঞা বালিকার বিবাহ দিবেন না। বিদ্যাভ্যাস না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সদাচার না করিলে জীবনরক্ষা দুর্ঘট। আমাদের শাস্ত্রে যে সদাচার সেই ধর্ম, যে ধম সেই সদাচার। সদাচার শিক্ষা হইলে বিনয় ও সংযম শিক্ষাও হয়। সদাচার জীবনতরীর কর্ণ। বেদে নারীর অধিকার ছিল না, কাজেই বেদের অঙ্গ-উপাঙ্গেও ছিল না। বেদই বিদ্যা; আধুনিক ভাষায় বলা যাইতে পারে উচ্চ বিদ্যা। এ সকল আয়ত্ত করিতে কষ্ট পাইতে হয়। সে কষ্টের উপর মাতৃত্বের কষ্ট নারীর পক্ষে বিষম হইয়া উঠিত। তা ছাড়া, বিদ্যামাত্রেই সকলের কাম্য নয়, যাবতীয় জ্ঞানও নয়। আর, কে বা সব বিদ্যা অভ্যাস করিতে পারে? এই বিবেচনায় নারীর উপনয়ন অনাবশ্যক হইয়াছিল। মায়ের সন্ধ্যাবন্দনার সময়ই বা কই? তা ছাড়া, উপনয়নের উপায়ও ছিল না। গুরু-গৃহে বাস করিতে না পারিলে উপনয়ন হয় না। যুবতীর পক্ষে পরগৃহে বাস গর্হিত।

নরনারীর সাম্যপ্রয়াসী বলিতেছেন, "নারীর হাতে জ্ঞানবর্তিকা দেওয়া হয় নাই; পাছে নারী নিজের আসন নিজে পাতিয়া বসেন। বিদ্যার দ্বার নারীর কাছে উন্মুক্ত কর, কেবল আচার ও ব্রত-নিয়মে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিও না। তাহাতে নরেরও ক্ষতি। মনের দোসর না হইলে উভয়ের প্রীতি হয় না। নরের সুখও পদে পদে বাধা পাইতে থাকে।"

কিন্তু সদাচার কেবল নারীর ধর্ম নয়, নরেরও ধর্ম। নরকেও ব্রতনিয়ম করিতে হইবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকন্যাকে এমন বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কে শিষ্য বা শিষ্যা কি উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জনের চেষ্টা, এই দুই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ও বিদ্যার ভেদ স্পষ্ট হইবে। যাহারা বিদ্যার্থে বা কলার্থে বিদ্যা বা কলা অভ্যাস করেন, তাঁহারা করুন! কারণ বিদ্যার্থে বা কলার্থে ন্যস্ত-জীবিতের সংখ্যা নগণ্য। তাহারা গৃহী না হইলেই ভাল, অন্য একটিকে অসুখী করা অন্যায়ও বটে। কিন্তু সংসারিকের পক্ষে ভাবিতে হয়, কেন বিদ্যা চাহিতেছি, বিদ্যার প্রয়োজন কি? কেহ অন্নচিন্তায়, কেহ সুখচিন্তায়, কেহ বা উভয়চিন্তায় বিদ্যা ও কলা সহায় করিতে যায়। নারীর অন্নচিন্তা নাই, সে চিন্তা নরের। অতএব অন্নসংগ্রহের উপায়-স্বরূপ যে যে বিদ্যা আছে, সে সে বিদ্যা নরকে অভ্যাস করিতে হইবে। ইঞ্জিনিয়ারি, কি বেরিষ্টারি, কি কৃষি, কি বাণিজ্য, নারীর কর্ম নহে, তাহার অধিকারের বহির্ভূত। ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীকে ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যা জানিতে হইবে, কি ঐতিহাসিকের পত্নীকে ঐতিহাসিক হইতে হইবে, নইলে উভয়ের মনের মিল হইবে না, এটা প্রেমবাক্যের কথা নয়। মনের দোসর আর কর্মের দোসর, একব্যক্তি নয়। এক করিতে গেলে বরং হিতে বিপরীত হইবে। কবির স্ত্রীও যদি কবি হন, তাহা হইলে গদ্য লিখিবে কে? কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন; রাধাও বাঁশী বাজাইলে কে কার বাঁশী শুনিতেন? হয়ত বাঁশী দিয়া ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হইত। স্ত্রী পুরুষের ধর্ম ও কর্ম বিভিন্ন; একের অভাব অন্যে পূরণ করে বলিয়াই পরস্পরের আকর্ষণ হয়। অয়স্কান্তের সম-মুখে আকর্ষণ নাই, অসম-মুখেই পরস্পর আকর্ষণ। সদাচারে অবশ্য উভয়কে সমান হইতে হইবে। এবং সমান হইলেই স্ত্রীকে বলি সহধর্মিণী। শিশুকাল হইতে আরম্ভ না করিলে আচার ও সংযম শিক্ষা হয় না। নারীর কর্মক্ষেত্র, গৃহ। বচন আছে, গৃহ গৃহ নয়,

গৃহিণীই গৃহ। গৃহে তাহার পূর্ণ অধিকার। ধনরক্ষা ও ব্যয়ে, গৃহের শৌচে ভর্তাদির অন্নসাধনে, গৃহোপকরণ-অবেক্ষণে, ভৃত্য পোষণে, অতিথি অভ্যাগতের সৎকারে, এক কথায় গৃহস্থালিতে, নারীর অধিকার, নরের নাই। এই কর্মবিভাগ বহু বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, নর-নারীর কলহ হয় নাই, নারীর অধিকার গ্রহণ নর করে নাই।

এখানে তার্কিক বলিতেছেন, "কি? ভাত রান্না, ঘর ঝাঁটানা, ছেলে কোলে করা, কাঁথা সেলাই করা, এই সব নীচ কর্ম করিতে বুঝি নারীর জন্ম হইয়াছে? নর পায়ের উপর পা দিয়া দিব্য আরাম করুন, ত্রিসন্ধ্যা চর্বচোষ্য ভোজন করুন, আর নারী দিন রাত খাটিতে থাকুন।"

ইহার উত্তর কিন্তু সোজা। পুরুষ দুষ্টামি করিয়া কর্মভাগ করে নাই। দাস দাসী না থাকিলে পতিপত্নীকেই গৃহস্থালি ভাগ করিতে হয়। যে কর্মে যে যোগ্য, যে কর্মে যার প্রবৃত্তি, সে কর্ম সে করে। লঘু কর্ম নারীর, গুরু কর্ম নরের। আর, নারী যে ঘর করে, বাঁধে বাড়ে, কার জন্য করে? ছেলে কোলে করিয়া কে অসীম সুখ অনুভব করে? নারী অন্নপাক করেন, কারণ তেমন পাক আর কেহ পারিবে না। নিজের জন্য যে কর্ম, সেটায় উচ্চ নীচ কি আছে? ঘরে চা'ল ছিল না, পার্বতী হরকে দুকথা শুনাইয়া দিলেন। হর ভিক্ষায় বাহির হইলেন। হর বলিতে পারিলেন না, "দেখ পার্বতী, আমি কার্ত্তিক গণেশ রাখিতেছি, তুমি ভিক্ষা আন।" এই বিপরীত ব্যাপার কোন সমাজে দেখা যায় না। চাকরি করিতে হয়, নর করিবে, অপমান সহিতে হয় সে সহিবে; নারী সে অপমানে যাইবে না। অন্নের তরে দস্যুতা করিতে হয়, পুরুষ করিবে; স্ত্রী জেলে যাইবে না। নারীর এত সমাদর, জন্মগত অধিকার, পশ্চিম দেশে নাই। সে দেশের পুরুষগুলা দুর্মনুষ্য, নারী দুর্ভগা। দেশে ধনের সংখ্যা নাই, তথাপি পুরুষ নারীর অন্ন জোটাইতে পারে না, নারীকে

চাকরি করিতে পাঠায়! নারীর এত লঘুতা, আশ্চর্য এই, নারী মনে করে স্বাধীনতা!

অন্নচিন্তার পর সুখচিন্তা। দেহের ও মনের সুখ সকলেই অন্বেষণ করে। দেহের সুখ-বিধানের নিমিত্ত আয়ুর্বেদ রচিত হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা নামে তাহার যৎকিঞ্চিৎ শেখানা হইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা নয়, স্বাস্থ্যবিধান জানা কর্তব্য। কন্যারও যথাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস ও যুদ্ধশিক্ষা আবশ্যক। ব্যায়াম দ্বারা দেহ সুগঠিত হয়, যুদ্ধশিক্ষা দ্বারা আত্মরক্ষায় সামর্থ্য হয়। সদাচারের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান আছে। শৈশব হইতে অভ্যাস না করিলে সে আচার প্রকৃতিগত হয় না। কিন্তু সদাচারের নামে কদাচারও চলিয়াছে, বিদ্যা—সে দুয়ের প্রভেদ দেখাইয়া দেয়।

মনের সুখ-বিধানের নিমিত্ত বিদ্যা ও কলা চাই। কিন্তু কে কোন্ বিদ্যা, কোন্ কলা, এবং কোন্টার কতখানি অভ্যাস করিবে? সীমা নির্দেশ চিরকাল দুরূহ। তবে সাধারণতঃ বলিতে পারা যায়, যেটার অনুশীলনের সম্ভাবনা নাই, সেটা শিখিয়াও ফল নাই। গৃহস্থের যেটায় প্রয়োজন ঘটে না, সেটার অনুশীলনও আবশ্যক হয় না। দেশের ইতিহাস ও ভূগোল, স্মৃতি ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা আমাদের জীবন-প্রবাহ স্বখাতে চলিতেছে। দেশের বর্তমান আইন-কানুনও কিছু কিছু না জানিলে জীবনরক্ষা দুষ্কর। গণিত বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। এই এই বিষয়ে নরনারীর বিদ্যার ভেদ নাই।

এখানে অধিক লিখিবার স্থান নাই। কিন্তু কন্যা-শিক্ষার বর্তমান রীতি অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। ইস্কুলে যে শিক্ষানীতি চলিতেছে, সেটা ইংরেজী, আমাদের পক্ষে অনুপযোগী। এতদ্দ্বারা আমরা ইংরেজী সভ্যতা ও ভব্যতা শিখিতেছি, চতুর হইতেছি, কিন্তু ওজোহীন ও তেজোহীন হইয়া পড়িতেছি। বাক্-চাতুর্য ও কর্ম-চাতুর্য এক বস্তু নয়। পুরুষ লম্বশাটপটাবৃত হইলে তত ক্ষতি হয় না, মাত্র নিজের

আত্মার দৈন্য প্রকাশিত করে। কিন্তু নারী, যাহার হাতে সংসারের আয়, ব্যয় ও স্থিতি, তাহাকে বাল্যকাল হইতে ময়ূরপুচ্ছ কুড়াইতে শিখাইলে শ্রী পলায়ন করেন। কলিকাতা বঙ্গদেশ নয়, বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ নয়। তথাপি ইংরেজী সভ্যতার এমনই আকর্ষণ, যে গ্রামিক, সেও নাগরিক হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্র বালক-বালিকার পক্ষে ভোগ অনুমোদন করেন না। বিদ্যার্থীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য বিহিত করিয়াছেন। যুক্তিও তাই বলে; প্রকৃতি বালক বালিকাকে ভোগবিলাসী করেন নাই। বাল্যে ও কৈশোরে ভোগে রাখিলে যৌবনে ভোগতৃষ্ণার উপশান্তি সহজে ঘটে না। সকল বালিকা শ্রেষ্ঠীকন্যা নয়, কিংবা সকলে প্রচুর ধনশালীর গৃহিণী হইবে না। আমাদের দীন-দুঃখীর দেশে বিলাতী অনুকরণ পীড়া-দায়ক। এই জন্যই অনেকে বালিকার বিদ্যাশিক্ষার বিরোধী। তাঁহারা কন্যা-শিক্ষার বিরোধী নহেন, বিরোধী ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণের।

অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত পিতা মনে করেন, শিশুপুত্রকে শীঘ্র শীঘ্র ইংরেজী ভাষা শিখাইলে, পরে সে ইংরেজী ভাষা-প্রয়োগে দক্ষ হইয়া উঠিবে। পুত্রের পক্ষে এই অবিবেচনার যদি বা কিছু হেতু আছে, বালিকার ইংরেজী শিক্ষার কিছুই হেতু পাই না। দুপাতা ইংরেজী পড়িয়া কি ফল? তাহার মাথায় একটা অনাবশ্যক ভার চাপাইয়া তাহাকে ক্লান্ত করা কেন? প্রয়োগ-অভাবে যে বিদ্যা অন্তর্হিত হয়, তাহার সঞ্চয়-প্রয়াস মূর্খতা। ফলের মধ্যে হয়, বিদেশী ভূতে পাইয়া বসে, শিক্ষিতা বলিয়া গর্ব জন্মে। এমন বৃথা কর্মে সময়ের অপব্যয় হেতু যাহা শিক্ষণীয়, তাহা শেখা হয় না। আশ্চর্যের কথা, গৃহস্থের পক্ষে যেমন গণিতের প্রয়োজন, তেমন গণিতের সঙ্গে বালিকার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। চাউলের মণ ছয় টাকা হইলে এক সের চাউলের দাম কত? কে জানে। বর্তমান শিক্ষা-নীতিতে শুভঙ্করীর স্থান নাই, আছে

গ, সা, গু, ইত্যাদির। যে ভূগোলজ্ঞান নইলে আমাদের বাসস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায় না, সংবাদপত্র পড়া সাধ্য হয় না, যে ঝড়-বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, কে বা সে সংবাদ রাখে। এক পাতা জ্যামিতি, দুপাতা বিজ্ঞান বালিকাকে কেন যে পড়ান হয়, কে জানে? বুদ্ধির বিকাশ ও পর্যবেক্ষণের শক্তিলাভ চাই বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত অপ্রয়োজনীয় বিদ্যার অভ্যাস আবশ্যক নাই। আমাদের দেশীয় নীতি, প্রথমে শিক্ষা (practice), পরে বিদ্যা (theory)। বর্তমান শিক্ষা-নীতিতে বিপরীত ক্রম চলিতেছে, প্রথমে কারণ, তারপর কার্য। যে কোন পাঠ্যপুস্তক দেখি, তাহাতেই সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব! গণিতের বইতে দেখি, প্রথমে সংজ্ঞা, পরে অঙ্ক কষা। ভূগোলে দেখি, প্রথমে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ, তারপর জল স্থলের বর্ণনা। ইতিহাসে দেখি, প্রথমে দেশের আদিম অধিবাসীর কথা, পরে বর্তমান। উদ্ভিদবিদ্যায় দেখি প্রথমে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম, পরে বীজ। ইত্যাদি ক্রম-বিপর্যয়ে বালক-বালিকার বিদ্যা বীজবপনেই সমাপ্ত হয়, ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে প্রবেশ, বিদ্যা উপার্জনের এই সনাতন নীতি, তাহার লঙ্ঘন হইতেছে। জ্ঞানী বিবেচকও বালিকার নিমিত্ত ইংরেজী ইস্কুল খুলিতেছেন! দশ বার বৎসর বয়সে যাহার পাঠ সমাপ্ত হয়, তাহাকে স্থায়ী বিদ্যা দান কর্তব্য। পাঁচ হইতে বার বৎসর, এই সাত বৎসর বাল্যশিক্ষার পক্ষে অল্প নহে। আর, যে কন্যা সংবাদপত্র পড়িয়া বুঝিতে না পারে, তাহার বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হয় নাই।

যাঁহারা কন্যার শিক্ষা ও পাঠ অধিক ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ভাবা উচিত, কেমন ঘরে কেমন বরের সহিত কন্যার ভাগ্য জড়িত হইবে। বরের বিদ্যার ও বৃত্তির পরিধি অনুমান না করিয়া কন্যার শিক্ষার ও বিদ্যার পরিধি বাড়াইতে থাকিলে কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হয়।

নির্বোধ বরও আছে, বধূর জ্ঞানে ও ধনে নিজে জ্ঞানী ও ধনী মনে করে। কিন্তু কন্যার পিতামাতা নির্বোধ হইলে তাহাঁদিগকেই কৃতকর্মের অনুশোচনা করিতে হয়। কন্যা যেমন ঘরের ঘরণী হইবে, তাহাকে তদুপযোগী করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আচারের ও গৃহস্থালী কর্মের মূলে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যা সম্যক্ অধ্যয়ন করিতে বহু বৎসর কাটিয়া যায়। বালিকারা অন্নব্যঞ্জন পাক করিতে শেখে, সেটা কলা। কিন্তু সে কলার অন্তর্নিহিত বিদ্যা কে শেখে? ব্যঞ্জন পাক, মিষ্টান্ন পাক ইত্যাদি নামে বই আছে। কিন্তু তাহাতে সূদ-বিদ্যার কিছুমাত্র নাই। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, সবাই জানে। কিন্তু এই এই নিত্যকর্মের বিদ্যা কয়জন জানে? মহাভারতের আখ্যান সবাই জানে। কিন্তু মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ সমগ্র বুঝিতে পারেন, এমন পণ্ডিত অল্পই আছেন। ভগবদ্-গীতারই ব্যাখ্যা কত আছে। শ্রীমন্তের মশান অনেকে জানেন। কিন্তু কবিকঙ্কণচণ্ডী বুঝিবার বিদ্যা অল্পেরই আছে। কন্যাকে ইংরেজী-বিদ্যার বিদুষী করিতে হইলেও তাহাকে প্রথমে ভারতীয় বিদ্যা শিখাইলে সে ভারতীয় থাকিয়া যাইবে, নিত্য জীবনে সে বিদ্যার প্রযোগ পাইবে।

কিন্তু কয়টি কন্যার জন্য এই চিন্তা? দেশের লক্ষ লক্ষ কন্যা যে শিক্ষা পাইলে প্রতি ঘরের শ্রী বর্ধিত হইত, সে শিক্ষা চাই। দেশের দুরদৃষ্ট, যাহারা তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাঁরা কলিকাতায় প্রাসাদে বাস করেন, ইংরেজী সভ্যতায় পালিত হইয়াছেন। তাহাঁরা দেশের দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করেন নাই। জানেন না কি কষ্টে দেশের নরনারীর দিনপাত হয়। দুঃখী নারীর বিলাতী বাদ্য কিনিবার অর্থ কই, বাজাইয়া গান করিবার অবসর কই? অবসর কালে যদি চরকার করুণ স্বর শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে ধন্য, লজ্জা-নিবারণের উপায় হয়। যদি দুটা শাগ-পাতা জন্মাইতে শেখে, তাহা হইলেই

বাঁচিয়া যায়, যদি ফুলগাছ রুইতে শেখে, পূজাপার্বণে ফুলের অভাব ঘটে না। চিত্রকলা জানিতে হইবে, কেননা চিত্র নইলে মাঙ্গলিক কর্ম হয় না। আলিপনা করা তাহার কাম্য নয়, আলিপনা যে কর্মের অঙ্গ সেটাই কাম্য। কান্তজ্ঞান জন্মাইবার বহুবিধ উপায় আছে, কিন্তু সেটা 'উল'-বোনা নয়, 'উল'-বোনা আসনে বসিতে পারে, এমন স্বামী-ভাগ্য কয়জনেরই বা আছে? যে গৃহ গোময়লিপ্ত, তাহাতে কম্বলাসনই শোভা পায়। এই আসন বুনিতে শিখিলে কন্যার কান্তজ্ঞান জন্মে, শিক্ষাও নিত্য প্রয়োজনে আসে।

কিন্তু মনে করি যেন গীতবাদ্যাদি কান্তকলা অভ্যাস করিবার অবসর ও অর্থ আছে। এই সকল কলা ললিত বলিয়াই নারীর কর্ম। এ সকলের দ্বারা আত্মবিনোদনও হয়। অতএব নরের ও অধিকার আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, পরের অনুরাগ-আকর্ষণ সঙ্গীত-কলার অভিপ্রায়। নৃত্যগীতবাদ্য এই তিনে সঙ্গীত। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন, মনের আনন্দে বিজন বনে নয়, ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে, ময়ূরীর সম্মুখে। নর শেখে নারী ভুলাইতে নারী শেখে নর ভুলাইতে। আমাদের দেশে বর যুবতীর পূর্বরাগ নাই, গীতবাদ্যাদির প্রধান নিমিত্তই নাই। পবিত্র মনোরঞ্জন নিমিত্ত গীতবাদ্য মন্দ নয়। শুভকর্মে ও কৌতুকমঙ্গলে গীত চাই। কিন্তু সে নিমিত্ত কলাবতী হইবার প্রয়োজন দেখি না। মনে রাখিতে হইবে, একে কলা, তায় কান্ত। অল্পেই মত্ততা আসে। বাস্তবিক ব্রহ্মচর্যের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া কান্তকলার শিক্ষা দেওয়া যেমন-তেমন কর্ম নয়।

কর্মের বৈচিত্র্য, মনের স্ফূর্তি অবশ্য চাই। কিন্তু সেটা আসে নিমিত্ত ধরিয়া। আর, হিন্দুর নিমিত্ত যত আছে তত, তত আর কাহারও নাই। ইংরেজী শিক্ষিত নর-নারী দেশ-ছাড়া হইয়া পড়িতেছেন। দেশে থাকিলে দেখিতেন, জীবনটা উৎসবময়। আর, নারী দেখিতেন উৎসবমাত্রেই কর্ত্রী তিনি। 'পত্নী' নামের আদিম অর্থ এই ছিল। অর্থকষ্ট হেতু

উৎসবগুলি আচার-রক্ষায় দাঁড়াইয়াছে; তথাপি যাহা আছে তাহার তুলনা পাই না। ইংরেজের নাই, এমন দীনজাতি আর দেখিতে পাই না। তাই সান্ধ্যগোষ্ঠী ও আপান অন্বেষণ করে। মুখে বলে, "নারী উত্তমার্ধ"; কিন্তু কাজে উত্তম অধম কিছুই নয়, নারী এক স্বতন্ত্র জীব। পতি-সৌভাগ্য ঘটিলে সে গৃহের কর্ত্রী হয়। কিন্তু হিন্দুনারীর সে সৌভাগ্য না ঘটিলেও সে কর্ত্রী। জন্ম-গত আর ভাগ্য-গত অধিকারে যে আকাশ-পাতাল অন্তর!

কিন্তু তর্ক এই, "নারীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া তাহার স্বাধীনতা লুপ্ত করা হইয়াছে, তাহার জ্ঞানের প্রসার ও ভোগের বিষয় হ্রাস করিয়া দুষ্ট পুরুষ নিজের স্বার্থ দেখিয়াছে।"

কিন্তু সেই একই তর্ক পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে। বাস্তবিক, পুরুষ ও নারীর স্বার্থ বিভিন্ন কি? দুইটি কি সমান্তরাল রেখা দূরে দূরে চলিয়াছে, মিলিত হয় নাই? এ যে বাম চক্ষুর সহিত দক্ষিণ চক্ষুর কলহ। বাম চক্ষু বলিতেছে, "দেখ, তুমি বড় স্বার্থপর। আমায় দক্ষিণ পার্শ্ব দেখিবার অধিকার দেও নাই, আমি কি চিরদিন বামপার্শ্বই দেখিতে থাকিব?" দক্ষিণ চক্ষু বলিতেছে, "আমিও ত বাম পার্শ্ব দেখিতে পাইতেছি না, তুমি ও আমি দুইজনে মিলিয়া দৃষ্টি পূর্ণ করি। তুমি না থাকিলে আমি অপূর্ণ, আমি না থাকিলে তুমি অপূর্ণ।" অর্ধাঙ্গের এমন সোজা অর্থ পশ্চিম-দেশের নারী বুঝিতে পারিতেছে না। অর্ধনারীশ্বর প্রতিমাও দেখে নাই। একাই কখন বাম, কখন দক্ষিণ হইয়া অসাধ্য সাধনে প্রয়াসী হইতেছে। ফলে, নারীত্বের মহিমা হারাইতেছে। দেশাচারের এমনই প্রভাব!

ইহারা কিন্তু উপরের বর্ণিত আদর্শের ব্যতিক্রম। ইহারা দেহে নারী, মনে নর। কাজেই বৃত্তিতে নর-তুল্য। ইহারা কা-নারী। নরের মধ্যেও এইরূপ ব্যতিক্রম আছে। দেহে নর, কিন্তু প্রকৃতিতে নারী। ইহারা কা-নর। এমনও আছে, দেহ দেখিয়া নর কি নারী

বুঝিতে পারা যায় না। সৃষ্টির মধ্যে এই সকল ব্যতিক্রম দ্বারা সমাজ-বিধির ও নর-নারীর সুখসৌভাগ্যের ভেদ ঘটে, এবং তাহাদের কর্ম নির্দেশ করিতে গিয়া সমাজ-সংস্থাপক আকুল হইয়া পড়েন। আমি বিলাত দেশ দেখি নাই, কিন্তু এদেশেই বিলাতী নারীর বর্তমান বেশ দেখিলেই মনে হয়, নরত্বলাভের প্রতি তাহার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। নর কিন্তু নর-বেশেই আছে, স্বীয় বৃত্তি করিতেছে, নারী নর-বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। নারীর এই যে পরাভব, তাহাতেই সে নরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছে। আশ্চর্য এই, ইহাতে তাহার মনোভঙ্গ না হইয়া দর্প জন্মিয়াছে। ইহা সাম্য নয়, উচ্চ ও নিম্নের মিলন নয়; উচ্চ উচ্চেই আছে, নিম্ন ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া আছে। এটা ঠিক, নরবৃত্তি করিতে করিতে নারীবৃত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে। প্রকৃতির ক্ষীণ সূত্র ক্রমশঃ স্থূল হইয়া কালে দেহও নরপ্রায় হইয়া যাইবে। জীব-রাজ্যে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়। অযোগ কিংবা অতিযোগ হেতু দেহের বিকৃতি ঘটে। তেমনই বৃত্তি-বিশেষের অপ্রয়োগ কিংবা অতিপ্রয়োগ হেতু সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। মনুষ্যরূপধারী জীবের কেহ শৌর্যবীর্যপূর্ণ নর; কেহ রোদন-পরায়ণ নারীস্বভাব; কেহ পূর্ণ নারী, কোমলতা ও মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি; কেহ বা নরভাবাপন্ন, পুরুষোচিত কর্ম করিতে ব্যগ্র হয়। ইহারা ক্ষিপ্র ও সদা অসন্তুষ্ট। কাজেই ইহারা গার্হস্থ্য আশ্রম ভয় করে, বিবাহকে বন্ধন মনে করে। অথচ মাতৃত্বের ও পতিসেবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পরের সন্তান লালনপালন করে, অন্যের সেবা স্বধর্ম জ্ঞান করে। মধুমক্ষিকা সমাজের এইরূপ ভাগ সকলেই জানেন। একভাগ সমাজের দাস বা দাসী হইয়াছে। আমাদের দেশের অনেকে বিধবা এই শ্রেণীর কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা দশা-বিপর্যয় হেতু, প্রবৃত্তি-হেতু নয়।

বর্তমানকালে এদেশে নারীর অধিকার-বৃদ্ধি কিংবা স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া

যে তর্ক আরম্ভ হইয়াছে, স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝি সেটা পশ্চিমের তরঙ্গ। যতদিন পিতা ও ভর্তা হিন্দুনারীকে স্ব-ধর্মে রাখিবেন, তাহার স্থায়ী সুখশান্তি চিন্তা করিবেন, ততদিন এই তরঙ্গের আস্ফালনে বিপুল হিন্দু সমাজের কেশাগ্রও বিচলিত হইবে না। স্বধর্মে অবস্থিত নারীর অধিকার-অনধিকার শুনিতে পারি; কারণ সেটার নিষ্পত্তি আছে। কিন্তু স্বাধীনতার নিষ্পত্তি নাই।

সেদিন "সঞ্জীবনী"তে পড়িতেছিলাম, কলিকাতায় কয়েকজন ভদ্রমহিলা সবপ্রকাশ সভা-মধ্যে নৃত্য ও নাট্য করিয়াছিলেন। আরও আশ্চর্য তাঁহারা নৃত্যকলা প্রদর্শন করিতে বেতন লইয়াছিলেন, সে বেতন নিজের বসন-ভূষণে ব্যয় করুন বা অন্যকে দান করুন। বিলাতী সমাজে নর-নারীর একত্রে নৃত্য দূষ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু বেতন লইয়া নৃত্য, থিয়েটারের নটনটীদেরই কর্ম। এদেশেও নট, নটী ও গণিকা নৃত্য ও নাট্য দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। পূর্বকালে নটনটী পৃথক জাতি ছিল। তাহারা সৎ ও সতী ছিল না। কুলনারী প্রেক্ষা-গৃহে যাইলে নিন্দিত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত। গণিকারা রূপবতী ও সঙ্গীত-কলাবতী হইত। ইহাদের বিবাহ হইত না, ধনাঢ্যের প্রণয়িনী হইত। পূর্বকালের দেব-দাসীরা প্রায় এইরূপ ছিল। কলা-কৌশলের নিমিত্ত তাহারা সম্মানিত হইত, কিন্তু ভদ্রগৃহে স্থান পাইত না। হিন্দুসমাজ বেশ্যা লোপ করিতে যায় নাই, কিন্তু নগর-প্রান্তে বা শাখা-নগরে তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছিল। এইরূপ, সুরাপানের নিমিত্ত শৌণ্ডিকালয় নগরের বাহিরে রাখিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্র বুঝিয়াছিলেন, কুপ্রবৃত্তির নিরোধ বহু তপস্যার ফল। তাহার নিগ্রহ সাধ্য, উচ্ছেদ দুঃসাধ্য।

সে যাহা হউক, কলিকাতায় ভদ্র-মহিলার নৃত্য ও নাট্য সংবাদ পাইয়া অনেকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছেন। কেহ বা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি, কলার্থে কলাশিক্ষা কর, মনুষ্যার্থে নয়। পূর্বকালে

পুরমহিলা নৃত্যকলা শিখিতেন, অতএব দোষ নাই, এ যুক্তি বৃথা। আমরা পূর্বকালে নাই। সাঁওতাল নারী বাঙ্গালীর উৎসবে নৃত্য দেখাইত। এখন বুঝিয়াছে, তাহাতে শিষ্টাচার রক্ষিত হয় না। বিশেষ কথা, পুরমহিলা পূর্বকালে পুরুষের সভায় নৃত্য ও নাট্য করিতেন কি? যদি বা দেশ-ভেদে ও উৎসব-বিশেষে পুরস্ত্রীর নৃত্য ও নাট্য প্রচলিত ছিল, সেটা জন-সভামধ্যে ছিল কি? থাকিলে নটনটী ও গণিকার কি বৃত্তি ছিল? দেবদাসীই বা কি করিত? নৃত্যের অঙ্গহার, ভাব-বিভাবাদি প্রদর্শন সাত্ত্বিক রসের জনক, এই বুঝিয়া মহিলা-নৃত্য প্রদর্শিত হয় নাই। শিশুর নৃত্য, নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য বটে, কলা নয়। কলার্থে কলা, কেবল পুরস্ত্রীর নৃত্য ও নাট্যে নয়, চিত্রে ও রসিকসাহিত্যে প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়াছে। ব্যপদেশ হইতেই বুঝি, ভিতরে গরল আছে, বাহ্যপ্রকাশ দ্বারা সেটা বাহির হইয়া পড়িতেছে। দুঃখ হয়, আত্মপ্রকাশ অন্য পথ পায় নাই। পিতামাতার দেখা উচিত, যাহাতে পুত্রকন্যার সম্মুখে পাপ-কলুষিত চিত্র, দৃশ্যে শ্রাব্যে, পাঠ্যে, উপস্থিত না হয়।

কালের গতি লক্ষ্য করিলে বুঝি, কুপিত হই আর অন্ধই সাজি, সমাজবিপ্লব চলিয়াছে, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কোনও বিপ্লব একাকীও আসে না। হিন্দু-মুসলমানে কলহ, হিন্দু-হিন্দুতে কলহ, শিক্ষক-ছাত্রে কলহ, ধনিক-ভৃতিকে কলহ, রাজা-প্রজায় কলহ, রাষ্ট্রনীতিতে অতিবেগ-মন্দবেগে কলহ, সর্বত্র অধিকার-বৃদ্ধির নিমিত্ত কলহ চলিতেছে। বিপ্লবকারী মাত্রেই একদেশদর্শী, কোনও একটা দুঃখের যাতনায় অস্থির হইয়া পড়েন। ইঁহারা সমাজের উপকারও করেন। গণের অগ্রগামী হইয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী স্থিরজনকে তাঁহাদের দশা দেখাইয়া সাবধান করিয়া দেন। এইরূপে সমগ্র সমাজ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে।

কন্যাদের বিবাহ হবে না ?

১

৯ই মাঘ (বঙ্গাব্দ ১৩৫৬) সরস্বতী পূজা হয়ে গেল। পরদিন সকাল বেলা একটি কন্যা আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল। সে কলিকাতায় থাকে, এক দাদার সঙ্গে এসেছিল, ফিরে যাবে। কলিকাতায় কোথায় বাসা, নরহত্যার সময় কি দেখেছিল, এই রকম দু-এক্ কথার পর সে বললে,—

"জ্যেঠামশায়, এবার যাই ?" কণ্ঠস্বরে অবসাদ।

তখন ঘড়ীতে সাড়ে ন'টা ; ট্রেন সাড়ে দশটায়।

"তোমাকে দেখলে আমার ভারি দুঃখ হয়।"

"জ্যেঠামশায়, আমি ভাল আছি।"

"আর ভাল আছ !"

"না জ্যেঠামশায়, আমি ভাল আছি। এবার যাই ?"

কণ্ঠস্বর মৃদু ও দীর্ঘ। সে চলে' গেল।

কন্যাটি আমার এক প্রতিবেশী বধূর ছোট বোন। বধূটি পুত্র-কন্যাবতী, বোন অনূঢ়া। পূর্বদিন তিনটার সময় তার দিদির সঙ্গে আমার কাছে এসেছিল। অনেকক্ষণ বধূটির সহিত কথা হ'তে লাগল, বর্তমান কন্যাদের কথা। তার বোনটি অনেক বৎসর হ'তে বেরিবেরিতে ভুগছে। কখনও একটু ভাল থাকে, কখনও থাকে না। সে বালিকা-বয়সে স্থূলাঙ্গী ছিল। এখন অতিশয় কৃশ, হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল। আমরা একটু থামলে সে বললে,—

"জ্যেঠামশায়, 'প্রবাসী'তে আপনার যত প্রবন্ধ বেরয়, আমি সব পড়ি। পূজার পর হ'তে আপনি কিছু লেখেন নাই।"

"পূজার সময় আমি ত কিছু লিখি নাই।"

"না, 'প্রবাসী'তে নয়, 'আনন্দবাজার' শারদীয়া সংখ্যায় পড়েছিলাম।

"বুঝতে পেরেছিলে ?"

"অর্ধেক পেরেছিলাম, অর্ধেক পারি নাই। জ্যেঠামশায় আপনি সোজা করে' লেখেন না কেন, আমরা যে বুঝতে পারি না।"

"আচ্ছা, লিখব। কি বিষয়ে, বল।"

"আমাদের কথা।"

"ঐটি ছাড়া আর কিছু বল। আমি কূল দেখতে পাচ্ছি না।"

চকিতে তার পাণ্ডুর মুখের উপর দিয়ে একখণ্ড পাতলা মেঘ ভেসে গেল।

পাঁচ বৎসর পূর্বে সে একবার এসেছিল। সেবার শরীর সারাবার জন্য অনেক দিন ছিল। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত; আর, বরিশালের বিবরণ শোনাত। তাদের নিবাস বরিশালে। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব হ'তে বেরিবেরিতে ভুগছিল। তার কথায়, গলার স্বরে, হাসিতে, বুঝতে পারি নাই। একদিন শুনলাম, তার এক মামাত দাদা পঁচাত্তর টাকা দামের এক ঢাকাই শাড়ী কিনে দিয়েছে। তার দাদারা তাকে খুব ভালবাসে। মেয়েটি সুশীল শান্ত ধীর, কখনও কিছু চায় না। কিন্তু তার দাদাদের স্নেহ তার উপর গাঢ় হয়েছিল। তাকে কিছু চাইতে হ'ত না। আমি শাড়ীর কথা শুনে বললাম, "পঁচাত্তর টাকা দামের শাড়ী পরলে তোমার গর্ব বাড়তে পারে, কিন্তু রূপ বাড়বে না।" পরদিন দেখি, সেই ঢাকাই শাড়ী পরে' এসেছে। কিছু বলে না।

"দেখ, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। তুমি চম্পকা, ঢাকাই শাড়ীতে তোমার বরণ ম্লান দেখাচ্ছে। তোমায় সাজবে নীলাম্বরী, ঢাকাই

টাকাই নয়। রাধিকা কেন নীল শাড়ী পরতেন, জান? আমাদের কবিরা মেঘ-ডম্বর শাড়ীর প্রশংসা করে' গেছেন। ডম্বর সংস্কৃত শব্দ, অর্থ সদৃশ। মেঘ-ডম্বর, অর্থাৎ মেঘের তুল্য নীল। যে নারী মেঘ-ডম্বর শাড়ী খুজত, সে নিশ্চয় গৌরবর্ণা ছিল। কৃষ্ণা হলে পীতাম্বরী খুজত। কৃষ্ণ পীতাম্বর ছিলেন।"

তার সঙ্গে এই ভাবে কথাবার্তা চ'লত। তদবধি পাঁচটি বছর গড়িয়ে গেছে। সংসারের জ্ঞান বেড়েছে, সে গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তার দাদারা অনেকবার তার বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, সে সম্মত হয় নাই। সে দাদার সংসারে লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে আছে। নিত্যকর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ঔদাস্য আসবে না, এমন নয়। কিন্তু সে জানে, দুঃখের পর সুখ আসবেই। এই জন্মই শেষ নয়।

* * *

একুশ বৎসর পূর্বে "নরনারীর কর্মভেদ' লিখেছিলাম। পশ্চিম-দেশের বহু নারীর বিবাহ হয় না। তাদের পিতামাতা তাদিকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না। তারা চাকরি করে, অন্যের দাসী হয়। যে সমাজ নারীর এত অপমান দেখতে পারে, সে সমাজকে ধিক্কার দিয়েছিলাম। বর্তমান ভারতের ভাগ্যদোষে আমাদের শিক্ষিত-সমাজকেও ধিক্কার দিতে হচ্ছে। শিক্ষিত পরিবারের বহু কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হয়েছে। তারা জীবিকার নিমত্ত অন্যের দাসী হচ্ছে। তাদের পিতামাতা তাদিকে পালন করতে পারেন না, তারা কেরাণী হচ্ছে। নিজের বাড়ীর কর্ম তার অবশ্য কর্তব্য, তাতে তার অপমান নাই। কিন্তু জীবিকার নিমিত্ত পরের কর্ম নারীর পক্ষে অতিশয় অপমান-জনক। কেরাণীর কর্ম সকলেই করতে পারে, সেটা তুচ্ছ কর্ম। কিন্তু বিশ্বকর্মা এক অতিশয় গুরুকর্মের নিমিত্ত নারী সৃষ্টি করেছেন। নারীই মনুষ্য জাতি-প্রবাহ অব্যাহত রেখেছে। নারীই গৃহ,

নারীই গৃহলক্ষ্মী, গৃহের শ্রী, সংসারস্থিতিকারিণী। এই কারণেই মনু নারীকে পূজ্যা বলেছেন। অসুরদলনের নিমিত্ত বিষ্ণু মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হলেন। দেবগণ লক্ষ্মীকে বললেন,—

"আল রাধা, পৃথিবীত কর অবতার।
থির হউ জগত সংসার॥"

রাধাই হ্লাদিনী শক্তি। এর অভাবে গৃহ ও অরণ্য সমান হয়ে যায়, নরজাতি উদাস ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ায়।

বিশ্বকর্মা নারীকে জননী হবার নিমিত্ত কি অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করেছেন! প্রথম যৌবনে নারী বুঝতে পারে না, কেন সে বিবাহ করতে চায়। কিছু পরে, ২৫।২৬ বৎসর বয়স হ'লে বিবাহের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়ে উঠে, সন্তান-কামনা তার হৃদয়ে প্রখর হয়ে উঠে। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ কেহ পরিমাণ করতে পারবে না। অনিমেষ দৃষ্টিতে শিশুর প্রতি চেয়ে চেয়ে তার তৃপ্তি হয় না। তাকে কোলে-কাঁখে করে' তার যে কি অসীম সুখ হয়, কেবল জননীই তা বুঝতে পারেন। ছেলে কাঁদছে, মা ছুটে গিয়ে কোলে নিয়ে বসেন। এই সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এক অভাগিনী তার ছেলেটিকে বুকে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকছে, "মা গো, একটু ফেন দাও, বাছা কিছুই খায় নি। আমি চাই না, বাছাটিকে দাও।" তিন মাস পূর্বে এই নারী যুবতী ছিল। এখন তার অস্থি শীর্ণ, চর্ম সূক্ষ্ম, দেহের অস্থি গণতে পারা যায়। কিন্তু ছেলেটি যাতে বাঁচে, তাই চায়। তার স্বামী কোথায় চলে' গেছে।

কিন্তু একা নারী অপূর্ণ, একা পুরুষও অপূর্ণ, বিবাহের দ্বারা উভয়ে পূর্ণ হয়। একা নারী অর্ধাঙ্গ, একা পুরুষও অর্ধাঙ্গ, উভয়ে মিলে পূর্ণাঙ্গ হয়। অর্ধ-নারীশ্বর প্রতিমা আমাদের দেশেই কল্পিত হয়েছিল। সেখানে নারী বড় কি পুরুষ বড়, কে সে বিচার করতে পারে?

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গরাজ নারী-পুলিস নিযুক্ত করেছিলেন। সে সংবাদ পড়ে' কলেজের পড়ুয়া শ্রীমতী মায়া বলছিল, "দাদু, দেখছেন কি? যুগান্তর! আমরা নগর রক্ষা করব, আপনারা নিশ্চিন্তমনে ঘুমাবেন। আর, আমাদের নামে আপনাদের পরিচয় হবে।"

"তা ত দেখছি। এখন বলতে হবে, "সুবল বাবু শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর স্বামী। স্বামী শব্দের অর্থ জান ত?"

"পুরুষরা এ সব নাম রেখেছিল। আমরা কি গোরু-ছাগল? আমাদের স্বামী কি?"

স্ত্রীরাজ্য নূতন নয়, কিন্তু পুরুষ ছাড়া চলে না। পূর্বকালে আসামে কদলীরাজ্য নামে এক নারীরাজ্য ছিল। সেখানে নারীই রাজ্যের কর্ত্রী, পুরুষেরা তাদের দাস হয়ে থাকত। যোগীশ্রেষ্ঠ স্বয়ং মৎস্যেন্দ্রনাথ সেদেশে দাস্য-স্বীকার করে' নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। তাঁর প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ বহু কষ্টে তাঁর গুরুকে উদ্ধার করেন। সেখানকার নারীরা পুরুষ দেখলে 'গুণ' করত। তারা ভেঁড়া হয়ে থাকত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও লোকে বিশ্বাস করত, কামরূপে গেলে সেখানে নারী কুহক করে, পুরুষ আর ফিরে আসে না। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবারে বহু বহু পূর্বকাল হ'তে এখনও স্ত্রী-রাজ্য আছে। সেদেশে নারীই সম্পত্তির অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষ নহলে রাজ্যশাসন হয় না। রাজ্যের সকল বিভাগই চলতে পারে, দাম্পত্য-বিভাগ চলে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নরনারীকে সমান মনে করেছেন। উভয়ের নিমিত্ত একই বিষয় শিক্ষণীয় করেছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা নর ও নারী পৃথক নির্মাণ করেছেন, পৃথক করে' সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করেছেন। শুধু নরনারীর নয়, নিম্নতম জীবেও পুং-স্ত্রী-ভেদ করেছেন; পৃথক কাজের জন্যই করেছেন। নরনারীর কর্মভেদ স্বীকার না করলে সভ্য-সমাজ দাঁড়াতে পারে না। আদিম মানব বর্বর অবস্থা হ'তে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে

বর্তমান সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। কর্মবিভাগই এর মূলমন্ত্র। অসভ্যজাতির নারী চাষবাস করে, গৃহরক্ষা করে; পুরুষ যুদ্ধ করে, আর নেশা করে' দিন কাটায়। সে জাতির নর যখন কঠিন কর্ম নিজে করে এবং নারীকে লঘু কর্ম দেয়, তখনই তার উন্নতি হ'তে থাকে। কর্মভেদ দ্বারাই মানুষ সভ্য হয়েছে, বৃহৎ সমাজ গড়ে' উঠেছে। কতদিকে কত কর্ম আছে, যা নারীই পারে। অন্য কত কাজ আছে, যা নরই পারে। উভয়ে একবিধ কর্ম করলে কে গৃহ হবে? কে গৃহরক্ষায় পুরুষের সহায় হবে?

নারী নরের সহধর্মিণী। সহধর্মিণী, এর অর্থ এমন নয়, একজন খরচে হ'লে অপরকেও তাই হ'তে হবে। এরূপ ঘটলে সে সংসার টেকে না; বরং দু-জনের বিপরীত ধর্ম হ'লে সংসার ভাল চলে। স্বামী গদ্য, স্ত্রী পদ্য হবে; স্বামী পরুষ হ'লে স্ত্রী কোমল হবে। স্বামী খরচে হ'লে স্ত্রী নি-খরচে হবে। সহধর্মিণী গৃহস্থ-ধর্ম প্রতিপালনে স্বামীর সহায় হবে। কন্যাদিকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাঙ্গালীর ঘরে এরূপ কন্যার অভাব নাই। কিন্তু যেখানে অভাব ঘটে, সেখানে দম্পতীর কেহই সুখী হয় না। তখন স্বামী সত্ত্বেও নারী অনাথা। যার দোষেই হউক, তাকে অভাগী বলতে হবে। কিন্তু ইংরেজী পড়ে' এইরূপ অভাগী মনে করে, "স্বাধীন হয়েছি।" আর, তারাই অধিকার নিয়ে স্বামীর সহিত বিবাদ করে। এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আর, আইনের দ্বারা ব্যতিক্রমের সমর্থন ও সাহায্য করা উচিত নয়। এমন বিধি হ'তে পারে না, যাতে ব্যতিক্রম থাকবে না।

বিবাহ-বাজারে গুণের তেমন মূল্য নাই। যে পিতামাতা মনে করছেন, কন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বি-এ, এম-এ পাস করালেই বর না কিনে বিয়ে দিতে পারবেন, তাঁরা ভ্রান্ত। বরপণ অর্থে বরের ক্রয়মূল্য। কথাটার আর কোনও মানে নাই। আর, অনেক বরের পিতা আছেন, যাঁরা ঘরে বি-এ, এম-এ পাস বউ আনতে চান না। আমার এক বন্ধু

বহুকাল কলেজে শিক্ষক ছিলেন। তিনি বালীগঞ্জে এক নূতন বাড়ী করেছিলেন। তিন-চারটি ছেলেকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিন জন উপার্জনক্ষম হয়েছিল। আমি বললাম—"এবার পুত্রদের বিয়ে দিন। আর, কলিকাতায় অনেক বি-এ এম-এ পাস কন্যা পাবেন।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "ছাই, ছাই, আমি তা'দিকে পুষতে পারব ?"

"আপনি যদি না পারেন, তারা কোথায় যাবে ?"

"সে ভাবনা তাদের বাপেরা করুন। পূর্ববঙ্গে চলতে পারে, এদিকে চলবে না। পূর্ববঙ্গ যখন দৌড়ি ছেড়ে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে দৌড়ে। আমরা চাই, মেয়েটি অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানবে, গৃহকর্ম জানবে, আর সুশীল ও শান্ত হবে।"

শহরের দিকে কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া দুর্ঘট; গুণ থাকলেও হয় না। আমার এক বন্ধুর ভাইয়ের দুই কন্যা ছিল। প্রথমটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখও মন্দ নয়। তার বাবা ঘটক-আপিসে আনাগনা করে' আর তিন হাজার টাকা ঢেলে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কন্যাটি কালো, কিন্তু মুখশ্রী মন্দ নয়। তার বাবা ভালো ওস্তাদ রেখে তাকে গান শিখিয়েছিলেন। অনেক দিন শিখেছিল। আমি তখন কলিকাতায় থাকি। একদিন ইচ্ছা হ'ল মেয়েটির গান শুনি। সকাল বেলা ৮টার সময় তাদের বাসায় ঢুকলাম। তার বাবা ছিলেন না। নীচের তলার বসবার ঘর হ'তে গায়ত্রীকে ডাকলাম। সে নেমে এল।

"শুনছি, তুই নাকি ভারি গান শিখেছিস্। একটা গা, আমি শুনব।"

ঘরে একটা তক্তপোষ ছিল, আমি বসলাম।

"যন্ত্র আনব ?"

"কোথায় ?"

"তে-তলায়।"

"যন্ত্র থাক, তুই অমনই গা।"

সে একটা খেয়াল ধরলে, আর ঘরখানা কাঁপতে লাগল। এক গ্রাম দু' গ্রাম অবহেলায় উঠতে, নামতে লাগল। যখন উঠে, তখন আমি বলে' উঠি—"থাম, থাম, তোর গলা চিরে যাবে, আমি চাই না।" সে হাসে। আর, কি মূর্ছনা! খানিকক্ষণ শুনে বললাম, "ধন্য তোর ওস্তাদ, আর ধন্য তোর শিক্ষা। আমি এই গানই খুঁজি। একটা শুনলে পাঁচ-সাত দিন তার ঝঙ্কার চলতে থাকে।

একদিন গায়ত্রী আমার বাসায় এসেছিল।

"জ্যেঠামশায়, আমায় একটা গান লিখে দিন।"

"গান লিখবার কি আছে ? ভাল ভাল গান ছাপা হয়ে গেছে।"

"সে সব গানে হবে না। নূতন আধুনিক গান চাই।"

"আধুনিক গান ? যার না আছে ভাব, না আছে ছন্দ, আর না আছে তাল, না আছে মান, যার আছে কেবল লয়,—আ-আ-আ ? এই তিড়িং রাগিণী গাইবে কে, তুই ?"

"আমাকে রেডিওর লোক ডাকতে আসে। বাবা মাঝে মাঝে যেতে দেন, দাদা মানা করে। তারা নূতন আধুনিক গান চায়।"

"বটে ? এবার যখন ডাকতে আসবে, একগাছি মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে যাবি, বুঝলি ? দেশী সাহেবরা আমাদের রুচি বিগড়ে দিলে। বিলেতের হুবহু নকল করে' দেশটাকে ঝুটো করে' ফেললে।"

"আপনি না-ই বা শুনলেন, অনেক লোক শুনতে চায়।"

"ঐ কথা মাতালও বলে, আপনি না-ই বা খেলেন, আমরা পাঁচজন খাব, স্ফুর্তি করব, তাতে আপনার ক্ষতি কি ?"

এক দিন তার বাবাকে শুধালাম, "গায়ত্রীর বিয়ের কিছু করতে পারছ ?"

"কি করা ? ছোকরারা তার গান শুনতে চায়, তাকে বিয়ে করতে চায় না। চার-পাঁচ জন বিকেল বেলা আসে, তখন চা খাওয়াতে হয়, আর

অকারণ আমার দু' টাকা আড়াই টাকা খরচ হয়। এবার মনে করেছি, গায়ত্রীকে একখানা ছোরা কিনে দেবো। আর বলব, এই ছোরাখানা তোর বুকের কাপড়ের ভিতরে রেখে দে। তোর বাবা তোকে আর কিছু দিতে পারে নাই, এই ছোরাখানা দিয়ে গেছে।"

তার বাবা কম দুঃখে এ কথা বলেন নাই। তিনি ঘটকদের আপিসে কত ঘোরাঘুরি করেছেন। মেয়েটি কুরূপাও নয়, গৃহকর্মেও অতি নিপুণা, কিন্তু টাকা চাই। তিন হাজারের জায়গায় গানের গুণে আধ হাজার কম হ'তে পারে।

যদিও দশ-বার বৎসর পূর্বের কথা লিখছি, এই ভাব এখনও সত্য। বিশেষতঃ, সহজে কেহ সহ-শিক্ষিতাকে বউ করতে চায় না। অধিকাংশ বরও বি-এ, এম-এ পাস কন্যাকে বিবাহ করতে চায় না। তারা ভাবে, এমন কন্যা কখনও পোষ মানবে না, কেবল 'অধিকার' খুঁজবে। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, বধূ সত্য সত্যই পতিগতপ্রাণা হয়ে সংসার-ধর্ম পালন করছে। কিন্তু সংখ্যায় অল্প। পিত্রালয়ের গুণে ও শিক্ষার গুণে তারা সুখে ও শান্তিতে আছে। সে শিক্ষা বিদ্যাভ্যাস নয়, বি-এ, এম-এ পাস নয়, সে শিক্ষা শীল-শিক্ষা। মহানির্বাণ তন্ত্রের বচন সকলেই জানেন, "কন্যাপ্যেবপালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ," ইহা সেই শিক্ষা। বর বিদ্যা বিবাহ করতে চায় না, চায় সুশীলা নারী। এ বিষয়ে কন্যার পিতা-মাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তা' না রেখে কন্যাকে ইস্কুল-কলেজে পাঠিয়ে বিদ্যাভ্যাস করালে গার্হস্থ্যশ্রমে সে সুখী হয় না, তার স্বামীও হয় না। এ কথা খুব সত্য, হাজার বিদ্যাভ্যাস করাও, ধর্মশাস্ত্র পড়াও, বেদাধ্যয়ন করাও, স্বভাব সকলের মাথায় চড়ে। যে কন্যা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়, ঈর্ষী, অসহিষ্ণু, সে শ্বশুর গৃহে অপর সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে, সোনার সংসার ছারখার হয়। এরূপ দুঃশীল কন্যার বিবাহ না হ'লেই ভাল।

অনেক পিতামাতা জানেন না, কেমন করে' কন্যাকে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হয়। আমি কলিকাতায় এক পিতাকে বলতে শুনেছি, "জামাই নিয়ে কথা ; শ্বশুর-শাশুড়ী ক'দিন ? তার পর যাবা থাকে, তারা খেলে কি খেলে না, রইল কি রইল না, তারা দেখবে। আমার মেয়ে কেন দেখতে যাবে ?" সে কন্যা বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পিতৃবাক্য স্মরণ কবে, আর পতিপুত্রাদি ছাড়া আব কাবও মুখের পানে তাকায না। একান্নবর্তী পবিবাব পশ্চিমবঙ্গে প্রায লুপ্ত হয়েছে। কেবল অর্থনৈতিক কাবণে নয, লোকেব মনোভাব পালটে গেছে। ভাই-এ ভাই-এ ভাব থাকলেও বউ-এ বউ-এ ভাব থাকে না, তাবা পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না। এটা শিক্ষাব দোষ বই আব কিছুই নয়। পূর্ববঙ্গে একান্নবর্তী পবিবাব অনেক আছে। এক এক পরিবাবেব পোষ্যদের মধ্যে এমন সদ্ভাব, দেখলে চোখ জুড়ায়। "শিক্ষণীযাতিযত্নতঃ", কন্যাকে শিক্ষা দিতে অতি যত্ন করবে। যদি না কব, সংসাবে অশান্তি ভোগ কববে। এই বকম অশান্তি দেখে অনেক যুবক বিবাহে পবাঙ্মুখ হয। দূরে দূবে বিবাহ হ'লে কুল চিনবার উপায় থাকে না। যখন অল্প বযসে বিয়ে হ'ত, তখন দূরে দূরে বিবাহের দোষ শোধিত হ'তে পারত। এখনকার বেশী বযসের বিবাহে তা' অসম্ভব।

বাড়ীর শিক্ষাব গুণেব বহু দৃষ্টান্ত আছে। এখানে একটা দিচ্ছি। ছয়-সাত বছব পূর্বে আট-দশটি ছোট ছোট মেয়েকে এক দিন একটা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে' খেলতে দেখি। তাদের মধ্যে এক জন ভারি চঞ্চল। তাকে ডাকলাম।

"তোমার নাম কি ?"

"ডালিয়া।"

"সে আবার কি নাম ?"

তার এক সঙ্গিনী বললে, "আপনি ডালিয়া চেনেন না? সেই যে লাল লাল ফুল হয়! এবার ফুটলে আপনাকে দেখাব।"

"আচ্ছা দেখিও। ডালিয়া নামটা কিছু নয়। তোমার নাম অতসী।"

কন্যাটি অতসী পুষ্পের ন্যায় শ্যামা। এই কারণে অতসী নাম মনে পড়েছিল। পরদিন মেয়েটি আমায় দেখে বললে, "আমি অতসী না।"

"কেন না?"

"আমার দিদিরা বলেছে।"

'অতসী না' শুনে বুঝলাম, তাদের নিবাস পূর্ববঙ্গে। সেখানে বনশণা বা ঝনঝনাকে অতসী বলে। এর ফুল শণফুলের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ। তারা মনে করেছে, আমি শ্যামা কন্যাকে অতসী বলে' বিদ্রূপ করেছি।

"কোথায় তোমরা থাক?"

মেয়েটি আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল, আর তার দিদিদিকে ডাকলে। দিদিরা বেরিয়ে এল, আর নতদৃষ্টি হয়ে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাদের এই ব্যবহারে আকৃষ্ট হ'লাম, আর তাদের অপর ভাইবোনদের সঙ্গেও পরিচিত হ'লাম। তারা নিশ্চয় আমাকে দেখেছিল, আর আমি যে তাদের ঠাকুরদাদার বয়সী তাও বুঝেছিল। দু'জনেই এখানে এক বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বড়টি বি-এ বি-টি, ছোটটি বি-এস্‌সি পাস। দু'জনেই অনূঢ়া। আমার কাছে অত লজ্জানত হবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু কি শিক্ষার গুণ! পরপুরুষের নিকটে নতদৃষ্টি হয়ে শিষ্ট-ব্যবহার করেছিল। সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যে শিক্ষায় কর্ম যন্ত্রবৎ চলে' আসে, ভাবতে হয় না। পুরুষেরাও পরনারীর মুখের দিকে তাকায় না। ইহাই শিষ্টাচার। তাদের মা পক্ষপুটে রেখে মেয়েগুলিকে মানুষ করেছেন, আর তাদের এই শিষ্টব্যবহারের জন্য তা'দিকে আমার প্রিয় করে তুলেছেন। তারা এখন কলিকাতায়। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, আমিও লিখি। নিবাস বহু

দূরে, মণিপুরের কাছে, আসামে। কিন্তু এই দূরত্বে কোন বাধাই হয় না। আর, যে শিক্ষায় পরকে আপন করতে পারা যায়, সে শিক্ষাই সৎশিক্ষা।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বালিকারা বার-ব্রত করত। গ্রামে এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু ক্রমশঃ সে শিক্ষা লোপ পাচ্ছে। বার-ব্রত পালনের দ্বারা সংযম শিক্ষা হয়, আত্মনির্ভরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস হয়। সংসারে মানুষ-খেগো বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাঙ্গুল হেলিয়ে চোখের চাহনিতে তারা শীকার মুগ্ধ করে, পরে লাফিয়ে তার ঘাড় মটকায়। এই সকল নরখাদক হ'তে কন্যাকে আত্মরক্ষার মন্ত্র না শেখালে তার জীবন বিপন্ন হয়। তখন সে হিতাহিত বিবেচনা করতে পারে না। কেহ সিনেমায় ঢোকে, কেহ প্রগতি-গোষ্ঠীতে যাতায়াত করতে থাকে। প্রথম প্রথম বেশ লাগে, বুঝতে পারে না, ভাবে না,—

হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া
চিরদিন কভু যায় না।
কভু যায় না।

পরে অনুতাপ আসেই আসে। যৌবন আর কত বছর? যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মই তাকে রক্ষা করেন। সে ধর্ম সদাচার, সৎ বা সাধুজনের অনুমোদিত আচার। এই আচারই নারীকে রক্ষা করে। যুবা বয়সে যে বুড়ো হ'তে হবে, তা নয়, 'শেষের সেদিন'ও স্মরণ করতে হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাকে চিন্তা না করলে কাণ্ডারীহীন তরীর ন্যায় জীবনটা ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে। কোথায় ঠেকবে, কোথায় ডুববে, কিছুই স্থির থাকে না।

কোনও কোনও মাতা ছেলেবেলা হ'তেই মেয়েকে বিবি সাজতে শেখান। তাঁরা বলেন, "আমার কাছে, মেয়ে পরবে না কেন?" তাঁরা ভাবেন না, এটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আর, ক্রমশঃ বেশভূষার দিকে মেয়ের সখ বেড়ে যায়। না পেলে, সে মনের দুঃখে কাল কাটায়।

কলিকাতায় নিত্য-নূতন ফ্যাশান উঠছে। আকাশ-তরঙ্গ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে ফ্যাশান তেমনই দূরে দূরে নগরে উপ-নগরে ছড়িয়ে পড়ছে। কিশোরীরা তার চমকে ভুলে যায়। এমন বালিকা-বিদ্যালয় প্রায় নাই, যেখানে বালিকাদের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। তাদের মায়েরাও ভাবেন, আজকাল এই রকমই চাই। মেয়ের মাথায় একরাশি লম্বা চুল, নাকের সোজা সিঁথি নাই, বাঁ পাশে টেরি। বিনাবার ও খোঁপা বাঁধবার সুবিধা হয় না, কিন্তু টেরি চাই।

এখানে একটা ইতিহাস মনে আসছে। তিন-চার বছর পূর্বের কথা। আমার দেখা অল্প, শোনাই বেশী। এক ডাক্তারের পুত্রের সহিত কলিকাতার এক ডাক্তারের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল। কলিকাতার লোকেরা কলিকাতার বাইরের লোকদিকে পাড়াগেঁয়ে বলে, জংলীও বলে। বরের পিতার জন্মস্থান পাড়াগাঁয়ে, কিন্তু এক ছোট শহরে ডাক্তারি করতেন, প্রচুর টাকা কুড়াতেন। তাঁকে কেহ 'পাড়াগেঁয়ে' বললে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। তিনি ধুতি পরতেন না; তাঁর বাড়ীর ছেলেরাও পরত না, দিনরাত প্যান্ট পরে' শার্ট গায়ে দিয়ে থাকতেন। কন্যার গাত্র-হরিদ্রা হবে, নানাবিধ জিনিসপত্র পাঠাতে হবে। কতক জানা আছে; কিন্তু অঙ্গরাগে কি কি দ্রব্য আজকাল চলেছে, তা তিনি জানতেন না। তাঁর জানবার কথাও নয়। একজন চালাক ছোকরাকে গাত্রহরিদ্রার জিনিস কিনতে কলিকাতা পাঠালেন। কলিকাতায় বিবাহ-সামগ্রীর অনেক দোকান আছে। ছোকরা এক দোকানে গিয়ে কিনতে বসল।

"গাত্র-হরিদ্রার যা' যা' চাই সব বা'র কর।" কলিকাতার দোকানী বুঝতে পারলে, আর তার দোকানে যা' কিছু ছিল, সব সমুখে ধরে' দিলে। মাথার জাল, মুখের জাল, তিনটে তিনটে নানারকমের সুগন্ধি সাবান, সুগন্ধি কেশ-তৈল, চুলের সুগন্ধি অবলেপ (পমেড), নানাবিধ

সুগন্ধি সার (এসেন্স), মুখে মাখবার মুখ-চূর্ণ (পাউডার) ও ধবল-লেপ (স্নো), গণ্ডরঞ্জিনী (রুজ), কপালে ফোঁটা দিবার তরল কুঙ্কুম (অর্থাৎ গঁদ মেশান বিলাতী লাল রং), ওষ্ঠরঞ্জিনী (লিপষ্টিক), পায়ের তরল আলতা (অর্থাৎ বিলাতী রং), অঙ্গরাগ-পেটিকা বা রাগিনী (ভ্যানিটি ব্যাগ) ইত্যাদি। অবশ্য আরশী, কাঁকই, বুরুষ, একখান সিঁদুর, দু'পাতা আলতা, এসবও ছিল। ছোকরা জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। যথাদিবসে অন্যান্য বহু দ্রব্যের সহিত প্রসাধন-দ্রব্যও গেল। কলিকাতায় কন্যার বাড়ীর পড়শীরা, নবীনা ও প্রাচীনা, সমালোচনা সুরু করে' দিলেন।

নবীনারা বললেন, "এ কি রকম জংলী, গো ? প্যারিস এসেন্স কই ? এ যে সব দেশী সাবান, প্যারিসের সাবান কই ? এ কি কেশতৈল ? এত কড়া গন্ধে পরিমলের মাথা ধরে' যাবে।"

প্রাচীনারা বললেন, "গাত্র-হরিদ্রার হলুদ কই ?" বলে'ই কপালে হাত দিয়ে বসলেন। বাড়ীতে হুলস্থুল পড়ে' গেল। এক বৃদ্ধা কন্যার পিতাকে উদ্দেশ করে' বললেন, "আমি তখনই সতুকে বলেছিলাম, মেয়েটাকে বনবাসে পাঠিও না। সে দেশে দিনের বেলা শিয়াল ডাকে। আদ্যি-কালের পাড়াগাঁ। চান করবার জল নাই। বড় বড় সায়র আছে, আর চারি পাড়ের ঘাটে বড় বড় কুমীর কিলবিল করে। লোকে হলুদ মেখে জলে নামে, হলুদের গন্ধে কুমীর কাছে আসে না। পরিমল কি হলুদ মাখতে পারবে ? যার মাসে এক ডজন সাবান নইলে চলে না, সে হলুদ মাখবে ? হা কপাল !"

সতু ডাক্তার কিছু কিছু জানতেন না, এমন নয়। কিন্তু মেয়েটি কালো, মুখশ্রীও তেমন ছিল না। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম ছুটল, কিন্তু হলুদ ত তারে আসে না। পরের ট্রেন সন্ধ্যা বেলায়। কলিকাতা পৌঁছিতে রাত্রি ১১টা, ১২টা। কি হবে ? রাত্রে গাত্র-হরিদ্রা হ'তে পারে কি ? একজন স্মৃতিরত্নের বাড়ী ছুটল। স্মৃতিরত্ন বললেন, "কন্যার

বয়স কত ?” “উনিশ।” “তা হ’লে ত অরক্ষণীয়া। অরক্ষণীয়া কন্যার বিধি-ব্যবস্থা নাই। যত শীঘ্র পার, কন্যাকে পাত্রস্থা করে’ দাও।”

কলিকাতার দোকানী সব জিনিস দিয়েছিল, হলুদটা দেয় নাই। প্রসাধনের এত নূতন নূতন আবিষ্কার হচ্ছে, বাটা হলুদ অক্লেশে শিশিতে ভরে’ ‘বিন্ধ্যাচলের হরিদ্রারেণু’, এই নামে এক নূতন ‘অবদান’ হ’তে পারত। বিলাতী মেমরা যা গায়ে মাখে, তাই বাঙ্গালী মেয়েকে মাখতে হবে। কিন্তু বিলাতী মেমের মুখ সাদা, তারা শীতদেশে থাকে, তার জন্যই সে দেশে তেমন অঙ্গরাগ হয়েছে। কালো মুখে সে সব মাখলে সং সাজা হয়। গ্রীষ্মদেশে মুখ-চূর্ণ ঘষলে ঘর্ম-রোধ হয়, ধবললেপে মুখকান্তি লুপ্ত হয়। অন্ধ অনুকরণের এই দশা। বার বার দেখেও নব্য-সভ্যদের চৈতন্য হয় না।

শ্রীমতী বন্দনা কলিকাতার মেয়ে, কলেজে পড়ে।

“দাদু, আপনি ক’লকাতা পছন্দ করেন না। আর, আমাদের কিছুই ভাল দেখতে পান না। আমরা কি পুকুরঘাটে বসে’ হলুদ মাখব, না আবাটা মেখে গায়ের মলা ছাড়াব ? এমন সুন্দর সাবান থাকতে কেন সে আদিম যুগে যাব ? ইন্দু-দিদি সংস্কৃত কাব্যে এম-এ পাস। সে বলছিল, ‘কালিদাসের নাগরীরা লোধ ফুলের ধুলো মেখে মুখ পাণ্ডুর করত।’ যদি তারা সুবাসিত পাউডার পেত, ছাড়ত কি ? তারা শিরিষ ফুল কানে পরত। আমাদের কানের রিং পেলে শিরিষ ফুল খুজে বেড়াত কি ? আর বলবেন না, বলবেন না। আমাদের দিদিমারা কপালে, চিবুকে, হাতে উল্‌কি পরে’ সুন্দরী সাজতেন। এক উল্‌কি-পরা মেয়েকে বিয়ে করে’ এক শিক্ষিত যুবক বিলাত গিয়ে সিবিলিয়ান হয়ে এসেছিলেন। বড় চাকরি, তাঁকে সায়েব-সুবোদের সঙ্গে মিশতে হ’ত, তাদের ক্লাবে যেতে হ’ত, তাদের সঙ্গে ডিনার খেতে হ’ত। স্ত্রীটিকে কোনও রকমে দু’-পাঁচটা ইংরেজী কথা শিখিয়ে নিলেন। কিন্তু কপালের

নীল চক্র বিপদ ঘটালে। কলিকাতার ডাক্তাররা অনেক কষ্টে চর্ম কেটে নীল গুঁড়া তুলে দিলেন। কিন্তু সেখানে একটা সাদা চক্র হয়ে রইল। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার ওখানে কিসের দাগ?' 'ছেলে বেলায় একটা খোঁচা লেগে গেছল।' আমাদের সে বিপদ হ'তে দেখেছেন? আমরা কুঙ্কুম পরি, যখন ইচ্ছে ধুয়ে ফেলি। আমরা কি অলক করি? আর অলকের নীচে শ্বেত চন্দনের বিন্দু দিয়ে তিলকপাতা করি, না কালাগুরুর বিন্দু দিয়ে তমাল পত্র আঁকি? আর বলবেন না, বলবেন না। আমরা নূতন কিছুই করি নাই। কবিকঙ্কণে দেখবেন, 'দুফেব করিয়া পরে তসরের শাড়ী'। এখনও পূর্ববঙ্গে দুফের কাপড় পরা আছে। চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, আমরা নীচের ফেরটা আলাদা কাপড়ের করি, উপরে শাড়ী পরি। কবিকঙ্কণে দেখবেন, কাঁচুলীতে কত চিত্র করা হ'ত। আমাদের বডিসে কোন চিত্রই থাকে না। বেশী দিন নয়, মেয়েরা কত কি গয়না পরত। পায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুটি, পাঁয়জোর, চরণ-পদ্ম, জোড়া জোড়া মল, গুজরী পঞ্চম; ধনীরা কটিতে সোনার চন্দ্রহার, গোট; হাতে বালা, চুড়ী, নারকেল ফুল, বাউটি; উপর হাতে সোনার তাবিজ, অনন্ত, বাজু, জসম; গলায় চিক; বক্ষে সাতনরী পাঁচনরী হার; নাকে বালিকারা নোলক (আগে ছিল বেসর) একটু বয়স হ'লে নাকছাবি, আর একটু বয়স হ'লে বড় বড় নথ সোনার শিকল দিয়ে কানে আটকাতে হ'ত; কানে চৌদানি, কানবালা, অসংখ্য মাকড়ী, সোনার কান; সিঁথিতে সিঁথি, টায়রা; খোঁপায় কাঁটা, ফুল; আর কত নাম করব?"

"ক'জনে পরত? অধিকাংশ নারী রূপোর গয়নাতে তুষ্ট থাকত। মাত্র দু' তিনখানি হালকা হালকা সোনার গয়না থাকত। তিন চার শ টাকা হ'লেই যথেষ্ট হ'ত। এই সেদিন সুলোচনার বিয়ে হ'ল। পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না লেগেছিল। সে সব কে পরেছিল?"

শ্রীমতী নম্রা কলেজে অর্থনীতি পড়ে। সে বলছিল,—

"সে সব কি আমরা চাই ? বরপক্ষ চায়। তাদের সঙ্গে বুঝুন। আমরা বিয়ের দিন পরি, পরদিন খুলে বাক্সে রাখি। সে সব যৌতুক, স্ত্রীধন। আর শাস্ত্রেও আছে, সালঙ্কারা কন্যা দিতে হবে। আমরা হাতে দুগাছি দুগাছি চুড়ি পরি ; গলায় সরু মালা কিম্বা হার ; আর কানে কুণ্ডল, দুল কিম্বা পাশা।"

শ্রীমতী মায়া বলে, "দাদু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা আধুনিকা। আমরা কি সেকালে ফিরে যেতে পারি ? আমাদিকে কালের সঙ্গে চলতে হবে। চলতে না পারলে মরণ নিশ্চিত।"

"সে কাল ঘড়ীর ঘণ্টা মিনিট নয়। কাল মানে অবস্থা। বলতে চাও কি, আমেরিকার কাল, রুষ দেশের কাল, আর আমাদের দেশের কাল একই ? তাদের দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা আমাদের সঙ্গে মিলে কি ? আমাদের দেশে 'নারীনাং ভূষণং লজ্জা',—লজ্জাই নারীর ভূষণ। সকল দেশেই নারীর কিছু না কিছু লজ্জা আছে, কিন্তু প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। সকল দেশেই আচার দ্বারা লজ্জা প্রকাশিত হয়। আর, প্রত্যেক আচারের সঙ্গে বিধিনিষেধ আছে। কাল চলেছে বটে, নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে। তোমরা সে সে দেশের কাল এ দেশে টেনে আনছ কেন ? আমাদের দেশের কালের সঙ্গে সঙ্গে চলছ না কেন ? চললে, তোমরা শোভাযাত্রায় যেতে না। সেদিন শুনলাম, তোমার সখীরা দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছিল। হাটবাজারের মাঝ দিয়ে আগে আগে চলেছে, পথের ধুলো ঝেঁটিয়ে বেণী দুলিয়ে চলেছে, আর তোমাদের বীর ভাইরা তাদের পৃষ্ঠরক্ষা করছে। পুলিসের গুলী খেতে হয়, বীরাঙ্গনারা খাবে, তখন তারা পালিয়ে যাবে। তারা তোমাদিকে নাচাচ্ছে। আমি জানতাম, তোমরা অবলা ; এখন দেখছি, তোমরা অবোধাও বট।"

শ্রীমতী নম্রা বলে, "সেকালের মেয়েরা মুখ ঢাকত, পা দেখাত, আমরা পা ঢাকি, মুখ দেখাই। ঘোমটাও বাংলা দেশে বেশী দিনের নয়। সমুদয় দক্ষিণ ভারতে এখনও নারীর ঘোমটা নাই।"

"ঘোমটার নয়, দিগ্‌বিজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি। উৎসবে কুমারীরা বেশভূষা করে' সারি সারি চলবে, খই কিম্বা ফুল ছড়াবে, গান গাইবে, সে এক মাঙ্গলিক ব্যাপার। আধুনিকাদের দন্ত-যাত্রায় সে ভাব দেখতে পাও কি ?"

২

নরনারীর সৌন্দর্য-স্পৃহা স্বাভাবিক। সকল জাতিরই এই প্রবৃত্তি আছে, কেবল এক এক জাতি এক এক প্রকারে সে প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। আমাদের দেশে এই প্রবৃত্তি যে আকারে প্রকাশ পায়, অন্য দেশে সে আকারে পায় না। সকলের রূপ থাকে না, বেশভূষা দ্বারা সকলে রূপবান্ হ'তে চায়। নর ও নারী সুন্দর সেজে পরস্পরকে আকর্ষণ করতে চায়।

যৌবনকালেই সৌন্দর্য-স্পৃহা প্রবল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সেই বালিকারা বুঝতে পারে, তারা সুন্দর কি অসুন্দর। একবার আমি এক পাঁচ বছরের কন্যাকে বলেছিলাম, "তুমি ভারি সুন্দর।" সে তৎক্ষণাৎ বলেছিল, "আমি সুন্দর নই, আমি কালো।" সে বুঝেছিল, রং ফরসা হ'লেই সুন্দর। বয়স যত বাড়তে থাকে, "আমি সুন্দর, আমি অসুন্দর," এই জ্ঞানও তত পাকা হতে থাকে। আর, সুন্দরীই হউক, আর অসুন্দরীই হউক, কি করলে সুন্দরী দেখায়, সে কথা ভাবতে থাকে। এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নরজাতিকে আকর্ষণ করবার জন্য বিশ্বকর্মা নারীকে এই প্রবৃত্তি দিয়েছেন। কিন্তু এই

প্রবৃত্তির আতিশয্য ব্যসন-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বরেরা এরূপ কন্যাকে ডরায়, অন্যেরা অপদার্থ মনে করে।

বিশ্বকর্মা সকল নারীকে সমান রূপ দেন নাই। যার রূপ নাই সে কৃত্রিম উপায়ে রূপসী হতে পারে না। রূপ শব্দে বুঝি শ্বেত-কৃষ্ণাদিবর্ণ, আকৃতি আর সৌন্দর্য। কবিরা উপমাদ্বারা এই তিন অর্থ বুঝিয়ে গেছেন। আমরা বলি মেয়েটি কালো, মেয়েটি গোরা, মেয়েটির নাক-মুখ-চোখ ভাল; কিম্বা বলি, মেয়েটি সুন্দরী। যাকে দেখলে আনন্দ হয়, সে-ই সুন্দরী। উপরে যে পাঁচ বছরের মেয়েটির কথা লিখেছি, সে আ-কৃষ্ণ বটে, কিন্তু সত্যই সুন্দরী ছিল। তাকে দেখে আমার আনন্দ হ'ত। শুধু আমার নয়, যে দেখত তারই আনন্দ হ'ত।

কিসে সৌন্দর্য হয়, কিসে হয় না, তার বিশ্লেষণ ভারি কঠিন। কন্যা গোরা হ'লেই সুন্দরী হয় না, কেবল নাক-মুখ-চোখের গড়ন ভাল হ'লেও হয় না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য থাকলেও হয় না। কেহ লিখেছেন,

"বাহুতে মৃণাল হেরি, নয়নে কুরঙ্গ।
গ্রীবাতে মরাল হেরি, বেণীতে ভুজঙ্গ॥

কেমন বাহু? মৃণালের তুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র "মৃণালিনী"তে লিখেছেন, "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।" এখানে তিনি ভুল করেছেন। মৃণালে কণ্টক নাই। পদ্মের মূল হ'তে শাখা বহির্গত হয়, পাঁকের ভিতর দিয়ে একটু দূরে যেয়ে উপর দিকে বেড়ে আর একটি গাছ হয়। সেই শাখার নাম মৃণাল। মৃণাল শাদা কোমল ও গোল, আরম্ভ হতে ক্রমশঃ সরু হয়ে উপরে উঠে। চলিত বাংলা নাম মূলাম। কেহ মূলাম ভেজে খায়, কেহ বা কাঁচাই খায়। নয়ন কি রকম? কুরঙ্গ-নয়ন-তুল্য। কুরঙ্গ মেষতুল্য ছোট এক প্রকার হরিণ। সহজে পোষ মানে, কিন্তু বাঁচে না। চোখ বড়, ভাসা ভাসা, দৃষ্টি কোমল, আর সর্বদা যেন চকিত।

কুরঙ্গকে ওড়িয়াতে খুবং বলে। গ্রীবাতে মরাল। মরাল রাজহাঁস। অর্থাৎ গ্রীবা দীর্ঘ, সম্মুখে তরঙ্গিত। বেণীতে ভুজঙ্গ, অর্থাৎ বেণী দীর্ঘ ও উপর হ'তে নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু। কিন্তু এই বর্ণনা হ'তে সে কন্যা সুন্দরী কি অসুন্দরী, বুঝতে পারা যায় না।

কবিরা এইরূপ এক এক অঙ্গের এক এক উপমা দিয়েছেন। যেমন, জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাস রাধিকার গণ্ডযুগলে মহুয়ার ফুল দেখেছিলেন। অর্থাৎ গণ্ডযুগল পীতাভ ও স্ফীত। বড়ু রাধিকার নাসারন্ধ্র গোল দেখেছিলেন, দুই রন্ধ্র যেন দুই নল। কবি-বর্ণিত 'তিলফুল জিনি নাসা', কিম্বা 'খগ নাসা' দুর্লভ নয়; গ্রাম্য নারী বলে, 'কাটারী-পারা নাক'। ধনুর তুল্য বক্র ভ্রূ-ও দুর্লভ নয়। কৃষ্ণ পদ্ম-পলাশ-লোচন ছিলেন, অর্থাৎ চক্ষু পদ্ম-দলের তুল্য দীর্ঘ ও মধ্যে স্ফীত, ভাসা ভাসা; ক্ষুদ্র ও কোটর-গত নয়। ইহাই পটোল-চেরা চোখ। যার দৃষ্টি কুরঙ্গের তুল্য চকিত, সে কুরঙ্গ-নয়না। যৌবনে অধিকাংশ নারী কুরঙ্গ-নয়না হয়। যে নয়ন আয়ত হয়, পল্লব আর্দ্র বোধ হয় এবং ভ্রূ দীর্ঘ ও বঙ্কিম হয়, তাতে যদি কুরঙ্গদৃষ্টি থাকে, সে নয়ন আমাদিকে মুগ্ধ করে। তখন পাশের নাক মোটা কি সরু, কিছুই লক্ষ্য হয় না। নয়নই হাসে, নয়নই কাঁদে, নয়নই স্নেহ করে, নয়নই ক্রোধ করে। নয়নের এই সকল অসামান্য শক্তি ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না। 'খঞ্জন জিনিয়া আঁখি',—সে চক্ষু-গোলক এ-পাশ হ'তে সে-পাশে, সে-পাশ হ'তে এ-পাশে নিরন্তর নড়তে থাকে। এরূপ আঁখি দুর্লভ, কিন্তু আমার সুন্দর মনে হয় না। বিম্বোষ্ঠ, ওষ্ঠ পাকা তেলাকুঁচা ফলের ন্যায় লাল ও মধ্যে স্ফীত। এরূপ ওষ্ঠ গৌরী কন্যাতেই সম্ভবে। এইরূপ এক এক অঙ্গ সুদৃশ্য হ'লেও পরস্পর সামঞ্জস্যের অভাবে আমাদের আনন্দের উদ্রেক করে না।

মুখের লাবণ্য একটা বিশেষ গুণ। কিন্তু সকল বর্ণে অথবা সকল বয়সে এই গুণ থাকে না। রূপে ঘর আলো হয়, কথাটা সত্য। যুবতী

কন্যার গৌর মুখে লাবণ্য-লহরী খেলতে থাকলে তদ্দারা রবিকর কিছুদূর পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়। তখন ঘর আলো হয়। এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা 'কোটিক গোটিএ' মিলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী হলেও এক অনির্বচনীয় গুণ না থাকলে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সে গুণ মাধুর্য। যে কবি লিখিছেন,

"মাধুরিতে মাখা মু-খানি তার,
অতৃপ্ত-নয়নে হেরি বার বার"—

তিনিই সৌন্দর্যতত্ত্ব বুঝতে পেরেছেন। অন্য কবিরা শরতের পূর্ণশশীর সহিত সুন্দরীর মুখের তুলনা করেছেন। পূর্ণচন্দ্র, এর বাচ্যার্থ কিছুই নয়। পূর্ণচন্দ্রের পীত, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধবর্ণ সুন্দর বটে, কিন্তু আমরা কি অতৃপ্ত-নয়নে দেখতে থাকি? এর নিগূঢ় অর্থ আছে। চন্দ্রে অমৃত আছে, দেবতারা সে অমৃত পান করে' অমর হয়েছেন এবং চিরযৌবন পেয়েছেন। সুন্দরীর মুখ হ'তে যেন অমৃতরশ্মি দ্রষ্টার চোখে পড়ে এবং তাতেই দ্রষ্টা যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা বলি, 'তার গানে যেন অমৃত বৃষ্টি হয়।' এখানেও সেই নিগূঢ় অর্থ। চক্ষুর দ্বারা কিম্বা কর্ণের দ্বারা রূপের কিম্বা ধ্বনির এক অনির্বচনীয় শক্তি অনুভূত হয়। সে শক্তিই মাধুর্য। যার মুখে মাধুর্য নাই, সে মুখ আমাদিকে বার বার আকৃষ্ট করে না। সুদৃশ্য অবয়বে এর উৎপত্তি নয়, গাত্রবর্ণে নয়, লাবণ্যেও নয়। এর উৎপত্তি বিস্ময়ে। এখানে ভাষা পরাভূত হয়। তখন আমরা কেবল বলি, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

বরেরা ফরসা মেয়ে খোজে। যে কালো নয়, সে ফরসা। সেটা যে কত বড় ভুল, যার সৌন্দর্যের অনুভূতি আছে, সেই বুঝতে পারে। এক-দিকে গোরা, আর একদিকে কালো। গোরা গৌরবর্ণা, যার বর্ণ রাঁধবার বাটা হলুদের মত। কেবল গাঢ় পীত নয়, ঈষৎ রক্ত। এই বর্ণে শ্বেত

মিশ্রিত হ'তে হ'তে ফেকাসে দাঁড়ায়। ফেকাসে রং স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এর সহিত অল্প কৃষ্ণ মিশ্রিত হ'লে তাকেও ফরসা বলা চলে, কিন্তু সে গোরা নয়। কৃষ্ণ অধিক হ'লে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অতসী-কুসুম-শ্যাম ছিলেন। এই বর্ণের সহিত কেহ কেহ নীলোৎপল অর্থাৎ নীলকমল বা নীল সুঁধির তুলনা করে' গেছেন। এই দুই-এরই বর্ণ ঈষৎ নীল। পূর্বকালে কৃষ্ণ বর্ণকেও নীল বলা হ'ত। এমন মনোহর বর্ণ দুর্লভ। আমি দুই ভাইবোনের এবং অন্য পরিবারে এক কিশোরের ও তাব জননীর মুখে এই বর্ণ দেখেছি। তাদের নাক-মুখ-চোখও ভাল ছিল। পুরীতে এই বর্ণের এক কিশোর মোহান্তের কপালে শ্বেত-চন্দনের তোরণ দু'পাশে তিলকপাতার (তিলপাতা নয়, তিলক গাছের পাতা, বন্য তিন্ত গাছ) চিত্র দেখেছিলাম। তার মুখ কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! কৃষ্ণবর্ণ অল্প গাঢ় হ'লে মহিষবর্ণ হয়। আরও গাঢ় হ'লে গ্রাম্যজনে বলে, 'ধান সিজা হাঁড়ির মত কালো' অর্থাৎ মীস কালো, মসীবর্ণ, একেবারে কান্তিশূন্য। কদাচিৎ বার্নিশ-করা কালোও দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ এই বর্ণ দেখলে চমকে' উঠতে হয়। যারা বিয়ের কনে দেখে, কিম্বা বর দেখে, তারা প্রায়ই গায়েব রং দেখে ভুলে যায়। কিন্তু মাধুর্য গায়ের রংএ হয় না।

বিবাহের কন্যা বাছাই বড় সোজা কাজ নয়। (১) প্রথমে তার কুল অর্থাৎ বংশ। যে কুলে কীর্তিমান্ উদার-চরিত, সৎস্বভাব পুরুষের জন্ম হয়েছে, সে কুলের কন্যাও উত্তম দৃষ্টান্ত পায়, কন্যা সুশীল হয়ে থাকে। যে কন্যার পিতা কিম্বা ভ্রাতা কলহপ্রিয়, অসচ্চরিত্র, প্রবঞ্চক, চোর (যেমন উৎকোচ গ্রাহক, খাদ্য-মিশ্রক) পরস্বাপহারক, সে কন্যা এই এই কর্ম দেখে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার স্বভাবও সেইরূপ হ'তে থাকে। সে কুল অবশ্য বর্জনীয়। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম হয় বটে, কিন্তু কদাচিৎ। (২) কন্যার শীল, কন্যার আচরণ দেখতে হবে, কন্যা সুশীল কি দুঃশীল।

কন্যার দাঁড়াবার ও বসবার ভঙ্গি, তার কথার ধরণ, চোখের দৃষ্টি ইত্যাদি খুঁটিনাটি দ্বারা শীল কতকটা অনুমান করতে পারা যায়। (৩) বুদ্ধি। নির্বুদ্ধি কিম্বা জড়বুদ্ধি কন্যা পরিত্যজ্য। আজকাল গ্রামের কন্যারাও অল্প-স্বল্প লিখতে পড়তে শিখেছে, তারা গৃহস্থালীও জানে। কিন্তু এই দুইএর বুদ্ধি এক প্রকার, আর সংসারে হঠাৎ কিছুর অভাব ঘটলে যে বুদ্ধি তা পূরণ করতে পারে, সে বুদ্ধি আর একপ্রকার। এর নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই গুণের গৃহিণীই কোন কিছু ঘটলে অস্থির হয়ে পড়ে না। (৪) কন্যার কান্তি অর্থাৎ মুখের দীপ্তি। এর দ্বারা কন্যার স্বাস্থ্য বুঝতে পারা যায়। যৌবনারম্ভে অধিকাংশ কন্যার কান্তি প্রকাশ পায়। অতিশয় কৃষ্ণা কন্যার কান্তি অল্প কয়েক বৎসরেই অদৃশ্য হয়। কিন্তু মাধুর্য থাকলে শীঘ্র লুপ্ত হয় না। (৫) সঞ্চারী রোগ (যেমন যক্ষ্মা উদরপীড়া)। পূর্বকালে কুষ্ঠ রোগকে সঞ্চারী মনে করা হ'ত, ইদানীং তা মনে করা হয় না। কিন্তু বাড়ীতে কারও থাকলে সংস্পর্শের আশঙ্কা অবশ্য করতে হবে। বংশে কেহ বোবা, কালা, জড, কিম্বা বিকৃত-মস্তিষ্ক থাকলে বুঝতে পারা যায়, সে বংশের পূর্বপুরুষ দুশ্চরিত্র ছিলেন। সে সে দোষ কন্যাতে না থাকলেও তাঁর পুত্র কন্যায় এমন কি তাঁর পৌত্র পৌত্রীতে প্রকাশ পেতে পারে। (৬) কন্যা বিকলাঙ্গ ও চিররগ্ন হবে না। (৭) যে কন্যার অনেক বোন আছে, গৃহিণীরা সে কন্যাকে বউ করে' আনতে ভয়-করেন। আশঙ্কা, তারও অনেক কন্যা হবে, আর সে সব কন্যার বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়বে। (৮) কন্যার ভাই থাকা চাই। মনুও এই বিধি দিয়েছেন। "কুমার সম্ভবে" কালিদাস লিখেছেন, পার্বতীর এক ভাই ছিল। এই উল্লেখের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল, কবি তা লেখেন নাই। টীকাকার মল্লিনাথ লিখেছেন, কন্যার ভাই থাকা চাই, তাই কবি উল্লেখ করেছেন। কেন চাই, তা সবাই জানত, টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাই থাকার প্রথম প্রয়োজন, কন্যা পতিপুত্রহীনা হ'লে

এবং শ্বশুরবাড়ীতে অনাদর দেখলে বাপের বাড়ী যেয়ে থাকতে পারে এবং তাই থাকে। এ ছাড়া আরও প্রয়োজন আছে। দম্পতীর কলহ হয়েই হয়। তখন স্ত্রী দেখাতে চায়, তার শ্বশুরবাড়ীই একমাত্র আশ্রয় নয়, তার সুখে থাকবার জন্য ঠাঁই আছে। সে ঠাই বাপের বাড়ী ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু সেখানে গেলেই দু'এক দিনের মধ্যে তার নিজের ঘরকন্নার কথা মনে আসে। ভাবতে থাকে, তার স্বামী কোথায় খাচ্ছে, কে খেতে দিচ্ছে, চাকর-বাকর থাকলেও সময়ে ঠিকমত খেতে জুটছে না, ঘরেও থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে থাকে, তার সংসার লণ্ডভণ্ড হচ্ছে, পরে গুছিয়ে নিতে তাকেই ভুগতে হবে। তখন আর সে থাকতে পারে না, ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্র হয়। যখন ফিরে আসে তখন সে আলাদা মানুষ, যেন কিছুই হয় নাই। তার ভাই না থাকলে কোথায় দাঁড়াত? শুনেছি, কলিকাতার নব্য-সমাজে স্ত্রী ঘর আগলে' বসে থাকেন, স্বামী হোটেলে চলে' যান। কিন্তু এখানে স্ত্রীর স্থান পরিবর্তন হ'ল না, ভাইবোনেদের দেখা পেলে না, তার রাগও সহজে পড়ে না। এ দুইএর মধ্যে কোন্‌টা ভাল?

(৯) সকলেই জানে সমান ঘরে বিবাহ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ আচারে, সংস্কারে, ধনে, মানে সমান। কলকাতার মেয়ে বাহিরে গেলে, এবং শহরের মেয়ে গ্রামে গেলে হাঁপিয়ে উঠে। নিবাস সমান হ'লে কন্যা পিতৃগৃহে যেমন ছিল, শ্বশুরগৃহেও তেমনই থাকে, শ্বশুরগৃহের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে যায়। সমান ঘর না পাওয়া গেলে কন্যাকে উঁচু ঘরে দেওয়া উচিত, কদাপি নীচু ঘরে নয়। সকল জাতির মধ্যেই উঁচু-নীচু ভাব আছে, কুলীন-মৌলিক ভাগ আছে। এই কারণেই মৌলিকের ঘরে কুলীন-কন্যার বিবাহ হ'ত না, কুলীন মৌলিক-কন্যা আনতে পারত। পূর্বে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এই চারি বর্ণ-ভেদ ছিল, তখন ব্রাহ্মণ-বর ব্রাহ্মণ-কন্যা না পেলে ক্ষত্রিয়-কন্যা, তাও না পেলে বৈশ্য-কন্যা এবং

কদাচিৎ শূদ্র-কন্যা বিবাহ করতেন। কিন্তু শূদ্রা পত্নী দাসী হয়ে থাকত, ধর্মকর্মে তার অধিকার থাকত না। এর নাম অনুলোম বিবাহ। কিন্তু এর বিপরীত, নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণ করলে সমাজে নিন্দিত হ'ত। এর নাম প্রতিলোম বিবাহ। এটা কুসংস্কার নয়, এর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। পুরুষকে বীজ, নারীকে ক্ষেত্র বলা হ'ত। সন্তানে বীজের প্রভাব সমধিক, ক্ষেত্রের তত নয়। প্রাচীনেরা এর সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেন,—ধান্য হ'তে ধান্যই উৎপন্ন হয়, তিল হয় না, ক্ষেত্র যেমনই হউক।

(১০) সকলেই জানে, ও মানে, বর বয়সে বড়, কন্যা ছোট হওয়া চাই। কেন চাই, তারও বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। কিন্তু কত বৎসরের অন্তর হবে? পূর্বে দশ বৎসরের কন্যার সহিত ত্রিশ বৎসরের বরের বিবাহ হ'ত। অন্ততঃ আট-দশ বৎসরের অন্তর থাকলে ভাল।

এখানে কন্যার রূপের উল্লেখ করলাম না। কারণ রূপ দ্বারা বংশের কিম্বা সংসারের ইষ্টানিষ্ট হয় না।

এত তত্ত্ব বুঝে কন্যা দেখা হয় কি না সন্দেহ। কলিকাতায় কনে' দেখা এক বিচিত্র ব্যাপার। অনেক বৎসর পূর্বে একদিন সকালবেলা আমি এক বন্ধুর সহিত দেখা করতে গেছলাম। তাঁর বসবার ঘরে এক তক্তাপোষ ছিল। তিনি তা'তে বসেছিলেন, আমিও বসলাম। ঘরের অন্য দিকে খানকয়েক চেয়ার আর একটা বড় টেবিল ছিল। একটু বসেছি, দেখি এক চাকর এসে বাইরের দরজার নিকটে দু'খানা চেয়ার আর ভিতরের দরজার নিকটে একখানা চেয়ার রেখে চলে' গেল। মাঝ-খানে টেবিল। একটু পরেই দেখি, দুটি আগন্তুক এসে সে দুই চেয়ারে বসল। আর ভিতর হ'তে বন্ধুর দৌহিত্রী অঞ্জলি এলোচুলে এসে সেই দিকের চেয়ারে বসে' টেবিলের দিকে চেয়ে রইল। আমি কিছুই জানি না; ভাবছি একি হচ্ছে। সেই আগন্তুক দু-জনের একজন গলা বাড়িয়ে অঞ্জলির পানে একদৃষ্টে এমন চেয়ে রইল, দেখে আমার রাগ হ'তে

লাগল। কথা নাই। পাঁচ-সাত মিনিট এই মূক অভিনয় চলল। তার-পর তারা দু-জন উঠল। "এর পর জানাব" বলে' চলে' গেল। অঞ্জলি ভিতরে ঢুকে তার মাকে বলছে, "এরা কি জুতো কিনতে এসে-ছিল?" আমি বলে' উঠলাম, "দেখ্, তুই যদি তোর চটি খুলে সেই বর্বরটার দু-গালে দু-ঘা বসিয়ে দিতিস্ আমি খুব খুসী হ'তাম।" বন্ধু হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, "এ সব কি হ'ল? আপনি কেমন করে' চুপ করে' আছেন?" তিনি বললেন, "কনে' দেখতে এসেছিল। এই তিনবার হয়ে গেল।"

"একটা চৌদ্দ বছরের মেয়ের মুখ দেখতে কতক্ষণ লাগে?"

"এ সব সইতে হবে। কলিকাতার এই ধরণ।"

"আপনি অঞ্জলির ফটো তুলিয়ে রাখুন। আর, যখন ঘটক সম্বন্ধ আনবে, তখন ফটো দেবেন। বরের সগোষ্ঠী বাপ-মা সে ফটো নিরীক্ষণ করবে। আর, আপনিও বর ও তার ভাই বোনদের ফটো দেখবেন। তখন উভয়ের মন হ'লে দেনা-পাওনার কথা পাড়বেন। যখন সেখানেও মিটে যাবে, তখন কন্যা দেখাবেন।

"কলিকাতায় এ চলে না।"

"তা হ'লে দেখছি, বাড়ীতে বাড়ীতে কন্যা-প্রদর্শনী খুলতে হবে!"

সত্যই তাই। ঘটক বলে' আসে, অমুক দিন বেলা সাতটার সময়, কোথাও দশটার সময়, কোথাও দুটোর সময়, কোথাও সন্ধ্যাকালে বরের পিতা কিম্বা তার ভাই কিম্বা খুড়ো কনে' দেখতে আসবে। এরাও যথাসময়ে যায়। আর কন্যা এলোচুল করে' এসে দেখা দেয়। কখনও বা কন্যাকে দু-পাঁচটা কিছু জিজ্ঞাসা করে, কখনও বা তাও করে না। কন্যাদের এই অভিনয় অভ্যাস হয়ে যায়। মিষ্টি মুখ করাবার বালাই নাই, আর কতবার কতজনকেই বা করাবে?

এইরূপ কন্যা-প্রদর্শনী বরং সহ্য হয়, কিন্তু যখন শুনি কলিকাতার

বরের পিতা দুর্বহ কন্যার পিতাকে হুকুম করেন, "তোমার মেয়েকে এখানে আন, আমরা যেতে পারব না", তখন সেই বরের পিতাকে জাল্ম বলব, না পামর বলব, বুঝতে পারি না। যিনি কন্যার এমন অপমান করতে পারেন, তিনি শ্বশুর হবার যোগ্য নন। পাণিপ্রার্থী হয়ে বরই কন্যার গৃহে যায়, কোথাও কন্যা বরের বাড়ী যায় কি? উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে কি? সে কন্যা তাঁর পুত্রবধূ হ'তে পারে, সে পিতার এই সামান্য জ্ঞানটুকুও নাই। আর যিনি পুত্রবধূকে এইরূপ অপমান করতে পারেন, তাঁর সহিত সম্বন্ধ অবশ্য পরিত্যাজ্য। তিনি কন্যার ফটো চেয়ে পাঠাতে পারেন; তাতে মন হ'লে দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে পারেন। এই দুই কর্ম নিষ্পত্তি হ'লে আর বরের পিতা বৃদ্ধ কিম্বা গমনাগমনে অসমর্থ হ'লে কন্যাকে কলিকাতায় কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারা যায়।

বর বাছাই সম্বন্ধে এক প্রচলিত শ্লোক আছে,—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

(১) কন্যা বরের রূপ চায়। যদি তাকে স্বয়ম্বরা হ'তে বলা হয়, সে কদাপি মৃদু, ভীরু, স্ত্রী-ভাব, দীর্ঘাঙ্গ, শীর্ণ, কুব্জপৃষ্ঠ, কোটর-চক্ষু, মহিষ-বর্ণ বরের গলায় মালা দেবে না। সে চায় সুপুরুষ, অর্থাৎ রূপবান পুরুষ, যে রূপে পৌরুষ ও বিক্রম আছে। যে যুবক গোঁফ কামিয়ে নারী সাজে কিম্বা মুখে পাউডার মাখে, কন্যারা তাকে অপদার্থ মনে করে। যে যুবক 'বাটার-ফ্লাই' অথবা ইদানীর 'ডগলাস' গোঁফ রেখে মনে করে, তাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, অথবা পোশাকে ফুলবাবু সাজে, তরুণীরা তাকে ঘৃণা করে।

(২) কন্যার মাতা চান বরের বিত্ত, মেয়েটি খেয়ে পরে' সুখে থাকবে।

এই বিত্ত নূতন চাকরির বেতন নয়, চাকরি গেলেও কন্যা খেতে পাবে, সে পরিমাণে বরের সম্পত্তি থাকা চাই।

(৩) কন্যার পিতা চান বরের বিদ্যা, যা থাকলে বর সভ্য-ভব্য, সম্মানিত, মার্জিতরুচি ও বিবেকসম্পন্ন হ'তে পাবে। আকাট মূর্খের হাতে কোনও পিতা কন্যা সমর্পণ করতে চান না। যাদের বিত্ত নাই, বিদ্যাও নাই, তাদিকে কন্যা ক্রয় করতে হয়। আমরা শুনি কেবল বরপণ, কিন্তু কন্যাপণ বহু বহু প্রচলিত আছে। এত লেখাপড়ার দিনেও ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যেও আছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে লেখাপড়া-জানা কিন্তু দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে আড়াই-শ তিন-শ টাকা পণ দিয়ে তিন-চারি বৎসরের কন্যা ক্রয় করতে হ'ত। অন্য বহু জাতির মধ্যে আইবুড়া নাম ঘুচাবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বরকে তিন-চারি বৎসরের কন্যা কিনতে হয়। নানাবিধ বিবাহের মধ্যে ইহা জঘন্য বিবেচিত হ'ত। অনার্যদের মধ্যেই এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। এখনও যাদিকে অনার্য বলতে পারা যায়, তাদের মধ্যেই বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। বংশরক্ষার নিমিত্ত কদাচিৎ দ্বিজাতিরাও কন্যা ক্রয় করতেন। কন্যাপণের বদলে দু-একখানা অতিরিক্ত গয়না করে' দিলে দুঃখের দিনে তার একটা সম্বল থাকত। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতা সে টাকা আত্মসাৎ করে' কন্যা বলি দেয়। কন্যা অল্প, বর বেশী হ'লেই এই অবস্থা ঘটে। শোনা যায় ঢাকায় 'ভরার মেয়ে'র এইরূপ বলি হ'ত। দালালেরা গ্রামে গ্রামে কন্যা কিনে নিয়ে ভরায় অর্থাৎ নৌকায় করে' ঢাকায় আনত, আর সেখানে বিবাহার্থী পুরুষেরা কন্যা বেছে কিনে নিত। দালাল কাকেও বামুনের মেয়ে কাকেও অন্য জাতির মেয়ে ব'লত। তার কথাই প্রমাণ হয়ে বিয়ে হয়ে যেত। এক-শ বছর পূর্বেও নাকি এই 'ভরার মেয়ে' আসত। অন্য আকারে কন্যা-পণ উচ্চ জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। কুলীন কন্যার পিতা কুলীন বর খোজেন, না পেলে মৌলিক বরে পণ নিয়ে বিবাহ দেন।

কুলীনেরা এই পণকে কৌলিন্য মর্যাদা বলেন। কন্যা-পণের বিপরীত বর-পণ। বরের পিতা পুত্র বেচে টাকা নেন। যদি বরের পিতা সে টাকা নিজে না নিয়ে কন্যার যৌতুক করে' দিতেন, তা হ'লেও মন্দের ভাল হ'ত। কন্যার পিতা মাত্রেই এই কুপ্রথায় উৎপীড়িত হয়ে আসছেন। বরেরাই এই প্রথা উঠতে দিচ্ছে না। বর-বাবাজীরা পণ আদায় করে' আত্মগরিমা তৃপ্ত করে,—দেখ, আমাকে পাবার জন্য ভাবী শ্বশুর কত সাধেন, আমি মানী, এই জন্যই টাকা দেন। যদি তারা টাকা না চাইত, তাহ'লে তাদের বাবারাও চাইতেন না। বরের পূজা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু সে পূজা শ্বশুরকে উৎপীড়ন নয়। পূর্বে অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ হ'ত। তখন কন্যারা বরপণের প্রকৃত অর্থ বুঝত না। এখন বেশী বয়সে বিবাহ হচ্ছে। এখন তারা, বিশেষতঃ শিক্ষিতা কন্যারা বর-পণকে তাদের সম্মানের হানিকর মনে করে। কারণ এর প্রকৃত অর্থ, তাকে কেউ চায় নাই, বাবা টাকা দিয়ে ভুলিয়ে বর এনে দিয়েছেন।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পাঁচ-ছ বছর পূর্বে এক বি-এ, বি-টি পাস কন্যা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ছ-মাস পূর্বে তার বিয়ে হয়েছিল।

"কত পণ লেগেছিল

"পণ লাগে নাই।"

"এ ত আশ্চর্য কথা!"

"প্রথমে যেখানে সম্বন্ধ হয়েছিল, তারা দু-হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি সেখানে বিয়ে করতে চাই নাই। তার পর আর এক জায়গায় সম্বন্ধ হ'ল। আমার শ্বশুর ঠাকুরের আয় অল্প। তিনি বিয়ের খরচ মাত্র ছ-শ টাকা নিয়েছিলেন।"

কন্যার নিবাস বরিশালে। যদি শিক্ষিত কুমারীরা এই রকম বেঁকে বসে, তা হ'লে বর-বাবাজীদের চৈতন্য হয়।

(৪) বান্ধবেরা সৎকুল ইচ্ছা করেন। আমরা বান্ধব শব্দের অর্থ ভুলে গেছি; বন্ধু শব্দের অর্থও ভুলে গেছি। আমরা এখন যাঁদিকে কুটুম্ব বলি, তাঁরাই বান্ধব, তাঁরাই বন্ধু। এঁরা তিন প্রকার,—পিতৃ-বন্ধু, মাতৃ-বন্ধু ও শ্বশুর-বন্ধু। এই তিন কুলের তৃতীয় কুল বিবাহের পরে আসে। নীচ-কুলে বিবাহ হ'লে তাঁদেরও গৌরবের হানি হয়।

(৫) অন্যেরা বিবাহে মিষ্টান্ন ইচ্ছা করে। তারা বর-যাত্রী অর্থাৎ বিবাহ কর্মে বরের সহায় হয়। তারা কন্যার বাড়ীতে গিয়ে উত্তম চর্ব্য-চোষ্য পেতে চায়।

সকল বরের পিতাই বর-পণ দাবি করেন না। * এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে বরের পিতা কিছুই চান নাই। একবার এক কলিকাতাবাসী কন্যার পিতা বারম্বার লিখেছেন, ঘটক দিয়ে লিখিয়েছেন, নিজে এসেছেন, কিন্তু বরের পিতার এক উত্তর, "আপনার কন্যাকে যা ইচ্ছা দেবেন।" কন্যার পিতা ফাঁপরে পড়েছিলেন। এ ত নূতন কথা! তিনি ভাবলেন, এটা পাকা কথা হ'ল না, হয় ত অন্য কোথাও বিয়ের সম্বন্ধ দেখছেন। তিনি বিলম্ব না করে' কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলেন। পর দিন বর-বিদায়ের সময় আনবার জন্য বরের পিতা কন্যার বাড়ী গেছলেন। সে পাড়ার দশ-বার জন ভদ্রলোক বসেছিলেন। কন্যার পিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইনি অদ্ভুত মানুষ। আমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেছি, কত দিতে হবে? ইনি কিছুই চান নাই।" ভদ্রলোকেরা বরের পিতার দিকে চেয়ে রইলেন। তখন তিনি বললেন, "আপনি ওকথা বার বার বলছেন কেন? আমি আমার পুত্রের জন্য আপনার কন্যা প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি আপনার প্রিয় কন্যা দান করেছেন, প্রদান করেছেন, সম্প্রদান করেছেন। এর অধিক আপনি আর কি দিতে পারতেন? টাকা? রোজগার করতে পারা যায়।"

সভাস্থ ভদ্রলোকেরা বললেন, "আমরা কথাটা এভাবে কখনও ভাবিনি।"

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কামনা করেন। সে পুত্র কুল-পাবন হবে। সমাজ বা রাষ্ট্র সুজন বাঞ্ছা করেন। কেহ কুলাঙ্গার পুত্র চান না। কোনও রাষ্ট্র কুজন বা দুর্জন প্রজা ইচ্ছা করেন না। যে রাষ্ট্রের প্রজা যত সুজন, সে রাষ্ট্র তত উন্নত হয়। এইজন্য রাষ্ট্র শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজের হাতে রেখেছেন। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকলে কোনও শিক্ষায় সুফল হয় না। সুজন্ম-বিদ্যা (Eugenics) নামে এক বিদ্যা আছে। সমাজ-ব্যবস্থা কি রকম হ'লে সুজন-প্রজার সংখ্যা বাড়তে পারে, সুজন্ম-বিদ্বানেরা সে বিষয়ে চিন্তা করেন। তাঁরা দেখেছেন, বর-কন্যা সুনির্বাচিত না হ'লে সুজন উৎপন্ন হয় না। রাষ্ট্র প্রজার যে যে গুণ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, যোগ্য বরের সহিত যোগ্য কন্যার মিলন ব্যতীত প্রজায় সে সে গুণ আসে না। যুবক-যুবতীর অনুরাগ জন্মের পর যে বিবাহ, তার নাম গান্ধর্ব বিবাহ। পশ্চিমদেশে এই বিবাহ প্রচলিত আছে। সুজন্ম-বিদ্বানেরা বলেন, ফল ভাল হয় না। কারণ, দুর্বল-চিত্ত যুবক-যুবতীরাই অতি শীঘ্র পরস্পর আকৃষ্ট হয়; তাদের সন্তানেরাও সেইরূপ দুর্বল-চিত্ত হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বহুকালের ভূয়োদর্শনের ফলে প্রাজাপত্য বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বলে' গেছেন। এই বিবাহে পিতামাতা বা অন্য গুরুজন বর-কন্যা নির্বাচন করেন। ইহাতে প্রথমে বিবাহ হয়, পরে অনুরাগ জন্মে। প্রজাপতি ফড়িং নয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মাও নন। যিনি জন্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, সু-জন্মকে রক্ষা করেন এবং কু-জন্মকে বিনাশ করেন, তিনিই প্রজাপতি। বহু বহুকাল পূর্বে আর্যেরা প্রজাপতিকেই প্রধান দেবতা মনে করতেন। হিটলার প্রাজাপত্য বিবাহ দ্বারা জার্মান জাতিকে আর্য করতে চেয়েছিলেন।

আধুনিকারা মনে করতে পারে, "কি সর্বনাশ! যাকে দেখলাম না, চিনলাম না, তার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে?" তারা ভাবে না, আমাদের দেশে শত শত বৎসর ধরে' কোটি কোটি নর-নারী প্রাজাপত্য

বিবাহ করে' আসছে ; তারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। দম্পতীর মনান্তর হয় না, এমন নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত ? পশ্চিম-দেশে পাণিপ্রার্থী হয়ে বর কন্যার নিকটে যাতায়াত করে। পরে উভয়ে সম্মত হ'লে তাদের বিবাহ হয়। তবে কেন তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় ? এত দেখা-শোনা, এত মেলা-মেশার পর বিবাহ, তথাপি কেন তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে চায় ?

অধুনা কন্যাদের বেশী বয়সে বিবাহ হচ্ছে। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা অবশ্য জানতে হবে। প্রথমে পিতামাতা বরকন্যার ঘর-বর উত্তমরূপে বাছবেন। তার পর কন্যা বর দেখবে, বরও কন্যা দেখবে। প্রথম দৃষ্টিতেই যার প্রতি বিরাগ জন্মে তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নয়। কন্যার মত ও বরের মত অবশ্য জানতে হবে। তারা সম্মত হ'লে বিবাহ হবে।

কেহ কেহ মনে করেন, ইংরেজী লেখাপড়া শিখলেই কন্যা প্রাজাপত্য-বিবাহের বিরোধী হয়, ইংরেজী-শিক্ষিতা কন্যা গান্ধর্ব-বিবাহ চায়, আর সেরূপ বিবাহ না হ'লে চিরকুমারী থাকতে চায়। এ ধারণা ভুল। আমি গোটা দুই উদাহরণ দিচ্ছি।

১। এক কন্যা ম্যাট্রিক পাস। বাংলা শিখতে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। আমার চিঠি লিখে দিত, প্রবন্ধও লিখে দিত। আমাকে দাদু ব'লত। এক দিন শুনলাম, তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে।

"দাদু, দেখছি তারা ভারি লোভী। তারা শুধু তোমাকে চায় না, পঞ্চাশ ভরি সোনাও চায়। তাদের বুদ্ধি একটু মোটা। এই পঞ্চাশ ভরির মধ্যে সেকরা অন্ততঃ দশ ভরি চুরি করবে। এখন পঞ্চাশ ভরি সোনার দাম পাঁচ হাজার টাকা, দশ বৎসর পরে চল্লিশ ভরির দাম হবে এক হাজার টাকা। তখন ঠকে' যাবে। যদি তোমার নামে পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ চাইত, তা হ'লে বরাবরই সেই দাম থাকত,

আর বছর বছর সুদও আসত। আর, পাঁচ হাজার টাকার সোনা নিয়ে তোমাকে চোরের ভয়ও করতে হ'ত না। বর তোমাকে দেখতে এসেছিল ?"

"হাঁ।"

"কেমন দেখলে ?"

"কেমন আবার কি ? আমি কি বাবার চেয়ে বেশী বুঝি ?"

নিরূপিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল। আমি পর দিন সকালবেলা বর দেখতে গেলাম। বর চেনা খুব সোজা। আমি তার ডান হাতখানা জোরে ধরে' বললাম, "তুমি কে হে ? তোমাকে যে নূতন দেখছি, তোমার ঘর কোথা ? কেন এসেছ ?"

বর হতভম্ব। মাধু কপাটের আড়াল হ'তে সুড়-সুড় করে' এসে আমাকে প্রণাম করে' দাঁড়াল। বর আমার প্রশ্নবাণ হ'তে বেঁচে গেল।

"ওহে বর, এটি আমার শুধু নাতনী নয়, আমার অনুলেখিকা। এই বুঝে যত্নে রাখবে।"

বিয়ের পর প্রায় দুই বৎসর হয়ে গেল। মাধু আমাকে চিঠি লেখে, মাঝে মাঝে আসে, আমার সঙ্গে দেখা করে। সে বেশ আছে, শ্বশুর-বাড়ীতে যত্নে আছে।

২। মেয়েটি এম-এ পাস। এখানে কলেজে পড়ত, সেই সময় হ'তে আমি তার দাদু। বি-এ পাস হবার পরে বৎসর দেড়েক মেলেরিয়া না কি এক রোগে ভুগেছিল। সেরে গেলে কলিকাতায় এম-এ পড়তে দু' বৎসর ছিল। এম-এ পাস হবার কিছু পরে তার বাড়ী হ'তে আমাকে লিখলে, "আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। শুনছি, সব ভাল। বাঁকুড়ায় বিয়ে হবে, তখন দেখা হবে।" তার বিয়ের দু-তিন দিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুধালাম।

"বাধু, বর তোমাকে দেখতে এসেছিল ?"

"না।"

"কে এসেছিল ?"

"বরের খুড়ো।"

"কে বর দেখতে গেছল ?"

"বাবা।"

"তুমি বর দেখ নাই ?"

"না।"

"তোমার দেখতে ইচ্ছা হ'ত না ?"

"হ'ত, কিন্তু ভাবতাম, দু-পাঁচ মিনিট দেখে কি জানব ? আর, তুই পক্ষেরই মতে বিয়ের আগে বর কনে'র দেখা ভাল নয়।"

"বাঃ ! বেশ তো যোগ ঘটেছে !"

"বাবা বলছিলেন, 'আমার সঙ্গে কলিকাতায় আয়, কি রকম শাড়ী চাস, বেছে নিবি।' আমি বললাম, 'যার সঙ্গে চিরজীবন কাটাতে হবে, আমি তাকেই দেখলাম না, আর একটা শাড়ী বাছতে কলিকাতা যাব ? শাড়ী কিনতে পাওয়া যায়।"

নিরূপিত দিনে বিয়ে হয়ে গেল। পর দিন সকালবেলা বাধু বরকে নিয়ে আমাকে প্রণাম করতে এল। এসেই বলছে, "আমি যা চেয়েছিলাম, তার থেকে অনেক গুণ বেশী পেয়েছি।"

"দেখ, এই কথাটি চিরদিন স্মরণ রাখবে, তুমি সুখী হবে। কিন্তু ঐ লোকটির সামনে বলা ভাল হয় নাই, ওর বুক ফুলে উঠবে। আর একটি কথা মনে রেখো, জগদম্বা নারীকে সংযম ও সহিষ্ণুতা গুণ দিয়েছেন। কখনও ভুলবে না।"

"সীমা ?"

"যতদুর বাড়াতে পার, ততই ভাল।"

বিয়ের পর প্রায় এক বৎসর হ'তে চলল। রাধুর দু-তিনখানা চিঠি পেয়েছি, এই ফাল্গুন মাসে একখানা পেয়েছি। তাতে লিখেছে, "আমার শ্বশুর-শাশুড়ী দু'জনেই বৃদ্ধ। আমি তাঁদের সেবা করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাড়ীর পরিজনেরাও আমাকে ভালবাসে।" প্রত্যেক চিঠিতেই স্বামীর কথা থাকে, সম্ভ্রমের সহিত থাকে। বেশী বয়সে বিবাহে ভাবোচ্ছ্বাস থাকে না।

এই দুই বিবাহ-সংবাদ পড়ে' উচ্চ-শিক্ষিতা অথবা বিলাত-প্রত্যাগতা মহিলা হয়ত সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁরা বলবেন, এই দুই কন্যা দেশের কু-সংস্কারের হাড়িকাঠে আপনাদিকে বলি দিয়েছে। যেখানে self-realization নাই, সেখানে সন্তোষের সার্থকতাও নাই।"

আমি ইংরেজী বুলি ডরাই, বুঝতে পারি না। এই শব্দের বাংলা না শুনলে অন্ধকারে থাকতে হয়। এ কি আত্মসিদ্ধি, না আত্মোপলব্ধি? এতেও অর্থপ্রকাশ হ'ল না। আত্মসিদ্ধি, অর্থাৎ আমি যেমন চাই, তেমন পাওয়া। বোধ হয় মহিলারা self-realization শব্দের এই অর্থ করে' থাকেন। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা আছে কি? না, তার তৃপ্তি আছে? এক স্থানে সীমা-রেখা টানতেই হবে। কে সে রেখা টানবে? বিবাহের পর যে অনুরাগ জন্মে, সেটা কি মিথ্যা, কাল্পনিক?

৩

নর-নারীর বিবাহ-ইচ্ছা স্বাভাবিক ধর্ম। এত কাল আমাদের দেশে কোনও কন্যা অবিবাহিত থাকত না। প্রায় কোন পুত্রও থাকত না। কদাচিৎ কোনও কোনও পুরুষকে কন্যার অভাবে কিম্বা অন্য কারণে আইবুড়া থাকতে হ'ত, কিন্তু কোনও কন্যাকে থাকতে দেখা যেত না। রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ কন্যার বিবাহ হ'ত না।

কিন্তু গত ১০।১২ বৎসর হ'তে কোন কোন সুস্থ কন্যারও বিবাহ হচ্ছে না। এত দিন কেবল যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবার জন্য কলেজে পড়ছিল। ডিগ্রি না পেলে চাকরি পাবে না, আর চাকরি না পেলে খেতে পাবে না। এই দারুণ দুশ্চিন্তায় তারা পঠদ্দশা শেষ করছিল। এখন কন্যাদের বিবাহের বয়স বেড়ে গেছে। তারা দেখছে, শুনছে, তাদের বিবাহ অনিশ্চিত, তাদের বিবাহ হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। বিবাহ না হ'লে তাদের কি দশা হবে, এই দারুণ চিন্তায় তারাও কাতর হয়ে পড়েছে। যাদের সুযোগ আছে, তারা কলেজে ঢুকছে। তারাও ভাবছে, পরে কি হবে।

শ্রীমতী দীপ্তি কলেজে পড়ে। চোখে, মুখে, কথায় দীপ্তিই বটে। কিন্তু যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা উঠে, তখনই তার দীপ্তি ম্লান হয়। সে বলে, "পাস হ'তেই হবে, একটা আশ্রয় করে' রাখতে হবে।"

শ্রীমতী কান্তি বি-এ পড়ে। সে স্বভাবতঃ গম্ভীর। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় পড়ছ, না বাবার ইচ্ছায় ?"

"বাবা কিছু বলেন নাই। আমি নিজের ইচ্ছায় পড়ছি।"

"কেন ইচ্ছা হ'ল ?"

"একটা ত কিছু করতে হবে।"

অর্থাৎ, পরে কি হবে, কে জানে।

শ্রীমতী দীপ্তি ও কান্তির রূপ আছে, রূপেয়াও আছে, তথাপি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেহ কেহ ধরে' নিয়েছে, চাকরি করতেই হবে। শ্রীমতী চিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বি-এ পড়ছ কেন ?"

"বিদ্বান্ হ'তে হবে।"

"তার পর ?"

"ভবিতব্যে যা আছে, হবে।"

অর্থাৎ, পরে সে শিক্ষিকা হ'তে পারবে।

অল্পকাল পূর্বেও কুমারীরা শিব-পূজা করত। এখনও কেহ কেহ করে। তারা চায় মহেশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্যশালী স্বামী, আর উমার তুল্য স্বামী-সৌভাগ্য। এইরূপে উমা-মহেশ্বর প্রতিমা কল্পিত হয়েছিল। এখন সব অনিশ্চিত।

কোন কোন কন্যা নিজের বিবাহের পথ নিজেই পরিষ্কার করে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক কন্যা কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত, এটা ওটা জিজ্ঞাসা করত। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সে একদিন ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ নিয়ে গেল। মাস দুই পরে এসে বলছে—"দাদু, আমি পুরাণ-পরীক্ষায় পাস হয়েছি, 'ভারতী' উপাধি পেয়েছি।"

"বেশ, এখন তোমায় ডাকব, শ্রীমতী নির্মলা ভারতী।"

"আমার লজ্জা করবে।"

সে বি-এ পাস হ'ল। দু-এক দিন যেতে না যেতে এসে বলছে, "দাদু, আমরা একটা ত্রৈমাসিক-পত্র বা'র করব। আপনি একটা নাম বলে' দিন।"

"তোমরা কারা ?"

"আমাদের কমিটি আছে, তারা মহিলা, আপনি চিনবেন না। আমি সম্পাদিকা হব।"

"তোমায় এ বায়ু রোগে কেন ধরল ? রোগটি দুশ্চিকিৎস্য। এই রোগে ধরলে রোগী মনে করে, সে অতিশয় বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ, তার লেখকদের রচনা বিচার করবার ক্ষমতা আছে, তার নাম ও প্রতিপত্তি আছে। উত্তম লোকেরা তার কাগজে লিখবে, আর শত শত পাঠক উদ্গ্রীব হয়ে পড়বে। তুমি সম্পাদিকা, তোমার এ সব আছে কি ? এই বাঁকুড়ায় কত কাগজ এল, গেল। তুমি মনে করছ, তোমার কাগজের সে দশা হবে না ?"

"জলে না নামলে সাঁতার শিখব কেমন করে' ?"

"দেখছি, রোগটি পেকে দাঁড়িয়েছে। আমি নাম টাম বলতে পারব না।"

"আপনি না পারলে কে পারবে ?"

"আমি কি জানি ?"

"আপনি না জানলে কে জানবে ?"

শ্রীমতী নির্মলার এই অসামান্য যুক্তিজাল ছিঁড়তে পারলাম না। তার জলবিম্ব কাগজের নাম দিতে হ'ল। আর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য দুটি ছোট ছোট প্রবন্ধও লিখতে হ'ল।

তৃতীয় বারে আর এল না। তার জলবিম্ব মিলিয়ে গেল। শুনলাম, সে এম্-এ পড়তে কলিকাতা গেছে। দু-বৎসর পরে এম্-এ পরীক্ষা দিয়েই এসেছে। কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলছে, "দাদু, আমি ভাল লিখতে পারি নি। যদি ফেল হই, কি হবে ?"

"সর্বনাশ! করেছ কি ? পৃথিবীর ঘূর্ণন রুদ্ধ হবে, দিবারাত্রির বিচ্ছেদ থাকবে না।"

"আমার কি হবে ?"

"তুমি আবার পড়বে। না পার, দাদার কাছে থাকবে। দাদার বড় চাকরি, তিনি তোমায় ভালবাসেন, তোমার বউদিদিও যত্ন করেন।"

"আমি দু-তিন মাসের বেশী থাকতে পারব না।"

"তুমি কি স্বাতন্ত্র্য চাও ?"

চুপ করে' রইল। আমি তখন বুঝলাম, কোথাকার জল কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। মাস দুই পরে শুনলাম সে এম্-এ পাস হয়েছে। ছ-সাত মাস পরে তার বিয়ে হয়ে গেল।

বিবাহেচ্ছার কাল আছে। নারীর পনর হ'তে কুড়ি বৎসর, নরের কুড়ি হ'তে পঁচিশ বৎসর বলা যেতে পারে। এই এই বয়সেই তাদের চিত্তে

বসন্তের হিল্লোল বইতে থাকে। তখন যা দেখে, সব সুন্দর। যদি সন্ন্যাসী হয়, ত এই সময়। আর, যদি প্রাণ দিতে হয়, তা-ও এই সময়। কারও এই বয়স এগিয়ে যায়, কারও পেছিয়ে পড়ে। কেহ অকাল-পক্ক হয়, কেহ কালাপক্ক থাকে।

এখন সকল কন্যার বিবাহ হচ্ছে না, সমাজে এক নূতন দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। কোন কোন কন্যা বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু যখনই এ কথা শুনি, তখনই বুঝি সে প্রকৃতিস্থ নয়।

আমরা মানব জাতিকে নর ও নারী, এই দুই ভাগ করি। কিন্তু অনেক নর নারীভাবাপন্ন, তারা কা-নর। তারা যৌবনেও বিবাহের জন্য ব্যগ্র হয় না। তেমনই, কোন কোন নারী নরভাবাপন্ন, তারা কা-নারী। তারা সাহসী হয়, পুরুষোচিত কাজ করতে ধাবিত হয়। কখনও উত্তেজনা-বশে স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতির বিপরীত কাজ করে, এরা বিবাহ করতে চায় না, কিন্তু বয়স বাড়লে বিবাহের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়।

আর, কোন কোন কুমারী নৈরাশ্যে, দুঃখে কিংবা ভয়ে বিবাহ হ'তে দূরে থাকতে চায়। এই অনিচ্ছা সাময়িক বলতে পারা যায়। পরে নারী-প্রকৃতির জয় হয়, সুবিধা হ'লেই তারা বিবাহ করে।

নৈরাশ্যের দুই কারণ আছে। (১) কুমারী যাকে চায়, তাকে পাবার সম্ভাবনা নাই। (২) যেমন ঘরের যেমন বর চায়, তেমন পাবার সম্ভাবনা নাই।

দুঃখের দুই কারণ। (১) কন্যার মা নাই, ছোট ভাই-বোন আছে। পিতাকে তাদের দেখাশুনার কষ্ট দিতে চায় না। নিজে বিয়ে না করে' তা'দিকে পালন করতে চায়। (২) কন্যা বিবাহের খরচ দেখছে; শুনছে, কোন কোন পিতা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। সে পিতাকে সে দশায় ফেলতে চায় না।

ভয়ের নানাবিধ কারণ আছে। (১) কুমারী দেখছে, তার পরিচিত

এক নারীর স্বামী কু-সঙ্গে পড়ে' দুশ্চরিত্র হয়েছে, তাকে যন্ত্রণা দেয়। তখন সে ভাবে, "না বাপু, বিয়েতে কাজ নাই, আমি বেশ আছি।" (২) কখনও দেখে, তার পরিচিত এক অল্পবয়সী কন্যা বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হয়েছে। সে বিধবার দুঃখ দেখে, নিজে অনুভব করে। সে দশা তারও হ'তে পারে, সে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিতে ডরায়। (৩) দেখেছে, বিবাহের পরেই কন্যা কোনও গুরুতর শোক পেয়েছে। বিবাহের সঙ্গে শোকের কারণ জড়িয়ে রাখে, বিয়ে করতে ভয় পায়। আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১। এগার বৎসর হ'ল শ্রীমতী প্রীতি এখানকার কলেজে পড়ত। সে একটা সূত্র ধরে' আমাকে 'দাদু'-পদে প্রতিষ্ঠিত করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তার সঙ্গিনীদেরও দাদু হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে তিন-চারিজন আসত, একথা সেকথা হ'ত, চলে' যেত। কুমারীদের বয়স যতই হউক, আমি কারও সাথে বিবাহ-প্রসঙ্গ করি না।

একদিন তারা বললে, তারা এক তরুণী-সঙ্ঘ করেছে। শনিবারে শনিবারে তাদের সঙ্ঘ বসে। নানা বিষয় আলোচনা করে, গান-বাজনাও করে। সেখানে পুরুষ-প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তাদের মধ্যে চারিজন কলেজে পড়ত। একজন, বোধ হয়, এম-এ পাস। আমি তাকে দেখিনি। অপর সভ্যারা অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানত, আর বাংলা গল্প-উপন্যাসের শ্রাদ্ধ করত। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা, বিয়ে করবে না। তাদের মধ্যে দু-তিন জন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দেশে এত দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পাচ্ছে, আর তারা বিয়ে করে' ঘরের বউ হয়ে থাকবে?

'সেই সময়ে (১৯৪৩?) জাপানীরা কলিকাতায় বোমা ফেলছিল। কলিকাতাবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেখানে পারে পালিয়ে যাচ্ছিল। জাপানীরা এল বলে'। লাটসাহেবের হুকুমে নোয়াখালির শত শত নৌকা

জলে ডুবল। চাউলের হাজার হাজার বস্তা নদীগর্ভে ফেলা হ'ল। জাপানীরা এলে যানবাহনের নৌকা পাবে না, খেতে পাবে না। দেশময় সন্ত্রাস। আমরা বাঁকুড়ায় ভাবতাম, জাপানীরা রাণীগঞ্জের লোহার কারখানা দখল করবে, তার নিশ্চয় এই পথ দিয়ে জামসেদপুর যাবে। জাপানী সৈন্যেরা নৃশংস, দুরাচার। পথে যে-কেহ, স্ত্রীর কথাই নাই, বৃদ্ধ বা শিশু পড়বে, তাদের হাতে কারও রক্ষা হবে না। এক দিন প্রীতি ও তার তিন-চারিজন সঙ্গিনী এসে বললে, "দাদু, শুনছেন দেশের অবস্থা? পুরুষেরা যে যেখানে পারে পালাবে, কে আমাদিকে রক্ষা করবে? আপনারা আসবেন না, নিশ্চয়। আমরা নিজেরা নিজেদিকে রক্ষা করবার উপায় ভাবছি। ছোরা-খেলা শিখছি। তীর-ধনুক শেখাবার লোক পাচ্ছি না।" আমি নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। কিন্তু তাদের এই সঙ্কল্প শুনে মনে মনে তাদের প্রশংসা করতে লাগলাম। বোধ হয় সে সময়ে কলিকাতায় ও অপর স্থানে "মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতি" হয়েছিল। তরুণী-সঙ্ঘও সেইরূপ সমিতি করেছিল। এখন মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতির দুর্নাম হয়েছে, তারা কম্যুনিষ্ট, কিন্তু আরম্ভে এ ভাব ছিল না।

এক দিন প্রীতি ও তার সঙ্গিনীরা এসে একখানা ত্রৈমাসিকপত্র দিয়ে বললে, "দাদু, আশীর্বাদ করুন।"

ছাপাখানা হ'তে কাগজটা ছাপা হয়ে এসেছে। তারপর আর যা কিছু কাজ, তারা নিজেরাই করেছে। আমি আদ্যোপান্ত পড়লাম। আর আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কাগজে একটি ভুল নাই। অর্থনীতির আলোচনা হয়েছে, দেশের দুঃখ-দুর্দশাও সুন্দর ভাষায় লেখা হয়েছে। একটা উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর কবিতাও আছে। কলেজে তিনজন অর্থনীতির বই পড়ত, তাদের পত্রে তারই কাঁচা আলোচনা থাকত। একজন লিখেছে, "আমাদের অন্যের ভরসা করা চলবে না, নিজেদিকে দেখে শুনে নিতে হবে।" উপন্যাসে দেখলাম, এক ধনীর

দুলালী এক দেশ-সেবক দরিদ্র যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সব রচনাই নারীর। এখানেও পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

তরুণ-তরুণীরা কবিতা ও গল্পে নানাদিক প্রকাশ করে। তারা যা চায়, সেটা বেরিয়ে পড়ে। আমি বুঝলাম এদের এই আস্ফালন, সেটা সাময়িক। যৌবনের চাঞ্চল্য, কিছু বলতে চায়।

আর এক দিন তারা চার জন এসেছে। তাদের মধ্যে যে দেখে শুনে নিতে চায়, সে আসে নাই।

"সে তেজস্বিনী আজ আসে নাই ?"

"তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"বাঁচা গেল! এখন দিন-রাত দেখে-শুনে নিক।"

তারা হেসে উঠল।

কিছুদিন পরে এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক চাকর-সঙ্গে তাদের একজন এল। সে কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়ত। সে কবি, 'তৃষিত হাসনা-হানার গন্ধে' লিখত। আমি বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। সে পাশে বসে' বললে, "দাদু, আমি শুনেছি, আপনি জ্যোতিষ জানেন, আমার হাতটা দেখুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলে। আমি বুঝলাম, সে কি জানতে চায়। সে বিষয় নিয়ে হাসি-খেলা উচিত নয়।

"হাত-গণা, কোষ্ঠী-গণায় তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে ? যদি থাকে, তা হ'লে এও বিশ্বাস করতে হবে, তোমার জন্মকালেই তোমার যাবজ্জীবনের দশা নিরূপিত হয়ে গেছে। কারও সাধ্য নাই, তার অন্যথা করে। যদি সুখ থাকে, সুখ আসবেই। যদি দুঃখ থাকে, দুঃখ আসবেই। যখন দুঃখের প্রতিকার নাই, তখন আগে হ'তে সেটা জেনে দুঃখ বাড়িয়ে ফল কি ?"

সে বিষণ্ণ-মুখে চলে' গেল।

কিছুদিন পরে তার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সে অন্য স্থানে চলে' গেল। সে পাস হ'ল। আর শুনলাম তার বিয়েও হয়ে গেছে।

তরুণী-সঙ্ঘের ছুটি থসল। এম-এ পাস মেয়েটির অভিভাবক বদলি হয়ে গেলেন, সেও গেল। এক বৎসর পরে তার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। যে তাদের কাগজে উপন্যাস লিখছিল সে ধনীর দুলালী, নিকটের এক যুবকের সহিত বিবাহ-পাশে বদ্ধ হ'ল। সে উপন্যাসে একেই চেয়েছিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘ ভেঙ্গে গেল তাদের ত্রৈমাসিকপত্রও ছয় সংখ্যার পর অদৃশ্য হ'ল। দু'জন অচল-অটল। দেখতে সুশ্রী, নির্ধনও নয়, অক্লেশে বিয়ে হতে পারত। কিন্তু তারা দেশসেবা ছাড়তে পারবে না। আর, যে কিছু করত না, তাও নয়। সে বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এখানে তিন-চারি জায়গায় অন্নসত্র খোলা হয়েছিল। তারা এক সত্র চালাবার ভার নিয়েছিল। তাদের কড়া নজরে একটি দানাও চুরি হয় নাই। আর একবার জল-ঝড়ে অনেক দরিদ্র লোকের চাল উড়ে গেছল। ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে, স্থান ছিল না। কেউ দেখে না। এরা এক দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যেয়ে তাদের দুঃখের কথা জানিয়ে প্রায় হাজার দুই টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনলে। এই রকম কাজ করত, আর কাজের অভাব হ'লেই ছটফট্ করত। আমি সব জানতাম না, তারা আমার কাছে সর্বদা আসত না।

এক দিন কি উপলক্ষ্যে শ্রীমতী প্রীতি সকালবেলা আমার কাছে এসেছিল। একটা খবরের কাগজ পড়তে লাগল। আমি একটু দূরে কি কাজ করছিলাম। পড়তে পড়তে সে বললে, "দাদু, Love marriage is never happy." (প্রেম-বিবাহ কখনও সুখের হয় না)।

"তোমার সে চিন্তা কেন ?"

"না দাদু, আমি পাঁচ-ছ'টা কেস (case) জানি। প্রথম প্রথম

বেশ ছিল, তারপর খিটিমিটি। তারপর এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ কারও মুখ দেখে না।"

তার কথায় বুঝলাম, সে বিয়ে কবতে চা., কিন্তু ঠিক করতে পারছে না। ইতিমধ্যে অপরটি খসে' ছিল। আরও মাস কতক পরে শ্রীমতী প্রীতিও খসল। বোধ হয়, ভর বিবাহে দ্বেষ-ভাবের গূঢ় কারণ হয়েছিল, উত্তেজনা একটা কাল্পনিক আবরণ। তারা সময়ে বিয়ে করে'ও দেশসেবা করতে পারত।

২। কন্যাটি এম-এ পাস, এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় নাই। শুনলাম, সে এক সন্ন্যাসিনীর শিষ্যা হয়েছে, সন্ন্যাসিনীর মত দিন কাটাচ্ছে। এক দিন যেয়ে দেখলাম, সরু নরুন-পেড়ে ধুতী পরে' আছে। মাথার চুল রুক্ষ, পিঠে এলিয়ে পড়েছে। মুখ নিষ্প্রভ। সে 'রাঙ্গাবাস' পরলে তাকে যোগিনী মনে হ'ত। আমি একবার তাকে হাসাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছল। এক দিন শুনলাম, গোপনে তার বিয়ে হয়ে গেছে। বর ও কন্যার পিতামাতা এ সংবাদ শুনে মর্মাহত হয়েছেন। বিবাহের সময় কন্যার বয়স ৩৬ বৎসর হয়েছিল। বোধ হয়, এতকাল পরে বিবাহেচ্ছা প্রকাশ করতে লজ্জিত হয়েছিল। বিবাহের বৎসর দেড়েক পরে আমি তাকে দেখতে গেছলাম। তখন সে রঙ্গিন শাড়ী ও হাতে দু-একখানা গয়না পরেছিল। আমি গেলে তার মুখে হাসিও ফুটে উঠেছিল।

"দেখ, তুমি লেখাপড়ায় এত রত ছিলে, সে প্রবৃত্তি কোথায় গেল ?"

নিকটে একটি ছোট খাটে এক শিশু শুয়ে ছিল। সে তাকে দেখিয়ে দিলে। সে পুনঃ পুনঃ শিশুর প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, উত্তর দিলে না।

এই রকম আরও শুনেছি। দুটি উচ্চশিক্ষিতার কথা মনে পড়ছে। দু-জনেই দেশপ্রেমী, দু-জনেই দেশহিতব্রত গ্রহণ করেছিল, নিজেদের সুখ

চিন্তা করে নাই। কিন্তু ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিবাহ করে' ঘরকন্না করছে।

গান্ধর্ব-বিবাহ ও প্রেম-বিবাহ এক নয়। গান্ধর্ব-বিবাহে গুরুজনেরা বর-কন্যা বাছেন না, তারা নিজেরাই বাছে। অন্য বিষয়ে অপর বিবাহের তুল্য। সবর্ণে বিবাহ, কদাচিৎ অনুলোম বিবাহ হ'ত। বর অবশ্য দেখে, কন্যা তার পিতার সাত পুরুষের ও মাতার পাঁচ পুরুষের মধ্যে না হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক বিধি প্রায় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। কাম গান্ধর্ব বিবাহের ঘটক। প্রেম-বিবাহেও সে-ই ঘটক, কিন্তু অন্ধ। জাতি, কুল, শীল, বয়স, আয় ইত্যাদির বিচার করে না, পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাস্তবিক প্রেম নয়, রূপজ মোহ অর্থাৎ কাম। প্রকৃত প্রেম প্রেমাস্পদের হিতকামনা করে; কাম আত্মসুখ চিন্তা করে। প্রেম, স্নেহ, দয়া, সব এক জাতীয়। অন্যের সুখের নিমিত্ত নিজের সুখ ত্যাগ করে। দাম্পত্যপ্রেম, সন্তান স্নেহ, দুঃখীর প্রতি দয়া, এ সকলেই ত্যাগ আছে।

কোন কারণে বিবাহ না হলে সকল কন্যারই শূন্য হৃদয় হাহাকার করতে থাকে। বালবিধবাদেরও সেই দুঃখ, যে দুঃখ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। কেহ কেহ মনে করেন, প্রেম-বিবাহ প্রচলিত হলে বিবাহ-সমস্যার পূরণ হবে। তাঁরা ভ্রান্ত। পশ্চিমদেশে প্রেম-বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু অসংখ্য বৃদ্ধা কুমারীও আছে। যাদের হয়েছে, তারা সকলেই সুখী নয়।

শিক্ষিত বংশের ও নগরবাসীর কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা করছি। তাদেরই বিবাহ এক সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। অশিক্ষিত কিম্বা গ্রামবাসীদের মধ্যে এ সমস্যা নাই। মেয়ে গোরা কি কালো, সে চিন্তাও তত প্রবল নয়।

কন্যাদের বিবাহ হচ্ছে না, কারণ যুবকেরা বিবাহ করতে চায় না।

পিতা পুত্রকে বলছেন, "বাপু, তোমার বয়স হয়েছে, যথেষ্ট টাকাও আনছ, এখন বিবাহ কর।"

পুত্র বলে, "এই ত বেশ আছি।" পিতা নিরুত্তর। পুত্র ভাবছে না, সে ভোগ সুখে আছে, সিনেমা দেখছে, প্রেমের [illegible] গল্প পড়ছে, সে কি চিরদিন 'বেশ' থাকতে পারবে? কত সন্ন্যাসী ভোগ-সুখ হ'তে বিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারে নাই, আর, সে পারবে? এরূপ, আমার এক পুত্রের মাতা পুত্রকে বার বার বলে'ও তাকে বিবাহে সম্মত করাতে পারেন নাই। পুত্র বলে, "বিয়ে করলেই হবে, এমন কি আছে? এই যে কত লোক বিয়ে করে নাই।"

যখন ২৫।৩০ বৎসর হয়েছে, টাকা আছে, দেহে বিশেষ রোগও নাই, এরূপ যুবকেরা বিবাহে অনিচ্ছুক হ'লে বুঝতে হবে নিগূঢ় কারণ আছে, পিতামাতা জানেন না। এযে প্রকৃতির বৈপরীত্য! সকলের এক কারণ নয়। কেহ এক 'সাধুর' গ্রন্থ পড়েছে, শিখেছে, সংসারাশ্রম ভাল নয়। কেহ বা [illegible] মুখে শুনেছে, সে অল্পায়ু। কেহ অলভ্য ফল-প্রাপ্তির আশায় বসে' আছে। কেহ কোন গোপনীয় রোগের আশঙ্কা করে। কেহ কুসংসর্গে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে, আর কেহ বা রূপের মোহে কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। যারা সদা অসন্তুষ্ট কিংবা শঙ্কিত, তাদের বিবাহ সুখের হয় না।

সাধারণতঃ যুবকদের বিবাহে অনিচ্ছার তিন কারণ দেখতে পাওয়া যায়।

১। যুবকদের মনোভাবের পরিবর্তন। তারা আত্মস্তরি হয়েছে।

২। ভয়। "যাকে বিয়ে করব, সে কেমন হবে, কে জানে?"

৩। দেশের দারিদ্র্য।

(১) যুবকদের বিবাহের একটা সময় আছে। সে বয়স পেরিয়ে গেলে সে বিবাহের জমা-খরচ করতে বসে। ভাবে, একটি পরের মেয়ের

অশন-বসন-ভূষণ-প্রসাধন যোগাতে পারলেও তাকেই তার পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করতে হবে। আজ ভুতোর জ্বর, কাল ছেনীর কাসি, ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি। সে যে কি খরচ আর কি উদ্‌বেগ! বাবা! আমি একা মানুষ, এত পেরে উঠব কি করে'? বেশ আছি। সকালে চা খাই, খবরের কাগজ পড়ি' দশটার সময় হোটেলে খাই, আপিসে যাই, ৪টার সময় ফিবি, বন্ধুরা আসে, চা পান করি, সকলে মিলে সিনেমা দেখতে যাই। আবার হোটেলে খেয়ে বাড়ী ফিরি। আর, সিনেমা-নক্ষত্রদের রূপ ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। বেশ আছি, নির্ঝঞ্ঝাট। ছুটি পেলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে' যাচ্ছি, কেউ পেছু ডাকে না। এই তো স্বাধীনতা।

কিন্তু বছর দশ পরে এই নিঃসঙ্গ-দশা ভাল লাগে না। তখন সে এক সঙ্গিনী খোজে। আপিস হ'তে ফিরে এসে সে এমন একজনের অভাব বোধ করে, যাকে নিয়ে তার শূন্য গৃহ পূর্ণ করতে পারে। ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স হ'লে বিয়ে না করে' থাক্‌তে পারে না। যেমনই হউক, নিজের একটি বাসায় কপোত-কপোতীর ন্যায় সুখে-শান্তিতে কাল কাটাতে চায়।

(২) কেহ কেহ দেখে, বিবাহ করা আর অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। তিনি যে কেমন হবেন, কিছুই জানা নাই। সকল নারীই সুশীলা নয়, সকল নারীই পতিগতপ্রাণা নয়। সংস্কৃতে একটা বচন আছে, "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য, দেবতারা জানেন না, মানুষের কথা কি। এই দেখ না, মিহিরের কি দশা হয়েছে। স্ত্রীটি রত্নই বটে, দিন রাত মানেই বসে' থাকেন। বুঝতে হবে, তিনি কি চান। মিহির বেচারী কতই বা মান ভাঙ্গাবে? তার দশা দেখে কান্না পায়। আমি বিহঙ্গম, স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াই, আর, সে পিঞ্জরের পাখী। আরও দেখছি, কত পরিবারে খিটিমিটি লেগেই আছে। যেখানে এত অনিশ্চিত, সেখানে কেন যাই?

সত্য বটে, বিবাহরূপ ব্যাপারে অনেক অনিশ্চিত থাকে। তথাপি লোকে বিবাহ করে, অধিকাংশ লোক সুখে-শান্তিতে জীবন কাটায়। আমাদের জীবনের পদে পদেই অনিশ্চিত। কাল কি ঘটবে, কেউ জানে না। কিন্তু সর্বদা কি ঘটে, সেই দেখেই আমরা জীব-যাত্রা নির্বাহ করি। ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা জানবার জন্য পূর্বকালে লোকে ব্যাকুল হ'ত, এখনও হয়। এই কারণেই লোকে বরকন্যার কোষ্ঠী নিয়ে দৈবজ্ঞের বাড়ী যায়। কিন্তু গণনার ফল মেলে না, এই নিমিত্ত বিবাহের পূর্বে বরকন্যা বাছাই করে। প্রেম-বিবাহের দোষই এই, সেখানে বাছাই নাই, সমস্তই অন্ধকার। অতি অল্প লোকে, যারা দুর্বল-চিত্ত, তারাই ভবিষ্যতের ভয় করে। যৌবনে সাহস বাড়ে। ভবিষ্যতের ভয় সাময়িক দুর্বলতা। সুবিধা হ'লেই তারা বিবাহ করে।

(৩) দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই কন্যাদের বিবাহের প্রধান অন্তরায় হয়েছে। যে আপনাকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না, সে আর একটির ভার কেমনে নিবে ? যারা ধনবান, তাদের কন্যাদের বিবাহ আটকাচ্ছে না। আর, যারা কায়িক পরিশ্রম করে' জীবনযাত্রা নির্বাহ করে' তাদেরও বিবাহ আটকাচ্ছে না। যে মধ্য-শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড হয়েছিল, তাদের দুর্দশার সীমা নাই। আর, তাদেরই কন্যাদের বিবাহ দুর্ঘট হয়ে পড়েছে। সেইরূপ, মধ্য শ্রেণীর যুবকেরাও অন্নবস্ত্রের চিন্তায় কাতর হয়েছে, বিবাহ-চিন্তা করতে পারে না।

যাদের সঙ্গে যে মেশে, তারাই তার সমাজ। প্রত্যেকের সমাজের জীবনোপায়ের মানদণ্ড পৃথক্। কেহ সে মানদণ্ডের বাইরে যেতে পারে না। আমরা প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশী ধরি। তার সাক্ষী, প্রসিদ্ধ ডাক্তার যা উপার্জন করেন, উকীল, ব্যারিষ্টার তার বহু গুণ অধিক করেন। সে অর্থনীতিবিদ্ অতিশয় নিষ্ঠুর, যিনি বলেন, তুমি রিক্শা টান, প্রত্যহ ছ-সাত টাকা পাবে। তিনি টাকাই দেখেন, মানুষের মন

নামে যে একটা পদার্থ আছে, তা তাঁর স্মরণ হয় না। তাঁরা হিসাব করেন, আমাদের দেশে এত লোক মেলেরিয়াতে ভুগে, তারা এত দিন কম করতে পারে না, দেশে বৎসর বৎসরে এত টাকা লোকসান হচ্ছে। তাঁদের কাছে শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ কিছু নয়, টাকার হিসাবই বড়। তারাই বলেন, "বাপু, তুমি বিবাহ করো না।" কিন্তু যদি যুবকেরা বিবাহ না করে, কন্যারা কোথায় যাবে ? সমাজ কেমনে টিকবে ?

অধিকাংশ যুবক নিজের সামাজিক মানদণ্ড অতিশয় দীর্ঘ করে। কলিকাতায় একখানি বাড়ী, পাঁচ হাজার টাকার একটা মোটর, আর মাসিক বাঁধা আয় পাঁচ-শ টাকা না থাকলে ভদ্রলোকের মত থাকতে পারা যায় না, বিবাহও করতে পারা যায় না। এই অতিশয় সুখ-ভোগ-স্পৃহা আমাদের দেশের অকল্যাণের মূল হয়েছে। এ স্পৃহা কমাও, আর দেখবে, অনেক যুবক বিবাহ করে' তাদের উপস্থিত আয় দ্বারাই স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারছে।

যে রাজ্যে প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে না, সে রাজ্য টিকে না। সে রাজ্যে অন্তঃকোপ হবেই হবে। বিপ্লব তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বিবাহ একটা দৃঢ় বন্ধন, মানুষকে স্থির রাখে। সমুদ্রে তুফান উঠেছে, তরী টলমল করছে, নাবিক নোঙ্গর ফেলে দেয়, তরী স্থির হয়। নরের নারীর নাবী, নারীর নাঙ্গর নর। নোঙ্গরের রজ্জু উভয়ের প্রেম। প্রেম যত গাঢ় হয়, রজ্জুও তত দৃঢ় হয়, তুফানে ছিঁড়ে না। যাতে নরনারী পরস্পর প্রেমে বদ্ধ থাকে, উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে না বেড়ায়, সেজন্য বিবাহ মানব-জীবনের একটা বড় সংস্কার বলে' গণ্য হয়েছে। সকলেই জানেন, যে গ্রামে দু-পাঁচটি আইবুড়া ষণ্ডা থাকে, সে গ্রামের গৃহস্থেরা বড় ঝঞ্ঝাট নিয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা আদেশ করেছেন, "তুমি বিবাহ করে' গৃহস্থ হবে, পুত্র উৎপাদন করবে। না করলে তোমার পূর্বপুরুষেরা চিরকাল

নরকে পচতে থাকবেন।" ইহার অপেক্ষা গুরুতর শপথ লোকে কল্পনা করতে পারেন নাই। পূর্বকালের লোকেরা পিতৃ-পুরুষকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। আর যে পিতৃ-পুরুষকে অস্বীকার করে, সে ত পশু।

অতএব, কন্যাদের বিবাহ-চিন্তা মাত্র একটা সামাজিক প্রশ্ন নয়, ইহা রাজনীতির প্রধান সমস্যা। অন্নচিন্তার পর বিবাহ চিন্তা, আহার ও বিহার— এই দুই ধর্ম টিকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দুই সমস্যা অবহেলা করাতেই দেশে চাকুরী অর্থাৎ কন্যাদের উৎপাত হয়েছে। যুবক-যুবতী দেখছে, সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার, চারিপাশেই অন্ধকার। আলো নাই, কি করবে, কোন্ পথে যাবে, ভেবে পাচ্ছে না। "ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।" যেখানে যা সেখানে খায়, যেখানে পায় সেখানেই শোয়। বন্ধন নাই।

বালকেরা ও বালিকারা স্কুল-কলেজে এমন শিক্ষা পায় না, যাতে তারা কল্যাণ-পথ দেখতে পায়। এমন বই পড়ে না, যাতে তাদের চিত্তের সাম্য আনতে পারে। পড়ে সংবাদ-পত্র আর গল্প। সংবাদ-পত্রে যা পড়ে, তা মাথায় চড়ে বসে, গল্পে যা পড়ে, তা' মনে দাগ বসায়। [illegible] পড়ে' পড়ে' তারা 'বড় লোক' [illegible] করে, যে লোক নিচক নিরব্য। '[illegible] এক [illegible]' [illegible] অর্থাৎ "থর [illegible]" দেখে তারা মনে করে, পৃথিবীতে কেবল [illegible] আছে, [illegible] নাই। পুরীর সমুদ্র পুলিনে বহু দিন সকালে সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু 'সাগরিকা'র সন্ধান পাই না।

কুমারী বাপের ঘরে বসে আছে, সোনার ঘোড়ায় চড়ে' রাজপুত্র এসে তাকে স্বর্ণপুরীতে নিয়ে যায়। সেখানে অন্নের প্রকাশ দরকার হয় না। হীরা মাণিকের অগণ্য গাছ আছে, তাতে অজস্র মুক্তা ফলে। এত ফলে যে সকালে দাসীরা ঝেঁটিয়ে সরাতে পারে না। কখনও দেখে, তেপান্তর মাঠ দিয়ে চলেছে, সম্মুখে, পেছুতে, পাশে লোকালয়

নাই। অকস্মাৎ কোথা হ'তে এক মীস-কালো দুষমন এসে তার পথ আগলেছে। এমন সময় রাজপুত্র এসে অসি তুলে তাকে ধরাশায়ী করলে। কিন্তু, হায়! রাজপুত্র দূরে থাক, কোটাল-পুত্রেরও দেখা নাই। এই রকমই তাদের শিক্ষা চলতে থাকে। তারা নন্দন কানন চায়, যেখানে গাছে গাছে রসাল অমৃত-ফল ধরেছে, গন্ধর্বে গান গায়, অপ্সরা নৃত্য করে।

সেই কারণেই বলছি, কন্যাদের বিবাহ-সমস্যা কেবল সামাজিক সমস্যা নয়, রাষ্ট্রীয় সমস্যাও বটে। কিন্তু বর্তমান ভারতরাষ্ট্র বলছেন, "আমরা নর-নারীকে সমান মনে করি। সকলকেই শিক্ষা-দীক্ষায় ও রাজকার্যে সমান অধিকার দিয়েছি। তোমরা নিজের পথ বেছে নাও। কিন্তু বিবাহিতা নারীকে রাজকার্যে নিব না।" যারা সমান নয়, তাদিকে সমান মনে করাতে দেশের দুঃখ বেড়ে গেছে। শিক্ষিতা নারীকে অন্ন-চিন্তা করতে হচ্ছে। সে রাজসেবা চায়। রাষ্ট্র বলছেন, তুমি বিবাহ না করলে রাজসেবার উপযুক্ত হবে। অর্থাৎ, পাকে-প্রকারে রাষ্ট্র কুমারীদের বিবাহের বিরোধী হয়েছেন। অভাগা দেশে কন্যারা দাসী হচ্ছে, পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে। পুত্রেরাই খেতে পরতে পায় না, কন্যারা চাকরিতে ভাগ বসাচ্ছে। হে দেশ-চিন্তক, আপনি কি ইহাই চান?

কিন্তু অন্ন-চিন্তাই একমাত্র চিন্তা নয়। কে সংসার-সমুদ্রে কন্যাদের নোঙ্গর হবে? যে অফুরন্ত প্রেম নিয়ে নারীর জন্ম হয়, যার সন্তান-স্নেহের তুলনা নাই, বিবাহ না হ'লে কেমনে এ সব চরিতার্থ হবে? অতএব বিবাহের অন্তরায় দূর করতে হবে।

১। (১) কন্যাকে এমন শিক্ষা দাও, যাতে সে কাঁচ ও কাঞ্চনের মূল্য বুঝতে পারে, বিবিয়ানা শিখবে না, বসন ভূষণের প্রতি আসক্ত হবে না। (২) কন্যাকে ধর্ম-শিক্ষা দাও, যে ধর্ম সদাচার। (৩) কন্যাকে শিক্ষিকা হবার যোগ্য কর। নানা প্রকার শিক্ষিকার প্রয়োজন আছে।

যথা—বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাবে। গীত-শিক্ষিকা বালিকাদিকে গান গাইতে শেখাবে। সূচিকর্ম-শিক্ষিকা নানাবিধ সূচিকর্ম শেখাবে। ভোজ্য-শিক্ষিকা আমাদের আবশ্যক ভোজ্য প্রস্তুত করতে শেখাবে, যেমন—ডাইলের বড়ী দেওয়া, নানাবিধ ফলের আচার করা, মোরব্বা করা, মুড়ি ভাজা, মুড়কি করা, অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করা, ইত্যাদি। আমি বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্য গৃহস্থালী ও রন্ধন-শিক্ষার বই দেখেছি। কিন্তু সে সব ধনবান্ পশ্চিম দেশের। আমাদের দেশে কয়জন পাকা ঘরে থাকে ? অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য প্রস্তুত করবার উপদেশে দেখি, রন্ধনের সূক্তি আছে, অর্থাৎ কি কি উপকরণ কি কি পরিমাণে চাই। কিন্তু এর মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে, তার কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না। কন্যা মাটির ঘরে থাকবে, তাকে ঘর নিকাতে হবে। কেন মাটির সঙ্গে গোবর মেশান চাই, তার কোন উল্লেখ থাকে না। কেমন করে' সুদৃশ্য উনান পাততে হয়, যাতে কাঠের অপচয় হবে না, কন্যারা সে শিক্ষা কোথায় পাবে ? কেমন করে' সন্তান-পালন করতে হয় ও মুষ্টিযোগ দ্বারা সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা করতে হয়, কন্যাকে সে জ্ঞান দিতে হবে।

কন্যারা এইরূপে শিক্ষিতা হ'লে অল্প আয়ের যুবকেরাও অসঙ্কোচে তা'দিকে বিবাহ করতে চাইবে। কালো মেয়ের বিবাহ হয় না, এমন নয়। শীলবতী ও গুণবতী কন্যা চিরকুমারী হয়ে থাকে না। এমন যুবকও আছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী কন্যা কালো হ'লেও পছন্দ করে। প্রয়োজন হ'লে স্ত্রীও অর্থ উপার্জন করতে পারবে। আর, যে সকল কন্যার বিবাহ হবে না, তারাও তাদের ভাই-এর সংসারে বাস করে' নিজের ভরণ-পোষণের উপায় করতে পারবে।

২। আইন দ্বারা বরপণ ও কন্যাপণ নিষিদ্ধ করতে হবে। এই দুই পণ বরের ও কন্যার পিতা খরচ করেন, কন্যা পায় না। এই সেদিন বিহার-রাজ্যে বরপণ নিষিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই বা হবে না

কেন ? বরপণের একটা গুণ আছে, মেয়ে যেমনই হউক, অর্থশালী কন্যার পিতা অক্লেশে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কিন্তু কয়টি কন্যার পিতা অর্থশালী ? আইনে বরপণ ও কন্যাপণ নিষিদ্ধ হ'লেও গোপনে কিম্বা অন্য প্রকারে বর ও কন্যার পিতা টাকা আদায় করতে পারেন। তথাপি সাধারণের পক্ষে এই নিষেধের ফল ভালই হবে।

৩। বিবাহে ব্যয়বাহুল্য কমাতে হবে। ইহা আইনের কর্ম নয়। সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত যে সমাজের প্রতি তাঁরও কর্তব্য আছে, তিনি সৎ-দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন।

৪। বঙ্গদেশে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হয়েছে। এক ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কত জাতি আছে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্ত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তদশী, কনৌজ, মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, অগ্রদানী, বর্ণ-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। রাম ও শ্যামের কন্যার আদান-প্রদান হ'তে পারলে তারা এক জাতি, অন্যথা নয়। এক্ষণে আহারে জাতিভেদ উঠে যাচ্ছে, কিন্তু বিবাহে জাতিভেদ এখনও অটুট আছে। পূর্বকালের মত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এই চারি বর্ণে বর্তমান হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করলে কোনও দোষ হয় না। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, সবর্ণে বিবাহ ভাল। কিন্তু বলেন না, এক এক বর্ণের অসংখ্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিবাহ অকল্যাণকর। আর, দেখাও যাচ্ছে, বিবাহে উপজাতিভেদ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে। কন্যার পিতার একটু সাহস হ'লেই তিনি অনেক যোগ্য বর খুঁজে পাবেন।

শাস্ত্রকার সবর্ণে বিবাহ কেন শ্রেষ্ঠ বলেছেন, একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়। এক এক বর্ণের বিশেষ বিশেষ গুণ ও কর্ম লক্ষ্য হয়েছিল। এখন দেখা যায়, সকল বর্ণের গুণ ও কর্ম এক হয়ে গেছে। আকারে, বর্ণে, আচারে ও শিক্ষায়, চতুর্বর্ণ পৃথক করতে পারা যায় না। এরূপ স্থলে পূর্বকালের বর্ণভেদের সার্থকতাও নাই। অবশ্য সামাজিক ব্যবধান চিরকাল থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে জাতি-ভেদ নাই। কিন্তু

বিবাহে সামাজিক ভেদ আছে। পশ্চিম দেশেও এই ভেদ [illegible]। মোট কথা, সমান ঘর ও যোগ্য বর পেলে কন্যার বিবাহ হ'তে পারে, এবং আজ না হ'ক, দু-দিন পরে হ'তে পারে। (যিনি আমাদের বিবাহের মূল তত্ত্ব জানতে চান, তিনি পড়তে পারেন, "*The Beginnings of Hindu Marriage*" in *Ancient Indian Life* by J. C. Ray. Sen, Ray & Co, College Square, Calcutta.)

৫। কখনও কখনও দেখা যায় কন্যার পিতার কিম্বা ভ্রাতার অবহেলা বা অবিবেচনাহেতু তার বিবাহ হয় না। আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) কন্যা রূপবতী, শীলবতী, এম-এ, বি-টি পাস। কুলীন বংশ, পিতামাতা নাই। ভাইরা কুলরক্ষার নিমিত্ত অযোগ্য পাত্রের সহিত তার বিবাহ-সম্বন্ধ ক'রছে। কন্যা তেমন পাত্র কিছুতেই চায় না। মৌলিক কুলে যোগ্য পাত্র পাওয়া যেত, কন্যার আপত্তি হ'ত না। কিন্তু ভাইদের অবিবেচনাহেতু দুঃখ ভোগ করছে। আমি তার এক মিতিনের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনেছি। কন্যাটি কায়স্থ।

(২) কন্যা এম-এ পাস। কায়স্থ। তেমন রূপ নাই বটে, কিন্তু কুশ্রী নয়। মা নাই, পিতা ধনাঢ্য। পিতা কন্যার বিবাহে উদাসীন ছিলেন। তিনি মারা গেছেন, ভাইরাও উদাসীন। অল্পদিন হ'ল এক রেল-ষ্টেশনের বিশ্রাম গৃহে তার এক মিতিনের ছোট বোন কথায় কথায় বলে' ফেলছিল, "তোমার এখনও বিয়ে হয় নাই ?" আর, সেই অনূঢ়া ধৈর্য ধরতে পারে নাই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আধ ঘণ্টা কেঁদেছিল। সেই ছোট বোনের ভগ্নীপতির মুখে আমি এ কথা শুনেছি।

এই দুজনের মা থাকলে তাদের এ দশা হ'ত না। মা মেয়ের দুঃখ বুঝতে পারেন। ২০।২৫ বৎসরের আইবুড়া মেয়ে থাকলে মায়ের মুখে অন্ন রুচত না। এই রকম আরও বত মেয়ে আছে। ২০।২১ বৎসরেরও বেশী বয়স হয়েছে, বিবাহ হয় নাই। কন্যাদের এই দুরবস্থা দূর করতে

হবে। মনু আদেশ করেছেন, এরূপ কন্যা নিজে 'সদৃশ' বর গ্রহণ করবে। আইনেও প্রাপ্তবয়স্কা নারী নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে। মনুর আজ্ঞা বর্তমান লোকাচার-বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু যে সময়ে এই লোকাচারের উৎপত্তি, সে সময়ে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ হ'ত। আর, সকল কন্যারই হ'ত। তিনি কন্যার ১৫ বৎসর বয়স হ'লে তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা সে স্থলে ২০ বৎসর করতে পারি।

হিন্দু-কোড-বিল

কয়েক বৎসর হ'ল, ভারত-পরিষদে হিন্দু-কোড-বিল নামে এক আইনের প্রস্তাব হয়েছে। আর সমগ্র হিন্দু সমাজ, আকুমারিকা-হিমাচল, বিশাল ভারতের অসংখ্য সামাজিক স্তরের চৌত্রিশ কোটি নর-নারী বিক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবের শোধন, সংশোধন ও পরিশোধন হয়েছে, তথাপি তারা এ প্রস্তাব সমাজ-বিপ্লবী মনে করছে। অসংখ্য সভাসমিতি 'ত্রাহি ত্রাহি' করেছে, কিন্তু প্রস্তাব-কর্তারা অটল অচল। অর্থাৎ তাঁরা যেমন জ্ঞানী, ভবিষ্যদ্দর্শী, সমাজ-হিতৈষী, তেমন অপর কেহ নয়। কে তাঁরা, যারা এইরূপ আইন চায়? তারা কি হিন্দু? তারা কি পরলোকে বিশ্বাস করে? তারা কি হিন্দুর সংস্কৃতির সমাদর করে?

পতি-সৌভাগ্যবতী নারী এই আইন চাইবেন না। যে অভাগী নারী সে সুখে বঞ্চিত, সে-ই এই আইন চাইবে। কিন্তু তার জীবন তিক্ত হয়ে গেছে, সে প্রকৃতিস্থ নাই। হিন্দু-কোড-বিলের আরম্ভে বলা হয়েছে, The Progressive Element of the Hindu Society এইরূপ আইন চায়। এই Progressive শব্দটা শুনলেই আমার ভয় হয়। কারণ, এ পর্যন্ত আমি এই শব্দটার বিশদব্যাখ্যা শুনতে পাই নাই। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছে, "What is progress, my

friend ? বন্ধু, আপনি কাকে অগ্রগতি বলেন ?" 'প্রগতি' শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনতে পাই, কিন্তু কেহ তার অর্থ বুঝিয়ে দেন নাই। "হে প্রগতি-বাদী বন্ধু, আপনার গন্তব্য কি ? পথ কি ? কোনও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন ?" উত্তর নাই। কিন্তু বুঝি, তাঁর' পশ্চিম দেশের অনুকরণ-প্রয়াসী। পশ্চিমদেশ ধনে, মানে, বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি। এই সকল বিষয়ে ভারত অপেক্ষা বড়, কিন্তু সে দেশের নরনারী কি সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করছে ? বিজ্ঞান তাদের সুখের অসংখ্য উপকরণ জুগিয়েছে, কিন্তু তারা সুখে আছে কি ?

এখানে আমি হিন্দু-কোড-বিলের মাত্র তিনটি ধারা সম্বন্ধে কিছু লিখছি।

১। কন্যাকে পুত্র-তুল্য জ্ঞান করে' পিতার সম্পত্তির ভাগ দিবার প্রস্তাব হয়েছে। পণ্ডিতেরা কেমন করে' এ প্রস্তাব করলেন, আমি ভেবে পাই না। এর অন্য কু-ফল দূরে থাক, কোনও ভাই আর তার ভগ্নীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করবে না। কারণ, বিবাহ দিলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ অন্য কুলে চলে' যাবে। আর, সে সম্পত্তি নিয়ে ভাই-এর সঙ্গে ভগ্নীর মনান্তর ও বিবাদ চলতে থাকবে। একে কন্যাদের বিবাদ দুর্ঘট হয়েছে, তার উপর এই বিধি হ'লে অধিকাংশ কন্যার বিবাহ হবে না। হে বন্ধু, আপনি কি কন্যাদের বিবাহ চান না ?

এর পরিবর্তে, যদি এই বিধি হয় যে, অবিবাহিতা ভগ্নী ভ্রাতার সমান ভাগ পাবে, তা হ'লে সে ভগ্নী নিজের অধিকারে পিতৃগৃহে বাস করতে পারবে, কোনও ভ্রাতার অনুগ্রহপ্রার্থী হবে না। কিন্তু তার বিবাহ হয়ে গেলে সে আর সে সম্পত্তি পাবে না, তার স্বামীই তাকে ভরণ-পোষণ করতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর একই স্বার্থ। স্বামী তার পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে, স্ত্রীও করবে। উভয়ের সংসার এক। স্বামী ও স্ত্রী স্বতন্ত্র নয়। স্ত্রীর পৃথক সম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নাই। সে একেবারে নিঃস্বও নয়, সে

বিবাহের সময় যৌতুক পায়, উৎসবে ও পর্বে প্রীতি-উপহার পায়। স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির কিছু অংশ দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামী বর্তমানে সে ধর্মান্তর ও স্বামী-বিয়োগে ধর্মান্তর কিম্বা পত্যন্তর গ্রহণ করলে শ্বশুর-গৃহের সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হবে।

২। বিবাহ-বিচ্ছেদ কথাটা শুনলেই প্রকৃত হিন্দু কানে আঙ্গুল দিবেন। বেদের কাল হ'তে অদ্যাবধি কেহ কল্পনাও করে নাই, স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করতে পারে। কোন্ কোন্ অবস্থায় স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারে, পরাশর তার বিধি দিয়ে গেছেন। ইহাই যথেষ্ট। দম্পতীর বনিবনাও না হ'লে বর্তমান আইনেই তার প্রতিকার আছে। যে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ খুঁজছে, সে বুঝছে না, সমাজের চক্ষে সে হীন বিবেচিত হবে। কে সে নারীকে বিবাহ করবে ? যদি কেহ করে, তখনই সন্দেহ হবে, তাকে পাবার জন্যই সে বিবাহবিচ্ছেদ করেছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ হ'তে পারে। কিন্তু কয়জন বিধবার বিবাহ হচ্ছে ? পশ্চিম-দেশেও পতি-বিচ্ছিন্না নারী ভদ্রসমাজের বাইরে না হউক, মনে মনে হীন বিবেচিত হয়। আমেরিকায় তিনটি বিবাহের একটি ভঙ্গ হয়। তথাকার ভদ্র নারীকে শুধাবেন, তারা কেমন আছে।

৩। প্রস্তাব হয়েছে, এক পত্নী থাকতে কেহ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে পারবে না। এই বিধি অনাবশ্যক। পূর্বকালেও অতি অল্প লোকের বহু পত্নী থাকত। এখন দেখতে পাওয়া যায় না। অতিশয় ধনবান্ ও বিলাসীরাও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করতে ডরায়। এমনও দেখা গেছে, স্ত্রী বন্ধ্যা কিম্বা চিররুগ্না, সে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে জেদ করেছে। সুতরাং এক পত্নী সত্ত্বেও দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পথ রোধ করবার আইনের কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দু-কোড্-বিলের এই তিন ধারাই হিন্দু-সমাজকে ব্যাকুল করে' তুলেছে। কত মহিলা-সমিতি বিরোধী। তথাপি, যদি কেহ চান, তাঁরা

প্রগতিসমাজ নাম নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ুন, আমাদের ধীরগতিদের কোনও আপত্তি নাই। ত্রিশ কোটি হিন্দুর দুই-পাঁচ শত চলে' গেলে হিন্দু সমাজের কেশাগ্রও নড়বে না।

কোন কোন ভারতীয় ইয়োরোপীয়দের তুল্য জীবনযাপন করছে, তারা এক পৃথক সমাজ গড়ে' তুলছে। কেহ কেহ ইয়োরোপ আমেরিকার মেম বিয়ে করে' আনছে। কিন্তু মেমদিকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী পাঠাতে হচ্ছে। আর পতি-বিয়োগে মেমেরা 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। প্রগতিসমাজ এই রকম হবে।

এই ভারতখণ্ডে অসংখ্য জাতি, অসংখ্য আচার, অসংখ্য সামাজিক ব্যবস্থা আছে। এই বহুত্ব হেতু রাষ্ট্রের কি ক্ষতি হয়েছে ? আমাদের ধর্ম-ব্যবস্থাপকেরা কাল অনন্ত মনে করতেন। স্বাভাবিকক্রমে ধীরে ধীরে পরিবর্তনে সকলকে উন্নতির পথে যেতে দিতেন। বলপূর্বক অনার্যকে আর্য করতে চান নাই। এই কারণেই হিন্দু-সংস্কৃতি এত দিন টিকে আছে। খ্রীষ্টান মিশনারী আমাদের দেশের কত নিম্ন শ্রেণীর নরনারীকে খ্রীষ্টধর্ম দিয়ে 'সভ্য' করে তুলছেন। ফলে এই নূতন আলোকে তাদের চরিত্রের অধোগতি হচ্ছে, সভ্যতার যত পাপকর্ম শিখে ফেলছে।

কিন্তু, চোবা না শুনয়ে কভু ধর্মের কাহিনী।

সমাপ্ত